প্রমদারঞ্জন রায়

বনের খবর



সিগনেট প্রেস। কলকাতা ২০

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ ১৩৬৩
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড
কলকাতা ২০
প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
সহায়তা করেছেন
পীযূষ মিত্র
ছবি এঁকেছেন
শ্যামলকৃষ্ণ বসু
মুদ্রক
শৈলেশ সেনগুপ্ত
আর্টাইন প্রেস প্রাইভেট লিঃ
২৪ রিপন ষ্ট্রীট
প্রচ্ছদপট মুদ্রক
গসেন এণ্ড কোম্পানি
৭ গ্রাণ্ট লেন
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬১।১ মির্জাপুর ষ্ট্রীট

দাম তিনটাকা

মনের ঘর



● ১ ● যারা জরীপের কাজ করে, তাদের মধ্যে অনেককে ভারি ভয়ঙ্কর সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। সেই সব জায়গায় হাতি, মহিষ, বাঘ, ভাল্লুক আর গণ্ডার চলা-ফেরা করে, আবার যেখানে সেই-সব নেই, সেখানে তাদের চেয়েও হিংস্র আর ভয়ানক মানুষ থাকে। প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর এই সব জায়গায় ঘুরে কত ভয়ই পেয়েছি, কত তামাশাই দেখেছি।

সরকারী জরীপের কাজে অনেক লোককে দলে-দলে নানা জায়গায় যেতে হয়। এক-একজন কর্মচারীর উপর এক-একটা দলের ভার পড়ে। তাঁর সঙ্গে জিনিসপত্র বইবার জন্য, হাতি, গরু, ঘোড়া, খচ্চর ও উট, আর জরীপ করবার জন্য সার্ভেয়ার, আমিন, খালাসী ও চাকর-বাকর বিস্তর থাকে। বনের মধ্যে থাকতে হয় তাঁবুতে। লোকজনের বাড়ির কাছে থাকা প্রায়ই ঘটে ওঠে না, এক-এক সময় এমনও হয় যে চারদিকে কুড়ি-পঁচিশ মাইলের মধ্যে আর লোকালয় নেই। বন এমনই ঘন আর অন্ধকার যে তার ভিতর অনেক সময় সূর্যের আলো প্রবেশ করে না ; চলবার পথ, জঙ্গল কেটে তৈরি করে নিতে হয়, তবে অগ্রসর হওয়া যায়। যদি জানোয়ারের রাস্তা, বিশেষত হাতির রাস্তা, পাওয়া গেল তো বিশেষ সুবিধার কথা বলতে হবে।

এমনি বিশ্রী জায়গা ! প্রথম-প্রথম এই সব জায়গায় সহজেই ভয় হত। আমার মনে আছে প্রথম বছর যখন শান স্টেটে যাই, আমার তাঁবুর সামনে বসে একটা বাঘ ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছিল, আমি তা শুনে বড়ই ব্যস্ত হয়েছিলাম। তারপর, এর চেয়েও কত বড়-বড় ঘটনায় পড়েছি কিন্তু তেমন ব্যস্ত কখনো হইনি।

কলেজ ছেড়ে চাকরিতে ঢুকে কাজ শিখবার জন্য দেরাদুন গিয়েছিলাম। আমার মাথায় তখনো চাকরির চাপ পড়েনি—কাজ শিখছি, তখনো যেন স্কুলের ছাত্র। স্কুলের ছাত্রের স্বভাব সুলভ বাঁদুরে বুদ্ধি পেটের মধ্যে তখনো পুরোমাত্রায় রয়েছে। তার ফলে লোকের উপর মধ্যে-মধ্যে একটু-আধটু অত্যাচার হত—লেগ্ পুলিং চলত।

সেই বছর দেরাদুনে দুজন হিন্দুস্থানী ও তিনজন বাঙালী অফিসার ছিলেন, সকলেই আমার চেয়ে সিনিয়ার। তাঁরাও পাহাড়-জঙ্গলে কাজ শিখতে গিয়েছিলেন। বাঙালী অফিসারদের মধ্যে একজন—শ্রীযুক্ত অ- আমার পূর্ব-পরিচিত, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আমার তিন ক্লাশ উপরে পড়তেন। অন্য দুজন, শ্রীযুক্ত নি- আর শ্রীযুক্ত হি-ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পুরাতন ছাত্র। শ্রীযুক্ত নি- আর শ্রীযুক্ত অ- আমাকে বড় স্নেহ করতেন। কত নিমন্ত্রণ যে তাঁদের বাড়িতে খেয়েছি। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকদের মধ্যে সর্দার অ- পাঞ্জাবী শিখ আর শ্রীযুক্ত দু- অযোধ্যার লোক। সর্দার সাহেব ধীর গম্ভীর লোক, কারো সঙ্গে বড় একটা মিশতেন না, বেশি কথাবার্তাও বলতেন না।

আমরা চারজন বাঙালী এক সঙ্গে মেস করে ছিলাম, আমাদের তাঁবু ছিল দেরাদুন থেকে মাইল দুই দূরে—নালাপানিতে। শনিবার কাজ শেষ করে আমরা অনেকেই দেরাদুনে আসতাম, আবার রবিবার সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরে যেতাম। কেউ বা রবিবার রাতটাও দেরাদুনেই কাটিয়ে সোমবার ভোরে

ক্যাম্পে হাজির হতেন। শ্রীযুক্ত হি- অনেক সময়ই রবিবার রাত্রে দেরাদুনে খাওয়া-দাওয়া করে গভীর রাত্রে তাঁবুতে হাজির হতেন, শ্রীযুক্ত নি- সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরতেন। আমাদের ফিরবার রাস্তা ছিল একটি গোরস্থানের পাশ দিয়ে আর শ্মশানের ভিতর দিয়ে । দু-চারদিন শ্রীযুক্ত হি-কে অত রাত্রে একলাটি আসতে দেখে, শ্রীযুক্ত নি- একদিন তাঁকে তাড়া দিলেন, "অত রাত্রে অমন করে একলাটি আস, তোমার ভয় করে না ?"

"কিসের ভয় ?"

"কেন ভূতের ভয়, শশ্মানের উপর দিয়ে আসতে হয়, আবার পাশে গোরস্থান।"

শুনে তো শ্রীযুক্ত হি- হো-হো করে হেসেই আকুল, "জ্যান্ত মানুষকে তো ভয় করলাম না, বাকি এখন মরা মানুষকে ভয়।"

শ্রীযুক্ত নি- তো চটে লাল। বলাবাহুল্য তিনি একটু নার্ভাস প্রকৃতির লোক ছিলেন।

নালাপানির কাজ শেষ হলে আমরা আরও মাইল দুই দূরে সোং নদীর ধারে রায়পুরে, এক আমবাগানে ক্যাম্প করেছিলাম।প্রকাণ্ড আমবাগান,তার এক ধারে ছয়জন সাহেবের তাঁবু, এক ধারে আমরা চার-পাঁচজন ভারতবাসী, আর এক পাশে দুজন ইন্‌স্ট্রাক্টার—মুন্সী জ্যাকেরিয়া আর জ্যাকেরুদ্দিন।

এক রবিবার সমস্ত সকালটা আমরা নিজের-নিজের তাঁবুতে বসে আপিসের কাজ করেছি। বেলা বারোটা-সাড়ে-বারোটায় খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি শ্রীযুক্ত দু-এর তাঁবুর দিকে যাচ্ছিলাম, পথে মুন্সী জ্যাকেরিয়ার তাঁবু। দেখলাম, তাঁর সামনে একটা টেবিলের উপর একখানা খাপসুদ্ধ তলোয়ার আর এক সেট উর্দি। সেখানে শ্রীযুক্ত অ-, শ্রীযুক্ত গি- আর শ্রীযুক্ত দু- দাঁড়িয়ে মুন্সীজীর সঙ্গে গল্প করছেন।

আমি জিগগেস করলাম, "এগুলো কি ?"

মুন্সীজী বললেন, "একজন সওয়ার জরীপের কাজ শিখতে এসেছে। এ তার হাতিয়ার আর উর্দি।"

আমি পাগড়ি, কোমরবন্ধ ইত্যাদি উলটিয়ে-পালটিয়ে দেখলাম। তারপর তলোয়ারখানা তুলে নিয়ে, টেনে খাপ থেকে বার করলাম। তার ব্যালেন্সটা পরীক্ষা করবার জন্য হাতলটা ধরে, জোরে সামনের দিকে একটা খোঁচা মারলাম—অবশ্য শূন্যে।

টেবিলের অন্য পাশে, বেশ চার-পাঁচ ফুট দূরে ছিলেন শ্রীযুক্ত নি-। "বাপরে !" বলে এক লাফে তিনি আরও চার-পাঁচ ফুট পিছনে সরে গেলেন।

আমার মাথায় শনি চাপল। আমি এক পা অগ্রসর হয়ে আবার তলোয়ার চালালাম হাওয়াতে। "আরে বাপ !" বলে শ্রীযুক্ত নি- লাফিয়ে আরও তিন-চার ফুট পিছনে সরে গেলেন।

আর যায় কোথায় ! তিনি যতই পিছনে হটে যান, আমিও ততই দু-এক পা করে এগোই আর তলোয়ার চালাই শূন্যে—তিনি আবার চিৎকার করে পিছনে হটে যান, একবার চেয়েও দেখেন না যে তলোয়ারের ডগা তাঁর চার-পাঁচ ফুটের মধ্যেও পৌঁছয় না।

সকলে তো হেসেই আকুল ! আর সকলে যতই হাসে, তিনিও তত চিৎকার করেন আর আমাকে গালি দেন—"রাখ ওটা হাত থেকে, শিগগির রাখ।"

আমি তলোয়ারখানা খাপে পুরে টেবিলের উপর রেখে দিলাম, মুন্সীজী হাসতে-হাসতে সেখানা তাঁর তাঁবুর ভিতরে রেখে এলেন, আর শ্রীযুক্ত নি-কে বললেন, "গোস্‌সা মৎ করো বাবু সাহেব, উয়ো তো স্কুল কা ছোকরা হ্যায় !"

সোং নদীর অপর পারে দোয়ারা পাহাড়ে কাজ করতে গিয়েছিলাম আমরা চারজনে—শ্রীযুক্ত নি- , শ্রীযুক্ত অ- , শ্রীযুক্ত জ- আর আমি।

কাজ করতে-করতে যখন পাহাড়ের চুড়োয় পৌঁছলাম তখন ঝড় আর মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। সকলে মিলে একটা ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিলাম আর জরীপের বড়-বড় ছাতার আড়ালে অতি কষ্টে ম্যাপগুলোকে রক্ষা করলাম। দেড়-দু ঘণ্টা পর, ঝড়-বৃষ্টি থামলে আমরা উঠে বাকি কাজটুকু শেষ করবার জন্য ব্যস্ত হলাম। একটুকু মাত্র বাকি আছে, তখন শ্রীযুক্ত নি- বললেন, "এক্ষুনি চল, না হলে তাঁবুতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।"

আমরা বললাম, "এইটুকু কাজের জন্য আবার কাল এত দূর আসা হতে পারে না। এইটুকু শেষ করেই যাব, একটু সবুর করুন।"

না, তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না, বললেন, "একে তো বিশ্রী রাস্তা, তার উপর আবার বৃষ্টিতে ভিজেছে। নিশ্চয়ই বেজায় পিছল হয়েছে, অন্ধকার হয়ে গেলে যেতেই পারব না, এক্ষুনি চল।"

"তাহলে আপনি এগোন আমরা কাজটুকু শেষ করে আসছি, আপনাকে রাস্তায় ধরে নেব।"

তিনি চলে গেলেন, আর যাবার সময় তাঁর নিজের বল্লম লাগানো লাঠিটা তো নিলেনই, আমারটাও নিলেন।

কুড়ি-পঁচিশ মিনিটে বাকি কাজটুকু আমরা করলাম। ততক্ষণে পশ্চিম-দিক লাল করে সূর্য অস্ত যায়-যায়। শ্রীযুক্ত অ- বললেন, "চল, যেদিক দিয়ে এসেছি, সেইদিক দিয়ে ফিরে যাই।"

আমরা বললাম, "না। ওটা বড্ড খাড়া। চড়বার সময়ই তিন-চার জায়গায় ধরে-ধরে উঠতে হয়েছে। এখন বৃষ্টিতে ভিজে ঐসব জায়গা আরও বিশ্রী হয়েছে। অনর্থক রিস্‌ক্ নেবার দরকার নেই।"

শ্রীযুক্ত অ- গ্রাহ্যই করলেন না, একজন পাহাড়ী খালাসী সঙ্গে নিয়ে ঐদিক দিয়েই চলে গেলেন। শ্রীযুক্ত জ- আর আমি রাস্তা ধরে চললাম। রাস্তা আড়াই ফুট থেকে তিন ফুট চওড়া, দেয়ালের মতন প্রায় খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে-বেঁকে নেমেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে আমরা দৌড়ে চললাম, খালাসীরাও আমাদের পিছন-পিছন দৌড়ে নামতে লাগল। বোধহয় তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক রাস্তা নেমেছি, শ্রীযুক্ত জ- বললেন, "সামনে যেন শ্রীযুক্ত নি- ?"

"সে কি রকম ? তিনি তো আধঘণ্টা আগে বেরিয়েছেন, এতক্ষণে বোধহয় নিচে নালায় পৌঁছে গেছেন।"

শ্রীযুক্ত জ- বললেন, "ঐ দেখ।"

তাকিয়ে দেখলাম সত্যি-সত্যিই শ্রীযুক্ত নি- নামছেন। আর সে পাহাড় নামা এক অদ্ভুত কাণ্ড! তিনি খাদের দিকে পিছন ফিরে, পাহাড়ের চুড়োর দিকে মুখ করে, একেবারে পাহাড়ের দেয়াল ঘেঁষে, দুই হাত দুই বল্লমে ভর দিয়ে 'হাঁটি-হাঁটি পা-পা' করে এক-এক পা ফেলছেন, দুজন পাহাড়ী খালাসী তাঁর দুই পাশে, দুই হাত দিয়ে আগলিয়ে রয়েছে! ঠিক যেন ছোট ছেলে, মা-বাবার দুই হাত ধরে ধীরে-ধীরে পা ফেলছে পাশের দিকে—যেমন করে ডাঙায় কাঁকড়া চলে।

আমরা দুজন দৌড়ে নামছিলাম, পায়ে ভারি-ভারি বুট, তার দুমদুম আওয়াজ হচ্ছিল। ঐ শব্দ কানে পৌঁছানো মাত্র শ্রীযুক্ত নি- একেবারে বসে পড়লেন। আমার মাথায় ভূত চাপল, রাস্তার পাশে বেশ বড় গোটা দু-চার পাথর ছিল, তার একটাকে ঠেলে খাদে ফেলে দিলাম। হুড়-হুড় শব্দে সব ভেঙে চুরমার করে, সেটা যেন একেবারে পাতালে চলে গেল। বেচারা নি-! তাঁর কি দুরবস্থা! চোখ বুজে বসে-বসে খালি আমাকে তাড়না করছেন, "হতভাগা, তোর না হয় সাতকুলে কেউ নেই, মরতে

হয় তুই খাদে পড়ে মর না। শুধু-শুধু আমাদের কেন আবার টানছিস ?” একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমি বললাম, “আচ্ছা দাদা, আর না। আপনি চলুন, আমরা আপনার পিছন-পিছন আস্তে-আস্তে চলছি।”

“না, না, কিছুতেই নয়। তোকে দিয়ে বিশ্বাস নেই, তুই এগিয়ে না গেলে, আমি উঠছি না এখান থেকে।”

অগত্যা কি করি। অতি কষ্টে শ্রীযুক্ত জ- আর আমি পাশ কাটিয়ে তাঁকে পার হয়ে গেলাম, তিনি পাহাড়ের দেয়াল ঘেঁষে, চোখ বুজে বসে রইলেন। আমরা দৌড়ে নেমে গেলাম।

নিচে সোং নদীতে পৌঁছে দেখি শ্রীযুক্ত অ- আমাদের অপেক্ষায় বসে রয়েছেন। জিগগেস করলেন, “এত দেরি কেন ?” সব কথা তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, “সবুর কর, তিনি আসুন।”

অনেকক্ষণ পর শ্রীযুক্ত নি- এলেন আর আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করলেন। বললেন আমি একটা রেক্‌লেস ফুল !

আগেই বলেছি সর্দারসাহেব ধীর, গম্ভীর লোক, কারও সঙ্গে বড় একটা মিশতেন না, নিজে একলাটি কাজ করতে যেতেন। আমরা যেতাম তিন-চারজন এক সঙ্গে। আমরা কাজ করে তাঁবুতে ফিরে এলে কিন্তু সর্দার-সাহেব রোজ রাত্রে শ্রীযুক্ত জ-এর নক্সাখানা নিয়ে তাঁর নিজের নক্সার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন, কোনদিকে কতটুকু কাজ আমরা করেছি, কোন পাহাড়ের কতটুকু আমরা চড়েছি ইত্যাদি। যদি দেখতেন যে কোনোদিকে তাঁর চেয়েও বেশি দূরে আমরা মেপেছি, বা কোনো পাহাড়ে বেশি উঁচু পর্যন্ত উঠেছি, অমনি তার পরদিনই, ঐ পাহাড়ে গিয়ে আমাদের চেয়েও একটু বেশি কাজ করে আসতেন। একদিন ঠিক করলাম সর্দারসাহেবকে একটু ভোগাতে হবে।

আমরা সত্যি-সত্যি যতটুকু জরীপ করেছি, টিমলী পাহাড় তার বাইরে। শ্রীযুক্ত জ-এর ও আমার নক্সার উপর ঐ পাহাড়ের চেহারা একটু-একটু এঁকেছিলাম আমি মাত্র। একদিন শ্রীযুক্ত জ-এর ম্যাপের উপর ঐ আঁকাটার চারদিকে পেনসিল দিয়ে এ-পাশে ও-পাশে আরও পাঁচ-সাতটা নালা আর পাহাড়, কতকটা আভাসে আর কিছুটা কল্পনার সাহায্যে এঁকে একটা নক্সা তৈরি করলাম, ঠিক যেন আমরা ঐ সব জরীপ করে এসেছি। সর্দারসাহেব রোজই শ্রীযুক্ত জ-এর নক্সাই দেখে থাকেন, তাই তাঁর নক্সার উপরই করলাম। আমারটা তিনি দেখবেন না, সুতরাং আমার নক্সার উপর করলে পণ্ডশ্রম হবে।

আমার কাণ্ড দেখে শ্রীযুক্ত জ- বলতে লাগলেন, "তুমি এই গরীবকে কাল টিমলী পাঠাবে দেখছি। আই হোপ সো, ইট্ উইল সারভ্ হিম রাইট!"

যেমন রোজ হয়, তেমনি সে রাত্রেও সর্দারসাহেব শ্রীযুক্ত জ-এর নক্সার সঙ্গে তাঁর নিজের নক্সা মিলিয়ে দেখলেন।

সকালে উঠে, কাজে বার হবার সময় শ্রীযুক্ত জ- সর্দারসাহেবকে ডাকলেন, তাঁর চাকর এসে বলল, "উয়ো তো রাত সাড়ে-চার বাজে কাম পর চলে গঁয়ে।"

আমরা কাজকর্ম শেষ করে সন্ধ্যার সময় তাঁবুতে ফিরলাম, সর্দারসাহেব তখনো ফেরেননি। একটু দুঃখ হল, তাড়াতাড়ি লণ্ঠন দিয়ে, তিন-চারজন লোক পাঠালাম তাঁর খোঁজ করার জন্য। অনেক রাত্রে তিনি ফিরলেন।

ভোরে উঠেই সর্দারসাহেব শ্রীযুক্ত জ-এর নক্সার জন্য লোক পাঠালেন ; ইচ্ছা, তাঁর নিজের নক্সার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন। নক্সা দেখেই তো তাঁর চক্ষুস্থির, শ্রীযুক্ত জ-এর নক্সা পরিষ্কার! টিমলীর আশে-পাশে কোনো কাজই নেই, পরিষ্কার শাদা কাগজ মাত্র!

বলা বাহুল্য আগের দিনই আমি সব রবার দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে

রেখেছিলাম। সর্দারসাহেব তাড়াতাড়ি শ্রীযুক্ত জ-কে ডেকে জিগগেস করলেন, "ঐ কাজটুকু কাল দেখেছিলাম, সেটা কি হল ?"

শ্রীযুক্ত জ-বললেন, "ওখানে তো কাজ করিনি আমরা। ওটুকু প্র-এর স্কেচিং আর ইম্যাজিনেশন-এর দৌড়। কাল কাজে যাবার সময় ও নিজেই সেটা মুছে ফেলেছে।"

সর্দারসাহেবের মনের ভাবটা যে কেমন হয়েছিল তা ভগবানই জানেন। আমি নাকি 'এ ভেরি মিস্‌চিভাস্‌ ফেলো!'

দেরাদুনে আমার উপর হুকুম হল ঘোড়ায় চড়তে শিখতে হবে। একটা ঘোড়ার বন্দোবস্ত করলাম। আগে কখনো চড়িনি, কাজেই 'শিক্ষাটা' সোজা হল না, বিশেষ বেগ পেতে হল। জিনের সঙ্গে যেন আড়ি, একটু নড়াচড়াতেই সে আমাকে ঠেলে ফেলে দেবার উপক্রম করে।

সে সময়ে দেরাদুনে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি কন্‌জারভেটার রায়-বাহাদুর ক- থাকতেন। তিনি একদিন আমার অবস্থা দেখে জিগগেস করলেন, "বাবাজীর বুঝি এই প্রথম চেষ্টা ?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, চল। আমি তোমাকে কি করে চড়তে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি।"

তিনি আমার শিক্ষকতা গ্রহণ করলেন, বলা বাহুল্য তাঁর শিক্ষকতার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই একটু-একটু চড়তে শিখেছিলাম।

রায়বাহাদুর ছিলেন পাকা শিকারী। বাঘ, ভাল্লুক অনেক শিকার করেছেন তিনি। তাঁর কাছে অনেক শিকারের গল্প শুনেছিলাম, তার মধ্যে একটি বড়ই হাস্যকর।

তিনি তখন চক্রাতায় ডেপুটি কন্‌জারভেটার, সেখানে সঙ্গে তাঁর এক ভাইপো ছিলেন। অবসর মতো খুড়োর বন্দুক দিয়ে কখনো-কখনো

পাখি শিকার করতেন। রায়বাহাদুরের বাঘ শিকারের বড় শখ, তাই তাঁর অধীনস্থ সব ফরেস্ট গার্ডদের উপর হুকুম দিয়েছিলেন যে বাঘের সন্ধান পেলেই তাঁকে খবর দেবে।

একদিন কার্যোপলক্ষে তাঁকে দেরাদুন চলে আসতে হয়েছিল। তার পরদিনই দুজন ফরেস্ট গার্ড এসে হাজির।

"সাহেব কোথায় ?"

"কেন ? সাহেব কাল দেরাদুন গিয়েছেন।"

"শিগগির তাঁকে খবর দিন। বাঘ।"

"কোথায় ?"

"এই মাইল দুই দূরে, মোষ মেরেছে।"

ভাইপো বললেন, "সাহেব তো তিন-চারদিন পর আসবেন। তোমরা গিয়ে মাচা বাঁধ, আমি মারব বাঘ।"

"বাবু, তুমি পারবে না। মস্ত বড় বাঘ, প্রকাণ্ড মহিষটাকে টেনে কত দূরে নিয়ে গেছে।"

"পারবে না" শুনে বাবু তো মহা খাপ্পা ! সাহেবের বন্দুক, রাইফেল সব মজুত রয়েছে, "পারব না" আবার কি ?

ধমক খেয়ে বেচারারা একটু ভয় পেল। হাজার হোক সাহেবেরই তো ভাইপো ! একটু চিন্তা করে বলল, "আচ্ছা বাবু, তিনটের সময় তৈরি থাকবেন, আমরা আসব।"

অমনি মাহুতের উপর হুকুম হল, "তিনটের সময় হাতি চাই, বাঘ মারতে যাব।"

যথাসময়ে হাতিয়ার নিয়ে তাঁরা বের হলেন। রাস্তায়, ঐ গার্ডরা শিখিয়ে রাখল যেন বাঘ আসা মাত্রই বন্দুক না ছোঁড়া হয়, তাক্ করে বসে থাকতে হবে; ওরা বাবুর গা টিপলে তবে যেন ফায়ার করেন।

ভাইপো বললেন, "আচ্ছা।"

সেখানে পৌঁছেই তো বাবু চটে লাল, "অত নিচু কেন মাচা ?"

গার্ডরা বলল, "বাবু, সাহেবের জন্য আরও ঢের নিচু মাচা বাঁধা হয়। আপনি নতুন লোক বলে উঁচু করে বেঁধেছি। বেশি উঁচু হলে মারবার সুবিধা হয় না।"

শিকারীরা মাচায় উঠে বসলেন। মাহুতকে হুকুম দিলেন যে উপরি-উপরি দুবার বন্দুকের আওয়াজ করলেই যেন হাতি নিয়ে আসে। রাইফেল হাতে ভাইপো মাঝখানে বসলেন, গার্ড দুজন তাঁর দুপাশে। আবার তাঁকে তারা বলে রাখল যেন তাক্ করে প্রস্তুত হয়ে থাকেন, কিন্তু তারা আঙুল দিয়ে তাঁর গা টিপলে তবে যেন বন্দুক ছোঁড়া হয়।

সব ঠিক, এবার বাঘ এলেই হয়।

সন্ধ্যার আগেই, কিছু দূরে একটা শব্দ হল 'হিঁয়াও'—যেন একটা কুকুর হাই তুলল। গার্ডরা বলল, "ঐ আসছে।" আবার সব নিস্তব্ধ। দশ-পনরো মিনিট পর, অল্প দূরে 'ক্যাঁও-ক্যাঁও' শব্দ করে একটা ময়ূর উড়ল, গার্ডরা ভাইপোকে ইশারায় সাবধান করে দিল—আসছে। কয়েক মিনিট পরেই এসে হাজির—এক প্রকাণ্ড বাঘ, যেন একটা লাল ঘোড়া। মহিষটাকে



গার্ডরা টেনে পাঁচ-সাত ফুট সরিয়ে রেখেছিল, বাঘটা তা লক্ষ্য করে সোজা মহিষটার কাছে না এসে, একটু দূরে বসে রইল, আর চারদিকে দেখতে লাগল। কয়েক মিনিট দেখে, উঠে সটান গিয়ে মোষটার ওপর হামা দিয়ে বসল—পিছনের দু পা মাটিতে, সামনের দু পা আর বুক মোষটার উপর। আবার চারদিক দেখে নিয়ে, খেতে আরম্ভ করল।

বাঘটা যখন খাওয়ায় মত্ত, তখন একজন গার্ড আঙুল দিয়ে শিকারীর পায়ে চাপ দিল। দু-এক মিনিট অপেক্ষা করেও বন্দুকের আওয়াজ হল না দেখে, আবার আঙুলের চাপ দিল, এবারও কোনো ফল হল না। ভাইপো বন্দুক ছুঁড়লেন না।

ব্যাপার কি ? ব্যাপার গুরুতর ! ভাইপোর চোখ কপালে উঠেছে, দাঁত কপাটি লেগেছে, হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে ! ব্যাপার দেখেই গার্ডরা বুঝতে পারল যে তাঁকে দিয়ে এই বাঘ শিকার হবে না। আবার ভাবল—এমন সুযোগ চলে যাবে। তাদের মধ্যে একজন শিকারে বেশ অভ্যস্ত ছিল, সে ধীরে-ধীরে ভাইপোর হাত থেকে রাইফেলটি তুলে নিতে গেল। আর যায় কোথায় ? গোঁ-গোঁ-গোঁ করে, ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরলে লোকের যেমন অবস্থা হয়, ভাইপো তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন।

গোলমালে বাঘের খাওয়া বন্ধ হল আর উপরের দিকে মুখ তুলেই শিকারীদের দেখতে পেয়ে বিকট গর্জন করে, এক লাফ দিয়ে দশ-বারো ফুট দূরে পড়ল।

ফরেস্ট গার্ডরা বলল, "বাবু, দুবার বন্দুকের আওয়াজ করুন, হাতি আসুক, বাড়ি ফিরে যাই। আজ আর বাঘ আসবে না।"

বাবুর মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয় না, খালি ঐ মুখ চাপা গোঁ-গোঁ শব্দ। বন্দুক বা ওদেরও ছাড়ে না, পাছে বন্দুকের আওয়াজ করে। বন্দুক ছোঁড়াও হল না, হাতিও এল না। সমস্ত রাত ঐ মাচায় কাটাতে হল।

এদিকে বাংলোর সকলেই বড় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ব্যাপার কি? ভোর হতে চলেছে, অথচ এখনো বন্দুকের আওয়াজ হল না। নানা চিন্তা করে নিজেরাই হাতিতে চড়ে খোঁজ করতে গেলেন। হাতি যখন গাছতলায় পৌঁছল, তখনো বাবু মাচা থেকে নামতে চান না, "কি জানি, হতভাগা বাঘ হয়তো আবার কোন ঝোপের মধ্যে বসে রয়েছে।"

সকলে ধরাধরি করে তাকে মাচা থেকে একেবারে হাতির পিঠে নামিয়ে নিল। বাংলোয় পৌঁছে তাঁর যা দুরবস্থা দেখা গেল, তা বলা যায় না। দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া মুশকিল! বাঘের গর্জনের সঙ্গে-সঙ্গে এই বীভৎস কাণ্ড হয়েছে!

রায়বাহাদুরের কাছে এই গল্প শুনে মনে হয়েছিল লোকটি কি ভীতু! কিন্তু পরে অনেকবার বাঘের বিকট গর্জন শুনে মনে হয়েছে যে, ও রকম হওয়াটা নেহাত আশ্চর্যের বিষয় নয়।

দেরাদুনে প্রায় এক বছর ছিলাম, তারপর আমার উপর ব্রহ্মদেশে শান স্টেটে যাবার হুকুম হল।

● ২ ● ১৮৯৯—১৯০০ ব্রহ্মদেশ, শান স্টেট। দেরাদুন থেকে কলকাতা, তারপর জাহাজে রেঙ্গুন। রেঙ্গুন থেকে আবার রেলপথে থাজি জংশন, মিকৃটিলা রোড। তারপর হাঁটা-পথে শান স্টেট। থাজি থেকে দক্ষিণে শান স্টেটের প্রধান শহর, টাউংজী, দশদিনের পথ—১১০ মাইল। টাউংজী থেকে আমাদের কর্মস্থান আরও বারো-তেরোদিনের পথ; প্রথমবার পদব্রজেই গিয়েছিলাম। যে কয়দিন বড় রাস্তা ধরে চলেছি, তাঁবু খাটাতেই হয়নি, বারো-চোদ্দ মাইল পর-পর গভর্ণমেণ্টের আড্ডা আছে। সেই

আড্ডার বাংলোয় রাত কাটিয়েছি। বড় রাস্তা ছাড়লে পর তাঁবু আশ্রয় করতে হয়েছে। সে সময়ে শান স্টেটে রেল লাইন খোলা হয়নি, টাউংজী পর্যন্ত গরুর গাড়ি চলত, তারপর খচ্চর বা বলদ সম্বল।

আমার কাজের সাহায্যের জন্য আমার সঙ্গী রামশবদ নামে একজন বুড়ো সার্ভেয়ার গিয়েছিলেন—তাঁর দুই চাকরের কথা বলি।

সার্ভেয়ারটি ব্রাহ্মণ, বাড়ি অযোধ্যায়। প্রায় ৩৫-৩৬ বছর সার্ভে ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেছেন। চাকর দুটিও তাঁরই দেশের লোক—সুচিৎ আর বেণী, তারাও ব্রাহ্মণ। বেণী বুড়ো, বেঁটে, রোগা আর হিংসায় তার পেটটা ভরা। সুচিৎ তার বিপরীত, লম্বা, মোটা, ফরসা আর শাদাসিদে মানুষ। তারা দুজনে মিলে ঐ সার্ভেয়ারটির রান্নাবান্না, কাজকর্ম সব করে। সার্ভেয়ার তাদের দুজনকেই খেতে দেয়, বেণীর কিন্তু তা সহ্য হয় না। সুচিৎ কেন বাবুর খাবে? আর যদি খাবেই, তবে অত খাবে কেন? সুচিতের শরীরটি যেমন, আহারটিও তেমনি, সে বেণীর ডবল খায়। কাজও করে সে বেণীর চেয়ে ঢের বেশি, কিন্তু তা হলে কি হয়? বাবু যে সুচিৎকে খেতে দেন, বেণী তা সইতে পারে না। সুচিৎ আবার যতটা খায়, সব সময় তা হজম করতে পারে না, সেজন্য কাজ করতে-করতে অনেক সময় তাকে ঘটি হাতে ছুটতে হয়। সেদিন সন্ধ্যাবেলা, বাবুর চায়ের জল করতে বসে তাকে তেমনি ঘটি হাতে ছুটতে হল।

চারদিকে ঘোর জঙ্গল। বাঘের ভয় খুবই আছে, কাজেই সুচিৎ বেশিদূর যায়নি। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে দেখে, খচ্চরওয়ালারা খচ্চর সব ভালো করে বেঁধে চারদিকে ধুনি জ্বালাবার যোগাড় করছে। এমন সময় তাদের একজন দেখল ওরে বাবারে! কি বড় বাঘ আসছে গুড়ি মেরে। এ ঝোপ থেকে ও ঝোপের আড়ালে, সেখান থেকে আর এক ঝোপের পিছনে—এমনি করে সুচিৎকে ঠিক ধরবার চেষ্টা।

দেখেই তো সে চেঁচিয়ে উঠল, "পালাও, পালাও! বাঘ এসেছে, ধরলে!"

এ কথা শোনামাত্র সুচিৎ যে কি প্রাণপণ ছুটেছিল, তা বুঝতেই পার। কোথায় রইল তার লোটা আর কোথায় রইল তার জল, সে দু-লাফে একেবারে তাঁবুর ভিতরে এসে হাজির। ভয়ে বেচারার প্রাণ শুকিয়ে গেছে, মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। বাবুর চা সে-রাত্রে উনুনের উপরই রইল, বাঘকেও সুচিৎকে না খেয়ে ফিরে যেতে হল। তার অনেকক্ষণ পরে চার-পাঁচজনে মিলে, মশাল জ্বালিয়ে সুচিৎকে নদীতে স্নান করিয়ে আনল। সেই পৌষ মাসের শীতে বেচারা কি কষ্টই পেল, তা দেখে কিন্তু বেণীর মুখে হাসি ধরে না। তবে বেণীরও যে সকল দিন এমনি হেসে কেটেছিল তা নয়, সে গল্প পরে শুনবে।

আগেই বলেছি, সুচিৎ যে বাবুর খায়, বেণীর তা সহ্য হয় না। ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। দিন-রাত খুঁটিনাটি নিয়ে এই ঝগড়ার চোটে বেচার বুড়ো রামশবদের আর সহ্য হয় না, সেজন্য বিরক্ত হয়ে বেণীকে বলেছেন, "তোমরা দুজনেই সরকারের চাকর। কাজ কর সরকার বাহাদুরের, খেতে দিই আমি, তাই নিয়ে ওর সঙ্গে ঝগড়া কেন? তোমার তো আর সে খায় না।" ইত্যাদি।

চটে গিয়ে বেণী আর বুড়োর ভাত খায় না, নিজে আলাদা রেঁধে খায়। বুড়োর কোনো কাজও সে আর করে না, দিব্যি আরামে বসে থাকে। আগে ব্যবস্থা ছিল যে পালা করে তারা দুজনে বুড়োর সব কাজ করে দেবে, আর আবশ্যক মতো বুড়োর সঙ্গে জঙ্গলে কাজ করতে যাবে। সুচিৎই কাজে যেত, বেণী রান্না করত, কখনো জঙ্গলের কাজে যেত না। বেণী ঝগড়া করে বসে-বসে দিন কাটায়, জঙ্গলেও যায় না, বুড়োর কাজও করে না। সুচিৎকে দুই কাজই করতে হয়।

আমি দিন দুই দেখে একটু চাপ দিলাম, "বেণী, তুমি বাবুর কাজ না কর

বেশ, সরকারের মাইনে যখন খাও, সরকারের কাজ তোমাকে করতে হবে। বসে থাকতে পাবে না। কাল থেকে তুমি বাবুর সঙ্গে কাজে যাবে। না গেলে, তোমার মাইনে কাটা যাবে। সুচিৎ যখন বাবুর রান্নাবান্না সব করে দেয়, তখন সুচিৎ আর কাজে যাবে না।"

বেণীর জঙ্গলে গিয়ে অভ্যাস নেই, মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই, তাই যেতেই হল। কাজে বের হয়েছি, দেখেছি বেণীর পিঠে একটা বোঁচকা বাঁধা।

"ওটা কি রে?"

বুড়ো হেসে বলল, "আরে বাবুজী, উসমে উসকা জনমভরকা কামাই।"

ব্যাপার কি? শুনলাম বেণীর যা কিছু পুঁজি আছে, সব ঐ বোঁচকার মধ্যে—৩৬০ টাকা। ভীষণ কৃপণ, কাকেও বিশ্বাস করে না। সেজন্য এই টাকা, দেশে তার আত্মীয়স্বজনদের কাছে রেখে আসে না, সর্বদাই সঙ্গে নিয়ে-নিয়ে ফেরে, তাঁবুতেও রেখে যাবে না, যদি কেউ চুরি করে। তিন-চারদিন বোঁচকা বেঁধেই কাজে গেল, তারপর একদিন বসে একটা লম্বা থলে সেলাই করে, তাতে টাকা ভরে কোমরে বাঁধল, আর তার উপর একটা কম্বল জড়িয়ে প্রকাণ্ড ভুঁড়ি বানাল। কিন্তু অমন করে আর কদিন চলবে? একে তো জঙ্গলের কাজে অনভ্যস্ত, তার উপর আগের মতো চর্ব্যচোষ্যও জোটে না, একবেলা দুটি শুকনো ভাত মাত্র খায়। কৃপণ, পয়সা খরচ করে দুবেলা খাবে না। একটু জব্দ হয়ে পড়ল।

সেদিন আমরা সালউইন নদী পার হয়েছি আর নদীর কিনারায় তাঁবু খাটিয়েছি। শানেরা নদীতে মাছ ধরছিল, বেচতে এল। বুড়ো অযোধ্যার ব্রাহ্মণ হলেও মাছ-মাংসের ভক্ত। আমি মাছ খাই না, বুড়োকে দেখিয়ে দিলাম। বুড়ো বলল, "নেব না।"

"কেন?"

"সুচিৎ ভালো রাঁধতে পারে না, মিছিমিছি নষ্ট করব কেন ?"

আমি বললাম, "মাছ রাখ, আমার লোক সুচিৎকে মাছ রান্না দেখিয়ে দেবে।"

বুড়ো একটু ইতস্তত করে একটা মাছ কিনল।

আমি একটু ঘুমিয়ে উঠেছি, স্নান করব। মাছ রান্নার গন্ধ পেয়ে দেখতে গেলাম আমার লোক সুচিৎকে দেখিয়ে দিচ্ছে কিনা। গিয়ে দেখি বেণী রান্না করছে।

"কি বেণী, কি হল ?"

"আরে হুজুর, বাবু না হয় রাগ করে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আমি তো কদিন থেকে দেখছি যে বাবুর খাওয়া হয় না। ওটা তো রাঁধতে জানে না, তাই মাছটা রেঁধে দিচ্ছি।"

বুড়ো আমাদের কথা শুনে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছিল, আর একটু-একটু হাসছিল।

সন্ধ্যার সময় দেখি বুড়ো আর সুচিতের সঙ্গে বেণী ভাত ও মাছ খাচ্ছে। মাছের লোভটা হতভাগা ছাড়তে পারলে না!

সালউইন নদীর পারে একটা পাহাড়ের কাজ শেষ করে, অপর পারে অন্য পাহাড়ে যাব। সোজাসুজি রাস্তা থাকলে ঐ পাহাড়ের উপরের গ্রামটি মাইল সাতেক মাত্র দূর, কিন্তু সোজা যাবার উপায় নেই। মাঝখানে সালউইন নদী, তার দুপাশের পাহাড়গুলো একেবারে দেয়ালের মতো খাড়া, পার হবার সাধ্য নেই। কাজেই বাধ্য হয়ে চারদিনের পথ ঘুরে যেতে হল। দ্বিতীয় দিন সালউইন নদী পার হয়েছিলাম আর সেদিনই মাছের লোভে বেণীর রাগ উড়ে গিয়েছিল।

ঐ পাহাড়ের উপর মুসোদের গ্রাম। সেই দেশে শান ছাড়া মুসো, পালাউং,

কুই প্রভৃতি অনেক জাতির লোক বাস করে। পাহাড়ের মাথায় মুসোদের গ্রাম। তারা অন্য জায়গায় বড় একটা যাতায়াত করে না, কাজেই তাদের পথঘাটের বিশেষ দরকার হয় না, নালায়-নালায়ই কাজ চালিয়ে নেয়। জিনিসপত্র যা প্রয়োজন, প্রায় সবই তাদের আছে। খেতের ধান, খেতের লঙ্কা, কুমড়োও খেতের, রাইও খেতের। এই রাইপাতা তাদের উত্তম তরকারি। শিকার করে আর সেই মাংস খায়—হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক থেকে আরম্ভ করে কাঠবিড়ালীটি অবধি বাদ দেয় না। কাজেই তাদের কোনো জিনিসেরই অভাব হয় না—খালি নুন ছাড়া। নুনের জন্যই মাঝে-মাঝে নিচে শানদের গ্রামে আসে, তাই নালার ভিতর দিয়ে একটু-একটু রাস্তা আছে।

তুলোও তাদের নিজের খেতের, সেই তুলোর সুতো কেটে সে দেশের মেয়েরা কাপড় বোনে।

হাতিয়ার—তীর, ধনুক, দা, কুড়ুল আর বর্শা—কদাচিৎ মান্ধাতার আমলের এক-আধটা বন্দুকও দেখা যায়। তীর-ধনুক তারা নিজেরাই তৈরি করে, দা, কুড়ুল ইত্যাদি শানদের গ্রাম থেকে কিনে আনে।

এরা খুব শিকারী। জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, নানা রকম জানোয়ার শিকার করে, নানা রকম পাখি এনে পোষে। ভয় তাদের একেবারেই নেই। দু-তিনজন মিলে চার-পাঁচদিন ধরে ঐ ভয়ঙ্কর বনে শিকার খুঁজে বেড়ায়, একটুও ভয় পায় না।

এদের গ্রামগুলি দূর থেকে বড় সুন্দর দেখায়। পাহাড়ের মাথায় উঁচু-উঁচু মাচার উপর সারি-সারি বাঁশের ঘর, দূর থেকে দেখতে বেশ। কিন্তু কাছে গেলে বমি আসে এমনি নোংরা। এই যাত্রায় এদের গ্রামে দু-তিন দিন ছিলাম। গ্রামের প্রধান একটা বড় সুন্দর পাখি পুষত। শাদা ধবধবে, মোরগের মতো লেজ, শাদার উপর কালো-কালো কারিকুরি, যেন তুলি দিয়ে আঁকা, ডানায়ও ঠিক তেমনি কারিকুরি। লেজের দুটি পালক খুব লম্বা,

গলাটি ঘোর নীল আর চকচকে, মাথায় ঘোর নীল রঙের ঝুঁটি। আমার বড় লোভ হল, তাই প্রধানকে ডেকে আড়াই টাকায় সেটি কিনলাম, ভাবলাম কলকাতায় নিয়ে আসব। পাখিটা সারাদিন বনে-বনে ঘুরে বেড়ায়, রাত্রে ঘরে আসে। সকালে আমরা চলে আসব, প্রধান সকালে উঠে পাখিটাকে ধরে এনে দিল, একটা খাঁচায় পুরে তাকে নিয়ে এলাম। নিয়ে এলাম বটে, কিন্তু দুদিন বাদেই বেচারা মরে গেল। হয়তো খাঁচায় বন্ধ রাখাতে তার মন ভেঙে গিয়ে থাকবে, অথবা পুরোনো মনিবের জন্য তার গভীর দুঃখ হয়েছিল, যে দুদিন আমাদের কাছে ছিল, এক ফোঁটা জল স্পর্শ করেনি।

শান স্টেটে একটা তামাশা দেখেছিলাম আর একটু আশ্চর্যও হয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে যে সমস্ত শান কুলিরা জঙ্গলে কাজ করতে যেত, তাদের প্রায়ই দু-তিনদিন জঙ্গলেই থাকতে হত, কিন্তু তারা অনেক সময়েই রাঁধবার জন্য কোনো হাঁড়ি বা কড়া, বা অন্য বাসন-কোসন নিয়ে যেত না, অথচ ভাত খেত। কি করে রান্না করে? একটা লম্বা কাঁচা বাঁশের চোঙার একটি বাদে সমস্ত গাঁটগুলিকে ফুটো করে, সেটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে, তাতে আবশ্যক মতো চাল পুরে, জল ভরে, ঘাস-পাতা দিয়ে মুখটা বন্ধ করে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে দেয়। তিন-চার ঘণ্টা অমনি থাকে, তারপর ঐ চোঙাটা ধুনির আগুনে ঝলসায়। চারদিকে বেশ ঝলসানো হলে চোঙাটা জায়গায়-জায়গায় পুড়ে যায়—সেটাকে ধুনি থেকে বার করে রেখে দেয়। ঠাণ্ডা হলে পর দা দিয়ে আস্তে-আস্তে বাঁশটাকে চিরে ফেলে আর তার ভিতর থেকে দিব্যি একটি ভাতের পাশ বালিশ বার হয়ে আসে। সেটা চাকা-চাকা করে কেটে সকলে ভাগ করে নেয়, আর নুন, লঙ্কা, শুকনো মাছ বা মাংস উপকরণ দিয়ে খায়। গরমের দিনে কখনো বা ঝিঁঝি পোকা ধরে, আগুনে পুড়িয়ে তার চাটনি করে খায়। ঝিঁঝিপোকা নাকি অতি উপাদেয়!

ঐ বছর একটা বড় দুর্ঘটনা হয়ে ছিল আমার কাজ শেষ হবার কদিন আগেই। আমাদের উপরওয়ালা মিস্টার এস- লিখলেন: তোমার কাজ তো শেষ হল বলে, শেষ হলেই তোমার পাশে সাদিক হুসেন কাজ করছে, তাকে সাহায্য করে, তার কাজ শেষ করে দাও। সে বড্ড পিছিয়ে পড়েছে।

আমার কাজ শেষ হতে আরও তিন-চারদিন লাগবে, আমি তখন থেকেই পাশে সাদিক হুসেনের কাজ করব বলে গ্রাম, রাস্তাঘাট ইত্যাদির সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলাম। প্রথমেই যে সংবাদ পেলাম তাতেই তো চক্ষুস্থির ! ঐ পাহাড়ে সার্ভেওয়ালারা নাকি একজন লোক মেরে ফেলেছে।

দোভাষীকে ডেকে বললাম, "এই গুজব আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, কাল হাট আছে, তুমি হাটে খবর নাও।"

ভোরে উঠে দোভাষী আর দুজন খালাসীকে হাটে পাঠিয়ে দিলাম। আমার তাঁবু থেকে দু-তিন মাইল দূরে, অন্য গ্রামে হাট ছিল। বিকেলে দোভাষী এসে খবর দিল যে ঐ গুজব মিথ্যা। কিন্তু ঐ যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে (আট-দশ মাইল দূরে একটা পাহাড় দেখিয়ে), ঐ পাহাড়ে হুসেনবাবুর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে অমুক গ্রামের প্রধান গাছ চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। দোভাষী বিস্তারিত কোনো খবর আনতে পারেনি। তবে এইটুকু বলল, "ঐ পাহাড়ে কোনো লোক যেতে চায় না, বলে ওখানে নিশ্চয় ভূত আছে।"

তিন-চারদিন পরে যখন আমার কাজ শেষ হল, আমি আর বুড়ো সার্ভেয়ার রামশবদবাবু ঐ পাহাড়ের নিচে গ্রামে তাঁবু ফেললাম। এই গ্রামের প্রধানই মারা পড়েছিল। গ্রামের লোক পাঠিয়ে তাদের বড় প্রধানকে খবর দিলাম যেন এসে আমার সঙ্গে দেখা করে।

বর্মিরা গ্রামের প্রধানকে ফুঙ্গি বলে আর শানেরা বলে 'পুকং'। দশ-বারোটা গ্রামের উপর একজন বড় সর্দার থাকে, তাকে বর্মিরা বলে 'মিও থুজি' আর শান স্টেটে বলে 'হেং'।

রাত আটটা-সাড়ে-আটটার সময় হেং এসে হাজির, তার সঙ্গে এসেছিল আরও তিন-চারটা গ্রামের প্রধান, আর একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে, একটি ছয় সাত বছরের মেয়ে ও একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্ত্রীলোক— এরা ঐ মৃত প্রধানের পুত্র, কন্যা ও স্ত্রী। গ্রামের লোকও কুড়ি-বাইশজন এসেছিল। তাদের কাছ থেকে সব খবর পেলাম।

সার্ভেয়ারদের চার-পাঁচজন খালাসী আর গ্রামের দশ-বারোজন শান কুলি পাহাড়ের উপর জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করতে গিয়েছিল—দূরবীণের কাজ হবে। লোকজনদের হুকুম দিয়ে কাজ করাবে বলে প্রধান সঙ্গে গিয়েছিল। কোথায় কি কাটতে হবে, কোনদিক থেকে আরম্ভ করতে হবে, ইত্যাদি, সব তার লোকদের দেখিয়ে দিয়ে প্রধান পাহাড়ের মাথায় আট-দশ ফুট উঁচু একটা প্রকাণ্ড পাথরের উপর চড়ে বসল আর সকলকে হুকুম করতে লাগল এটা কাট, ওটা কাট ইত্যাদি। শান কুলিরা এ সব কাজে সিদ্ধহস্ত, তারা কায়দা মাফিক কেটে যাচ্ছে। এমন কায়দায় কাটছে যে প্রত্যেকটি গাছ কাটা হলে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

খালাসী কয়জন হাজারীবাগের লোক, তাদের এ সব খেয়াল নেই, এ কায়দাও জানা নেই। তারা একটা গাছ উল্টো কেটেছে—মটমট করে গাছটা নিচের দিকে না ঝুঁকে উপরের দিকে ঝুঁকেছে, এই পড়ে আর কি! "ভাগো, ভাগো দরখত্ গিরতা হ্যায়!" যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল গাছটাকে তার দিকে ঝুঁকতে দেখে প্রধান ও-পাথরটার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে সামনের নালার মধ্যে আশ্রয় নিল। নালার দুই কিনারা খুব উঁচু, তার ভিতর গাছের ধাক্কা লাগবে না। দুর্ভাগ্য তার, গাছটা পড়ল ঐ প্রকাণ্ড পাথরটার উপর। পাথরটা মাটিতে আলগোছে বসানো ছিল, অত বড় গাছের ধাক্কায় একেবারে সমূলে উপড়ে গিয়ে ঐ নালার ভিতর গড়িয়ে পড়ে গেল। "হায়, হায়, হায়!" চিৎকার করে সকলে ছুটে এসে দেখল মাত্র আধখানা

শরীর পড়ে আছে, বাকি অর্ধেকটা একেবারে চুরমার হয়ে যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

গ্রামে সংবাদ দিতে, গ্রামের লোকেরা ঐ আধখানা দেহ সেই পাহাড়ের উপরেই কবর দিল, আর দেবতাকে সন্তুষ্ট করাবার জন্য সেখানে পুজো দিয়ে এল।

ওরা আর ও-পাহাড়ে যায় না, ওখানে ভূত আছে। দু-তিনজন, যারা সে সময় ওখানে উপস্থিত ছিল, তারা সকলে ঐ একই কথা বলল। আমি হেংকে বলে বন্দোবস্ত করলাম যে সকালে দুজন পথ দেখিয়ে আমাকে পাহাড়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু কোনো গাছ তারা কাটবে না। তাহলে আর রক্ষা নেই, নাট্ (ভূত) আবার কাকে শেষ করবে!

ঐ ছেলেটিকে সঙ্গে করে তার মামা আর প্রধানের নিজের একজন লোক আমাদের সঙ্গে আমাদের হেডকোয়ার্টারে এসেছিল—প্রায় দশদিনের পথ। আমরা সকলে মিলে চাঁদা তুলে প্রায় ২৫০৲ টাকা তাকে দিয়েছিলাম।

● ৩ ● ১৯০০—১৯০১। আগের বছর যেসব জায়গায় কাজ করেছিলাম তার ঠিক দক্ষিণেই এবারও কাজ করতে গিয়েছিলাম। সেই দীর্ঘ পথ, কুড়ি-একুশ দিনের রাস্তা পার হয়ে পৌঁছলাম। এবার সেয়ানা হয়েছি, দশদিনের পথ হেঁটে এসে ঘোড়া কিনে নিয়েছিলাম।

৩৫০—৪০০ বর্গমাইলের মধ্যে আর লোকজনের বসতি নেই, খালি পাহাড় আর জঙ্গল। পথঘাট নেই, আছে খালি বুনো মহিষ, বাঘ, ভাল্লুক—এই সব। বুনো মহিষের পথ ধরে আমরা পাহাড় ওঠা-নামা করি। খচ্চর চলে না তাই দূর গ্রাম থেকে কুলি সঙ্গে এনেছি, জঙ্গল কাটবে আবার মোটও

বইবে। সারাদিন এক হাঁটু জলে, নালায়-নালায় চলে, ক্লান্ত হয়ে, বেলা চারটের সময় দুটি নালার দোমোহনায় অর্থাৎ সঙ্গমস্থলে এসে আড্ডা করলাম। আমি আর সেই বুড়ো সার্ভেয়ার, সঙ্গে সাত-আটজন হাজারীবাগের লোক আর চার-পাঁচটি শান। সেই গ্রামের প্রধানের ছেলে বন্দুক নিয়ে সঙ্গে এসেছে। জঙ্গল কেটে, তাঁবু খাটাতেই প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল।

সকলে নানা কাজে ব্যস্ত, আমি আর বুড়ো রামশবদবাবু সবে প্রধানের ছেলেকে জিগগেস করেছি যে সেই বনে কি-কি শিকার পাওয়া যায়, এমন সময়ে নালার ওপারে পাহাড়ের উপরে একটা কি রকম কোঁকানো গোছের আওয়াজ হল, যেন কেউ খুব ব্যথা পেয়ে কোঁকাচ্ছে। শুনেই তো আমরা লাফিয়ে উঠেছি, আর প্রধানের ছেলে, "বাঘে হরিণ ধরেছে" বলে বন্দুক হাতে সেইদিকে ছুটল।

তার পিছন-পিছন আমি আর বুড়ো সার্ভেয়ার, আর তিন-চারজন লোকও দৌড়ে চললাম। একজনের হাতে একটা তলোয়ার ছিল, আমি সেটা হাতে তুলে নিয়ে, হাত বাড়িয়ে তলোয়ারটা ঘুরিয়ে, সকলকে সাবধান করে দিলাম, "তোমরা এর ভিতর এস না—যদি লোক খায়।"

প্রধানের ছেলে আমাদের আর এগোতে মানা করেছিল, কাজেই আমরা নালার কিনারায় বসে রইলাম। এমন সময়ে সে ভারি ব্যস্ত হয়ে বন থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের ডাকতে লাগল—এত ব্যস্ত যে তার মাথার পাগড়ি কোথায় যে ফেলে এসেছে সে হুঁশ ছিল না। অমনি আমরা চার-পাঁচজনে সেইদিকে ছুটে চললাম, আর তিন-চারজন অন্য দিক দিয়ে ঘুরে চলল। রামশবদবাবু সেখানেই বসে রইল, বুড়োমানুষ—আটান্ন বছর বয়স, সন্ধ্যার সময় আর কোথায় যাবে?

আমরা ছুটে পাহাড়ে চড়তে লাগলাম। সকলের আগে প্রধানের ছেলে, তার পিছনে আমি, আর আমার পিছনে তিন-চারজন লোক। খানিক

উঠলাম, তারপর একটা নালা, তার ওপারে যাবার উপায় নেই একেবারে দেয়ালের মতো খাড়া। আমি প্রধানের ছেলের কোমর ধরে যেমনি তাকে ঠেলে উপরে তুলে দিতে গিয়েছি, অমনি ঠিক আমাদের মাথার উপরে একটা বাঁশঝাড়ের পিছন থেকে গুড়-গুড় করে একটা আওয়াজ হল। আমরা তো তাড়াতাড়ি পিছন হটে এলাম, কিন্তু সঙ্গের লোক কয়টি ছুটে পালাতে গিয়ে জড়াজড়ি করে নালার ভিতরে পড়ে গেল।

জানোয়ারের দস্তুর এই যে তাকে দেখে যে পালাবে, সে তাকেই ধরবে। কাজেই তখন কি আর করি? তলোয়ার বাগিয়ে তাদের বললাম, "যদি পালাবি, তো কেটেই ফেলব।" বেচারারা সেখানেই দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। দাঁড়িয়েছে তলোয়ারের ভয়ে, আর কাঁপছে বাঘের ভয়ে।

এমন সময়ে, অন্য দিক দিয়ে যে তিন-চারজন লোক গিয়েছিল, তারা "পাক্‌ড়া! পাক্‌ড়া!" বলে চিৎকার করে উঠল। শুনে আমার যা ভয় হল, ভাবলাম বুঝি বা কাউকে বাঘে ধরেছে। আমরা প্রাণপণে সেইদিকে ছুটলাম। গিয়ে দেখি, বাঘে তাদের পাকড়ায়নি, তারা পাকড়িয়েছে হরিণ! পাকড়িয়েই বেচারার গলায় গোটা তলোয়ারের দুই-তিন কোপ মেরেছে, আবার তার উপর চড়ে বসেছে। প্রকাণ্ড হরিণ, সেটা তখনো মরেনি।

আমি জিগগেস করলাম, "বাঘ কোথায়?"

তারা উত্তর দিল, "বাঘ আবার কিসের? চারটে বুনো কুকুর ছিল, আমাদের দেখেই পালিয়েছে।"

এই কুকুরগুলোই আমাদের দেখে গুড়-গুড় করেছিল। বুনো কুকুর বড় নিষ্ঠুর জানোয়ার। সকলের আগে ঐ জীবন্ত হরিণটার চোখ দুটি কামড়ে নিয়েছিল। বেচারা অন্ধ হয়ে আর গুঁতোতেও পারেনি, পালাতেও পারেনি, কাজেই তারা সুবিধা পেয়ে তার পিছন থেকে মাংস ছিঁড়ে খেতে আরম্ভ করেছিল। এমনি করে প্রায় দু-তিন সের মাংস খেয়ে ফেলেছিল।

যারা ভয় পেয়ে পালাতে গিয়ে জড়াজড়ি করে নালায় পড়ে গিয়েছিল, এর পর সকলে মিলে তাদের কি রকম জ্বালাতন করত, সেটা আর কি বলব। এর অর্থ এ নয় যে অপর সকলেই খুব সাহসী পুরুষ। তারা সেখানে উপস্থিত থাকলে হয়তো তারা সকলেই ছুটে পালাত। এই কথার প্রমাণ আরও অনেকবার পেয়েছি।

এই জঙ্গলেই অন্য এক পাহাড়ে বুড়ো সার্ভেয়ারের তাঁবু পড়েছে। বেণী এখন বাবুর রান্না করে, তাকে তাঁবুতে রেখে, সুচিৎ আর অন্য লোকজন সঙ্গে নিয়ে বুড়ো কাজে গিয়েছে। সমস্তদিন খেটে-খুটে, সন্ধ্যার সময় তাঁবুতে ফিরে আসছে, আর মনে-মনে জল্পনা করছে—তাঁবুতে এসেই ভাত তৈরি পাবে, আর হাত-পা ধুয়ে খেয়েই দিব্যি ঘুম দেবে!



তাঁবুতে পৌঁছেই দেখে বেণী তাঁবুতে নেই, রান্না করবে কে ? এদিক-ওদিক চারদিক খুঁজে, তাদের বড় ভাবনা হল—বুঝি বেণীকে বাঘে নিয়ে গেছে ! সঙ্গের শান কুলিরা কিন্তু সকল দিক ভালো করে দেখে বলল যে বাঘ ওখানে আসেনি, বাঘের কোনো চিহ্নই নেই।

তখন সকলে চিৎকার করে বেণীকে ডাকতে লাগল। অনেক ডাকাডাকির পর, খানিক দূর থেকে ভাঙা গলায় উত্তর এল, "আমি এখানে।" সকলে আলো হাতে সেইদিকে ছুটল। সেদিকেও তাকে দেখতে না পেয়ে, আবার ডাকতে আরম্ভ করল। তখন গাছের উপর থেকে বেণী বলল, "আমি গাছে, নামতে পারছি না।"

তার কথা শুনে শানরা তাড়াতাড়ি গাছে চড়ে দেখে বেণী তার পাগড়ি খুলে নিজেকে সেই পাগড়ি দিয়ে, গাছের ডালের সঙ্গে বেশ করে বেঁধে বসে রয়েছে। বাঁধন খুলে তাকে সেই গাছ থেকে নামিয়ে আনা হল। বেচারা অনেক কষ্টে গাছে উঠেছিল। গায়ের অনেক জায়গা ছিঁড়ে গিয়েছে, কাঁটার খোঁচা, আঁচড়ও নিতান্ত কম পায়নি। সকলে জিগগেস করল, "তোর এ দশা কি করে হল রে ?"

বড়-বড় চোখ করে বেণী বলল, "বা-আ-ঘ এসেছিল। নালার ধারে এসে এমন গড়গড়িয়ে উঠল যে আমি ছুটে চলে এলাম, তাতেই গা ছড়ে গেছে আর কাঁটার খোঁচা লেগেছে। বাঘটা আবার ডাকতে-ডাকতে উপরে উঠে আসতে লাগল, কাজেই আমিও গাছে উঠে গেলাম। কি করে যে উঠলাম জানি না, আর কখ্খনো গাছে উঠিনি। উঠেই পাগড়ি খুলে ডালের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে বেঁধে নিয়েছিলাম, তারপর শীতে হাত-পা অবশ হয়ে গেছে, নামতে গিয়ে আর নামতে পারি না।"

শানরা কিন্তু বলল, "বাঘ এসেছিল আর তার পায়ের দাগ নেই কোথাও, তা কি হতে পারে ?"

বেণী ভারি চটে উঠল, "বেটাদের চোখ নেই তাই বলছে বাঘ আসেনি। রাত্রে এসে যখন ধরবে, তখন বুঝতে পারবে।"

বলতে-বলতেই, নিচে নালার ধারে গমগম করে একটা শব্দ হল। আর বেণীও অমনি লাফিয়ে উঠে বলল, "ঐ শোনো, বাঘ এসেছে কিনা।"

শুনে তো সকলে হেসে গড়াগড়ি, সেটা ছিল একটা হরিণ, বার্কিং ডিয়ার।

আমাকে যখন বুড়ো সকল কথা বলল, আমি বেণীকে ডেকে জিগগেস করলাম, "বেণী, তুমি পশ্চিমের লোক হয়ে, একটা হরিণের ডাক শুনে অমন করলে?"

বেণী বলল, "হুজুর, দিনের বেলা ওটা বাঘই ছিল। রাত্রে আমার ভুল হয়েছিল। তখন মেজাজটা ঠিক ছিল না, তাই বুঝতে পারিনি।"

সে যেমনই হোক, বেণীকে বাঘের কথা নিয়ে সকলে মিলে কি রকম খেপিয়েছিল, তা বোধহয় আমি বুঝিয়ে না দিলেও চলবে।

আমার সঙ্গে শিবদয়াল নামে একজন খালাসী ছিল, সে নতুন লোক আর ছেলেমানুষ। এবার আমার কাজে অনেক উঁচু-উঁচু পাহাড় ছিল, বিশেষত একটা পাহাড়—চারদিক থেকে দেখা যায়, সকল পাহাড়ের উপর মাথা তুলে রয়েছে। সকলেই দেখে আর জিগগেস করে, "হুজুর, উয়ো কালা পাহাড় দেখ পড়তা হ্যায়, উয়ো ভি হমলোগকা কাম মে হ্যায়?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়। ওটাও আমাদের কাজের মধ্যে।"

"বাপ, কৈশা চড়েঙ্গে উস্‌পর?" ইত্যাদি টিকা-টিপ্পনী চলেছে কতদিন ধরে।

তারপর সত্যি-সত্যিই ঐ 'কালা' পাহাড় চড়বার দিন এল। খালাসী কুলি ইত্যাদি নিয়ে ভোরে কাজে বের হলাম, জঙ্গল কাটতে হবে। সঙ্গে দেখি শিবদয়াল নেই। "আরে শিবদয়াল কোথা?"

"বহুৎ পেটমে দরদ হ্যায়, হুজুর। সিধা হোনে নেহি সকতা হুঁ।"

তাকে তাঁবুতে রেখে গেলাম। সন্ধ্যার সময় যখন তাঁবুতে ফিরে এলাম, তখন আমার চাকর শশী বলল, "শিবদয়ালের না পেটে ব্যথা? আপনারা চলে যাবার পরই তো ও দিব্যি রান্না করে খেয়েছে। গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছে।"

"ডাক বেটাকে।" সে এলে তাকে জিগগেস করলাম, "কিরে, একি শুনছি?"

"হুজুর, তোমরা চলে যাবার পর পেট ব্যথা কমে গেল, তখন ছুটি চাল সিদ্ধ করে খেয়েছি।"

বেটা বাঁদর!

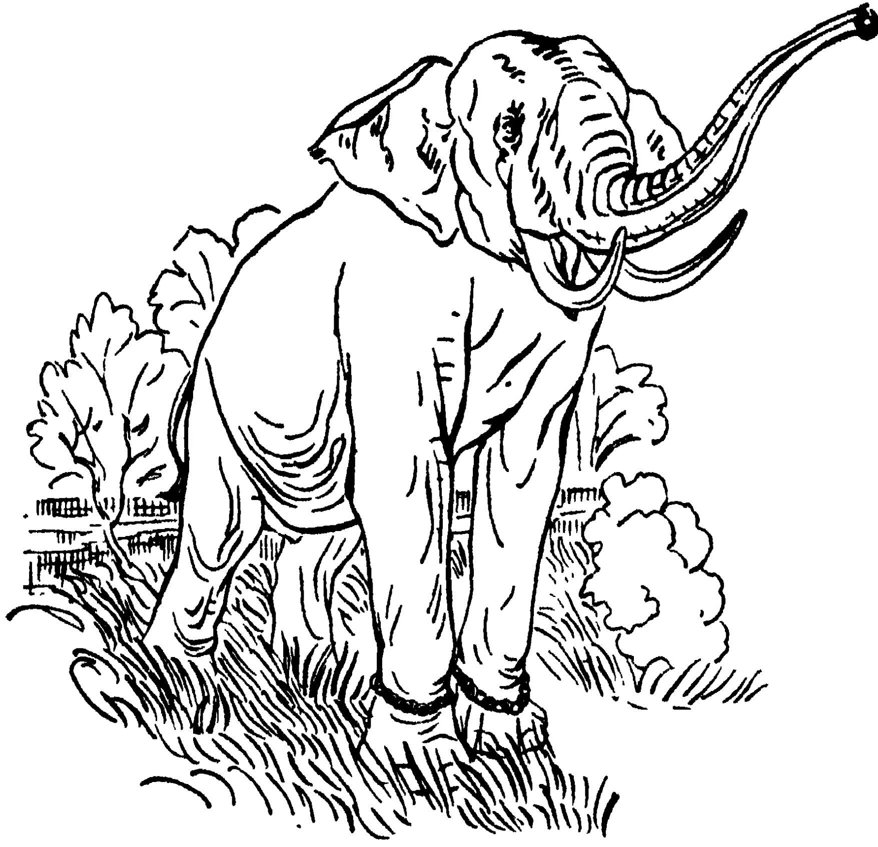
কিছু জঙ্গল কাটা বাকি ছিল। পরের দিন সকালবেলা কুলিদের সঙ্গে শিবদয়ালকেও পাঠালাম এক রকম জোর করে। রাত্রে নাকি তার পেটের ব্যথা আবার বেড়েছিল।

বিকেলে যখন তাঁবুতে ফিরল, ডেকে জিগগেস করলাম, "পেট ব্যথা কেমন?"

"আরাম হো গয়া হুজুর।"

অন্য খালাসীরা বলল, "হুজুর ওর পেট ব্যথা তো হয়নি। পাহাড় দেখে ভয় পেয়ে চড়াই বাঁচাবার জন্য, পেট ব্যথার ভান করেছিল। আজ চড়তে-চড়তে বলছিল যে আমার খেয়াল ছিল চড়তে-চড়তে পায়ের হাড় ব্যথা হয়ে যাবে, এ তো দেখছি বেশ রাস্তা রয়েছে।"

বোকা লোক, তার খেয়াল নেই যে অর্ধেকের বেশি রাস্তা আগের দিন ঐ গ্রামে আসবার সময় চড়া হয়েছে। যে গ্রামে আমরা তাঁবু ফেলেছিলাম, সেটা পাহাড়ের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ চড়াইয়ের উপরে। এর পর পাহাড় দেখে আর তার পেটে ব্যথা হয়নি।



এ বছরের মতো, আমাদের জরীপের কাজ শেষ হয়েছে, সকলে মিলে দেশে ফিরতে আরম্ভ করেছি, সকলেরই ভারি ফুর্তি।

পথের দুই পাশে ঘোর বন, তারই ভিতর দিয়ে ছোট নদী এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে, সেই নদীর ধারে-ধারে রাস্তা। কখনো বা এপার, কখনো বা ওপার, এমনি করে আমরা চলেছি। একটা মোড় ফিরেই তো আমাদের চক্ষুস্থির—হাত ত্রিশেক সামনেই, একেবারে রাস্তার কিনারায়, প্রকাণ্ড দাঁতওয়ালা এক হাতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুনো হাতি নয়, তার সামনের দু পায়ে শিকল জড়ানো। তবু তার চেহারাটা কেমন-কেমন বোধ হচ্ছিল, হাতিটার সঙ্গে লোকজন নেই। বেটা আমাকে আর বুড়ো সার্ভেয়ারকে দেখেই, আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে, দাঁত উঁচিয়ে দাঁড়াল।

আমাদের সঙ্গে অনেকগুলি লোক, ঘাড়ে বোঝা নিয়ে আমাদের পিছন-

পিছন আসছিল। তাদের মধ্যে সামনের লোকটি, মোড় ঘুরেই হাতি দেখে "আরে বাপরে!" বলে পিছন ফিরে দে দৌড়। আর অমনি বোঝা সুদ্ধ তার পিছনের লোকটির সঙ্গে টক্কর খেল। আর টক্করের চোটে বোঝা সুদ্ধ দুজনেই রাস্তার মাঝখানে গড়াগড়ি দিল। ততক্ষণে আরও কয়েকজন এসে, মোড় ঘুরে, সামলাতে না পেরে তাদের ঘাড়ে পড়ল।

একটুক্ষণ বাদে হাতিটা আস্তে-আস্তে নদীর ওপারে গিয়ে একটা বাঁশ-ঝাড়ের পিছনে, আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তা দেখে আমরাও নালার কিনারায় এলাম, কিন্তু নালা পার হতে আর কারও ভরসা হয় না। অনেক বলা-কওয়ার পর এক-একজন করে, কাঁপতে-কাঁপতে, আস্তে-আস্তে হাতিটার সামনাসামনি অবধি যায় আর কোনো প্রকারে হাতিটাকে পার হয়েই প্রাণপণে ছুট দেয়। তা দেখে বুড়ো সার্ভেয়ার চটে গিয়ে তাদের বড়ই গালি দেয়, কিন্তু তারপর যখন নিজের পালা এল, তখন অন্য সকলের মতো সেও হাতির সামনাসামনি এসেই চোখ-মুখ বুজে বোঁ করে দৌড় দিল। শেষে তাঁবুতে এসে যা হাসির ধুম!

মং কাংজী নামে একজন দোভাষী আমাদের সঙ্গে ছিল, সেই বেচারার উপরেই যত হাসির চোট পড়ল। বেচারার অপরাধের মধ্যে সে শান, তার দেশেরই হাতি, তবু সে কেন ভয় পাবে?

মং কাংজীর একটু ভয় পাওয়ার অভ্যাস যে ছিল না, সেটা কিন্তু আমি বলতে পারি না। আরেকদিনও সে এমনি করে একটা হরিণের ভয়ে ছাতা-টাতা ফেলে চম্পট দিয়েছিল।

এই হরিণটাকে তিন-চারটে বুনো কুকুরে তাড়িয়ে এনেছিল। প্রকাণ্ড সম্বর হরিণ, এই বড় তার ডালপালাওয়ালা শিং, যেন মাথায় বাঁশঝাড় গজিয়েছে। বেচারা ছুটে-ছুটে এমনি ক্লান্ত হয়েছিল যে আর ছুটতে পারছিল না। আমাদের দুজন লোক তাকে তাড়া করল, সে পাহাড়ের নিচের দিকে,

রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে পালাতে লাগল। ঠিক সেই পথে, ছাতা মাথায় মং কাংজী আসছিল। তারপর যে কি হল, তা আগেই বলেছি। সে ভালো করে চেয়েও দেখল না যে কি জানোয়ার আসছে—বাঘ, ভাল্লুক, না হরিণ। কাঁইমাই করে চিৎকার করতে-করতে এমন বিকট ভঙ্গীতে দৌড় দিল যে সকলে তা দেখে হেসেই আকুল। তখন মং কাংজীর লজ্জা হল, সে জানত না যে সে একটা হরিণের ভয়ে এমন করে পালিয়েছিল।

হরিণটা চলে যাবার একটু পরেই বুনো কুকুরগুলো এসে উপস্থিত হল। তারা মাটি শুঁকতে-শুঁকতে আসছিল, আর এমনই আশ্চর্য যে, যে-পথ দিয়ে হরিণটা গিয়েছিল, ঠিক সেই পথ ধরে তারাও চলছিল। হঠাৎ আমাদের গন্ধ বা আওয়াজ পেয়ে কুকুরগুলো থমকে দাঁড়াল। তারপর মাথা তুলে একটিবার আমাদের দেখতে পেয়ে, আর কি তারা সেখানে থাকে ?

আরেকজন সাহসী লোক ছিল—আমীর আহম্মদ। দেড়শো-দুশো লোক দল বেঁধে বনের পথে চলেছে, আমীর আহম্মদ সকলের আগে—তার সাহস কিনা সকলের চেয়ে বেশি। জঙ্গলের পথ, জানোয়ারের ভয় সর্বত্রই আছে। আমীর আহম্মদের চোখ খালি চারদিকে ঘুরছে—কোন পথ দিয়ে বাঘ এসে না তাকে সেলাম করে ফেলে। এমন সময় বনের ভিতর একটা কি যেন সড় সড় করে উঠল, লাল মতো একটা কি যেন দেখতে পাওয়া গেল ! অমনি আর যায় কোথায় ? আমীর আহম্মদ প্রাণপণ ছুটতে লাগল, সঙ্গে-সঙ্গে হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে সকলকে বলতে লাগল, "পালাও, পালাও, শিগগির পালাও ! যে বাঘ আসছে কিছু আর রাখবে না।"

সকলে তা শুনে বড় ব্যস্ত হল, কিন্তু যখন সেই জানোয়ারটা সত্যি-সত্যিই এল, তখন সবাই দেখল যে ওটা একটা লাল কুকুর। এর পর আমীর আহম্মদের যা লাঞ্ছনা, সে আর কি বলব !

বনের ভিতর তাঁবু, বাঘের ভয় খুব, বিশেষত রাত্রে, তাই পাহারা রাখতে হয়। সে রাত্রে শিবদয়ালের পাহারা ছিল। সে তাঁবুর সামনে আগুনের ধুনির কাছে বসে রয়েছে আর ঘোড়া ও খচ্চরগুলোর উপর নজর রাখছে, পাছে সেগুলোকে বাঘ নিয়ে যায়। আগেই বলেছি শিবদয়াল নতুন লোক, এই প্রথম জরীপের কাজে এসেছে। বাঘের দেশ হাজারীবাগে তার বাড়ি বটে, কিন্তু বাঘ সে চোখেও দেখেনি, বাঘের ডাকও শোনেনি।

সকলে ঘুমুচ্ছে। নালায় কোলা বেঙ ডেকে উঠল। সে যে কি রকম জন্তু, সেকথাও শিবদয়াল জানে না। আমি ডেকে বললাম, "শিবদয়াল, সাবধান! ও কি ডাকছে শোনো।"

অমনি সে ভারি ব্যস্ত হয়ে উত্তর দিল, "হুজুর, জরুর শের হোগা।" বলেই সে সকলকে ডাকাডাকি করে তুলছে, "ওঠ, ওঠ, বাঘ এসেছে! ঐ শোনো ডাকছে।"

তা শুনে একজন খালাসী হাসতে-হাসতে বলল, "দূর বোকা! ওটা বুঝি বাঘ? ওটা কচ্ছপ ডাকছে।"

শিবদয়াল অমনি ছুটে এসে আমাকে বলল, "হুজুর, ওটা বাঘ নয়, ওটা কচ্ছপ।"

এই ঘটনার পরে বেঙ ডাকলেই সকলে মিলে শিবদয়ালকে খেপাতো, "শিবদয়াল, তোর বাঘ ডাকছে।"

নালায় হাতি দেখে মং কাংজী আর অন্যান্য অনেকে ভয় পেয়েছিল বলেছি, কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিল শঙ্কর খালাসী। তাঁবুতে পৌঁছে দেখি শঙ্কর আসেনি—সে আমার খাবার নিয়ে যেত। জিগগেস করলাম, "শঙ্কর কোথায়?"

"অভি তক্ নহি পৌঁছা হুজুর।"

"গেল কোথায়?"

দোভাষী বলল, "ও হাতি দেখে রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ে উঠে গিয়েছিল, বোধহয় ঘুরে আসছে।"

প্রায় আধ-ঘণ্টা পরে শঙ্কর এসে হাজির—বিপরীত দিক থেকে।

"কঁহা থা রে ?"

"হুজুর দুসরি রাস্তাসে আয়া হুঁ।"

সকলে জ্বালাতন করতে লাগল, "হাতিকে অত ভয়, তাও আবার পোষা হাতি ?"

"হুজুর, ম্যয় আউর কোই জানওয়ারকো নহি ডরতা, লেকিন হাতি বড়া খারাব জানোয়ার হ্যায়।"

একবার নাকি সে একটা পাগলা হাতিকে একটা লোককে পিষে মেরে ফেলতে দেখেছিল। সেই অবধি হাতি দেখলেই তার বড় ভয় হয়, সে হাতি জংলীই হোক আর পোষাই হোক।

আমরা কাজ শেষ করে ফিরে চলেছি, তিনদিনের পথ এসেছি, দেখি আমার অপেক্ষায় দুজন চাপরাশী বসে রয়েছে।

"সার্ভেয়ার সাদিক হুসেনের কাজ এখনো প্রায় দুমাসের বাকি। গিয়ে দেখ, ও কি করছে, আর সম্ভবপর হলে, কাজ শেষ করে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এস"—বড়সাহেব হুকুম পাঠিয়েছেন।

সেই গ্রাম থেকে সাদিক হুসেনের কাজের জায়গা তিনদিনের পথ। রাস্তায় আর গ্রাম নেই, কাজেই তিনদিনের খোরাক যোগাড় করে চললাম। বুড়ো তো মহা খাপ্পা, বললে, "কেন বাবু অমন তাড়াহুড়ো করে কাজ শেষ করলে ? তাই তো এই দুর্ভোগ," ইত্যাদি।

সাদিক হুসেনের কাছে পৌঁছে দেখলাম যে প্রায় আড়াইশো বর্গ মাইলে কাজ তখনো বাকি, এ বছর শেষ করা অসম্ভব।

বড়সাহেবকে যথাযথ রিপোর্ট পাঠিয়ে, কাজে লেগে গেলাম।

দুটো পাহাড়ের কাজ শেষ করে, তৃতীয়টায় এসেছি। সমস্ত পাহাড়ে আগুন লেগেছে চারদিক ধোঁয়ায় ঘেরা, তিন-চার মাইল দূরের পাহাড় পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় না। এ পাহাড়টায় জল নেই, তাই বাধ্য হয়ে চার মাইল দূরে, গ্রামে তাঁবু ফেলেছি। ভোরে, অন্ধকার থাকতেই কাজে বার হয়েছি। বেজায় খাড়া চড়াই, যখন পাহাড়ের কিনারার উপর পৌঁছলাম, তখন একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। দাঁড়িয়ে একটা চীর অর্থাৎ পাইন গাছে হেলান দিয়ে একটু বিশ্রাম করতে লাগলাম। পাহাড়ের অপর দিকটা একেবারে দেয়াল বললেই চলে—এমন খাড়া। অনেক জায়গায় গাছপালা তো নেইই, এমন কি ঘাস পর্যন্ত নেই। একটা বড় পাথর পড়ে ছিল, আমি সেটাকে ধরে, ঠেলে, ঐ খাড়া জায়গায় গড়িয়ে দিলাম। বাবা! সে এক হুলস্থূল ব্যাপার! হড়হড়, হড়হড়—সে পাথরটা পড়ছে তো পড়ছেই। দুটো ছোট পাইনগাছ ছিল, ঐ পাথরের ধাক্কায় একটা মট করে প্যাঁকাটির মতো ভেঙে গেল, আর অন্যটা একেবারে সমূলে উপড়ে, হুড়মুড় করে চলল তার সঙ্গে ঐ অতল গর্তে।

আমি তো তামাশা দেখছি, এদিকে পিছনে বুড়ো রামশবদ তো যায়-যায়। ঐ দেখে তার মাথা ঘুরে গেছে—"চক্কর আয়া," আর "বাপ-বাপ!" বলে সে একেবারে শুয়ে পড়েছে। অনেক হাওয়া করে তবে তাকে ঠাণ্ডা করি। তখন আমার মনে পড়ল, দেরাদুনে একদিন শ্রীযুক্ত নি-রও ঠিক এমনি অবস্থা হয়েছিল।

এই বুড়ো আরও একদিন বড় বিপদে ফেলেছিল।

সালউন নদীর উপরে এক বিদঘুটে পাহাড়ে চড়তে হবে—নদী থেকে পাহাড়ের চুড়ো প্রায় ৫৫০০ ফুট উঁচু আর এমন খাড়া যে সেদিক থেকে চড়া যায় না। পাহাড়ের নিচের দিকটায় জঙ্গল আছে, কিন্তু চুড়োর

কাছাকাছি শেষের পাঁচ-ছশো ফুট খালি ঘাস আর পাথর। আঠারো-উনিশ মাইল ঘুরে পাহাড়টার অন্য পিঠ বেয়ে উঠতে হবে। আমরা তো সমস্ত দিন চলে পাহাড়ের উল্টো পিঠে, জঙ্গলে তাঁবু ফেললাম। তার পরের দিনও ঘুরে-ঘুরে চড়তে-চড়তে প্রায় তিনটে বেজে গেল, তখনো চার-পাঁচশো ফুট বাকি। আমাদের মাথার উপরে দেয়ালের মতন খাড়া প্রেসিপিস, তাতে এক জায়গায় একটা ফাটল, আর সেই ফাটল দিয়ে ঝিরঝির করে জল পড়ছে, অতি পরিষ্কার আর সুস্বাদু জল। জলের কাছে অল্প একটু সমান জায়গা আছে। শানেরা ঐখানে পাহাড়ের দেবতাকে পুজো দিতে আসে, আর ঐ সমান জায়গাটাতে আড্ডা করে। ঐ সমান জায়গাটুকুর সামনে বড়-বড় গাছ আর উপর দিকটায় প্রকাণ্ড একটা পাথর ঝুঁকে আছে, ঠিক যেন ছাদের মতন। ঝরনার নিচের জমিটুকু ভেজা, তাতে প্রকাণ্ড বড় সব বাঘের পাঞ্জার ছাপ। বাঘও ঐ ঝরনায় জল খেতে আসে। সঙ্গের শান কুলিরা বলল, "এখানে কোনো ভয় নেই। দেবতা থাকেন এখানে, বাঘ কিছু বলবে না।" আমরাও ঐ সমান জায়গাটুকুতে আড্ডা করলাম।

পরের দিন বাকিটুকু চড়তে আরম্ভ করলাম। সে এক ব্যাপার, প্রথমে কতকটা হাত ধরে-ধরে গাছে চড়বার মতো চড়তে হল পাহাড়ের স্যাডল অর্থাৎ, কাঁধটা পর্যন্ত, তারপর একটা গুহার মধ্যে ঢুকলাম। দেখলাম ঐ গুহার মধ্যে অনেকগুলো নিশান টাঙানো আছে, বাতি জ্বালানো হয়েছিল তার চিহ্ন আর কয়েক আনা পয়সাও রয়েছে। শানেরা এখানেই পুজো দেয়।

গুহার অন্যদিকটা খোলা, যেন প্রকাণ্ড একটা পাতকুয়ো। সেখানে একটা খুব মোটা গাছের ডাল দাঁড় করানো হয়েছে, তার গায়ে ধাপ কাটা। ঐ গাছ বেয়ে উপরের ফুটো দিয়ে গুহার উপরে উঠলাম। সেখানে খালি ঘাস।

একটু দাঁড়াবার জায়গা আছে, আর যত দূর দূরান্তর পর্যন্ত সব দেখা যাচ্ছে। সেখানে পৌঁছে তো চক্ষুস্থির! সামনে যে রাস্তা তাতে বুনো ছাগল বা বাঁদর ছাড়া অন্য জীব যাবে কী করে? পাহাড়ের কানা ঘেঁষে এক ফুট বা পনরো ইঞ্চি চওড়া পথ, তাতেও আবার হাঁটু সমান উঁচু ঘাস। এক পাশে দেয়ালের মতো পাহাড়, তাও আবার ঐ পথের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, আর অন্যদিকে এক হাজার ফুটের মধ্যে আর আটকাবার মতো কিছু নেই! তার প্রায় ৪৫০০ ফুট নিচে সালউইন নদীর সবুজ জল। ঐ তাকের মতো কানাটুকুর উপর দিয়ে প্রায় দেড় জরীপ অর্থাৎ বত্রিশ-তেত্রিশ গজ যেতে হবে।

শানেরা তো বাঁদরের মতো চলে গেল। আমিও, ভগবানের নাম নিয়ে, সালউন নদীর দিকে পিঠ করে, কাঁকড়ার মতো পাশের দিকে পা ফেলে, এক-পা এক-পা করে পার হলাম। ওপারে পৌঁছে, ফিরে দেখলাম সকলে পার হল কিনা। টিণ্ডেল আর দোভাষী বলল, "হুজুর, বুড়াবাবু নেহি আয়া। আনে নহি শকতা, সো গয়া—শির ঘুমতা, বদন কাঁপতা।"

উপায়? শানদের ডাকলাম, দোভাষী দুজনকে সঙ্গে দিলাম। তারা পাগড়ি দিয়ে বুড়োর কোমর বেঁধে, চারজনে সামনে-পিছনে টেনে ধরে, এক রকম ঝুলিয়ে বললেও চলে, তাকে ঐটুকু পার করে আনল। ভয়ে বুড়োর চোখ কপালে উঠেছে। কাজ শেষ হলে পর, আবার ঠিক অমনি ভাবে বুড়োকে ঐটুকু পার করা হল। এমন বিটকেল পাহাড় আমি কমই চড়েছি।

সাদিক হুসেনের কাজ যতটা সম্ভব করলাম। বড়সাহেবের হুকুম এল, "কাজ বন্ধ করে চলে এস।" আমরা হেডকোয়ার্টারে ফিরে চলেছি। রাস্তায় দুদিন গ্রাম পাব না, ক্যাম্প করতে হবে জঙ্গলে। শানরা বলল প্রথম দিন বিশেষ কোনো অসুবিধা হবে না, কিন্তু দ্বিতীয় দিনই মুশকিল।

"কেন?"

"জলের কষ্ট।"

"জল কি কোথাও নেই?"

"হ্যাঁ, এক জায়গায় এক পরিত্যক্ত ফুংগিচং-এ জল আছে, কিন্তু সেখানে বড্ড বাঘের ভয়। বাঘের উপদ্রবে, গ্রাম ছেড়ে লোকজন সব পালিয়ে গেছে। ফুংগিরা কিছুদিন ছিলেন, শেষটা তাঁরাও চলে গেছেন।"

আমি বললাম, "চল, ঐ পরিত্যক্ত ফুংগি চং-এই আড্ডা করব। রাত্রে বড়-বড় ধুনি জেলে, কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করা যাবে।"

দ্বিতীয় দিন ঐ ফুংগি-চং অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রমে পৌঁছলাম। গ্রাম ছেড়ে লোকজন কোথায় চলে গেছে। আম-কাঁঠালের গাছে সব ফল ধরে রয়েছে। তিন-চারটে কুয়ো আছে, তাতে পরিষ্কার জল। ফুংগিদের আশ্রমের ঘর-দরজা, স্তূপ সব মজুদ রয়েছে। আমরা আশ্রমের সামনে খোলা ময়দানে তাঁবু ফেললাম। ধুনি জ্বালাবার জন্য অনেক কাঠের ব্যবস্থা করে, ডবল পাহারা বসালাম। রাত্রে কিন্তু কেউ স্বস্তিতে ঘুমুতে পারল না। এক-একবার একটু চোখ বন্ধ করি আর অমনি হৈ-হৈ চিৎকার।

"কি হল?"

"বাঘ খচ্চর ধরতে এসেছে।"

এমনি করে রাত কাটল। সকালে এক জায়গায় পায়ের দাগ দেখে মনে হল খুব বড় বাঘ ছিল না। তা ছোটই হোক, আর বড়ই হোক, হতভাগা সমস্ত রাত আমাদের ঘুমোতে দেয়নি।

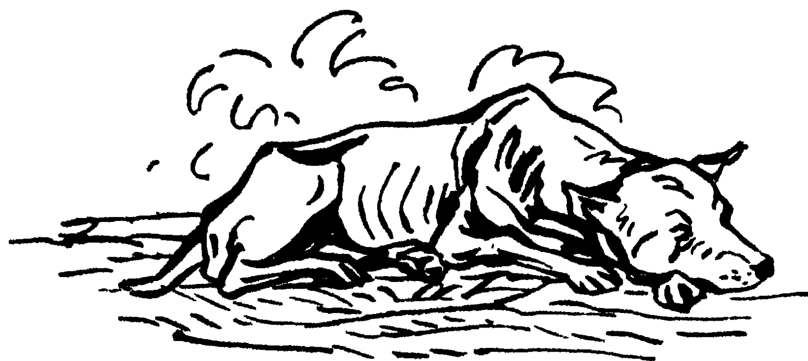
আটদিন চলে আমাদের হেড ক্যাম্পে পৌঁছলাম। আমার সঙ্গে একটা ঐদেশী কুকুর জুটেছিল, আগের দিন রাত্রে সেই কুকুরটাকে বাঘে খেল।

কুকুরটা কি রোগা যে ছিল তা আর কি বলব। গ্রামে তাকে কেউ খেতে দিত না, সেইজন্য বোধহয় আমাদের ক্যাম্পে জুটেছিল। দুটো ভাত তাকে দেওয়া হল, বেচারা সবে তাতে মুখ দিয়েছে, আর অমনি গ্রামের

অন্য দুটো কুকুর তার উপর লাফিয়ে পড়ল। আমি তাদের ঠেঙ্গিয়ে তাড়িয়ে এটাকে খেতে দিলাম। ভোরে উঠে ডেরা ডাণ্ডা বেঁধে আমরা চলেছি, দেখি সেও আমাদের পিছন-পিছন আসছে। বেণী ব্রাহ্মণ, তার ভয় হল, যদি 'চূলা' নষ্ট করে, তাই তাড়া করল। আমি নিষেধ করে বললাম, "আনে দেও গরীব কো।" লাল রঙ, তাই নাম রাখা হল লালু। আমার তাঁবুর কানাতের পাশে সে শোবার জায়গা বেছে নিল, কেননা রোজ রাত্রে খাবার পর তাকে এক মুঠো ভাত দিতাম আমি। এমনি করে ছ'মাস আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেশ মোটা-সোটা হয়েছিল। দু-তিনটে নতুন ঘর ছিল সেখানে, তাতেই আশ্রয় নিয়েছি। লালু সেদিন রাত্রে ঘরের ভিতর শুয়েছে, দু-তিনবার ঠেলে তাকে ঘরের বাইরে রেখে এসেছি, কিন্তু আবার এসেছে। শেষটা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বারান্দায়ই শুয়েছে। ভোরে উঠে ডাকাডাকি, লালু নেই! খচ্চরওয়ালারা বলল, "নিশ্চয় বাঘে নিয়েছে। চিতা বাঘ, কুকুরটা তাড়া করেছিল রাত্রে।"

বেচারা বোধহয় বাঘের গন্ধ পেয়েছিল, আর সেই জন্যই ধমক সত্ত্বেও ঘরের ভিতর ঢুকে শুয়েছিল।

রেলস্টেশনে পৌঁছতে আরও আঠারো-উনিশ দিন লেগেছিল। রেল-স্টেশনে পৌঁছবার আগের দিন এক ফুংগির আশ্রমের উঠানে তাঁবু ফেলেছি,



ম্যালেরিয়ায় ভুগছিলাম, জ্বর এসেছে। তাড়াতাড়ি তাঁবু খাটানো হল, আমি শুয়ে পড়লাম। মে মাস, বেজায় গরম। খালাসীরা তাঁবুর কানাত তুলে বেঁধে দিয়েছে—হাওয়া আসবার জন্য।

একে তো পথ চলবার পরিশ্রম, তার উপর জ্বর, আমার একটু তন্দ্রা এসেছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল—"সাপ! সাপ!" সবে মনে-মনে ভাবছি ডেকে জিগগেস করি "কোথায় সাপ?" আর একটা পাঁচ-ছয় ফুট লম্বা প্রকাণ্ড ধামনসাপ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে তাঁবুতে ঢুকল, আর আমার বুকের উপর দিয়ে ডিঙিয়ে তাঁবুর অন্য পাশ দিয়ে বার হয়ে গেল। লোকজন সবাই "বাপরে! বাপরে!" বলতে-বলতে পিছন-পিছন ছুটে তাঁবুতে ঢুকল, সঙ্গে রামশবদ আর সাদিক হুসেনও এল। আমি চুপ করে শুয়ে আছি দেখে নিশ্চিন্ত হল।

পরের দিন সকালে আমি বললাম, "বুড়ো, চল, গোটেক ভিয়াডাক্ট দেখে যাব। এ বস্তি থেকে একজন গাইড সঙ্গে নাও।"

গোটেক পুল দেখবার মতো জিনিস। মাঝখানে পাহাড়ী নদী, আর দু'পাশে খাড়া পাহাড়, এঁকে-বেঁকে রেল লাইন যতটা সম্ভব নেমেছে। দুটি সুড়ঙ্গও আছে, তারপর পুলের উপর দিয়ে পার হয়েছে। আধ-মাইলের উপর লম্বা পুল, সমস্তটা ইস্পাতের। পুলের উপর থেকে নদীর জল প্রায় ১৬৫ ফুট হবে। তখনো লাইন খোলা হয়নি, পুল তৈরি হচ্ছে মাত্র। খচ্চর, খালাসী প্রভৃতি রাস্তা ধরে রেল স্টেশনে গেল, আমি আর বুড়ো সার্ভেয়ার সোজা পথে পুল দেখতে গেলাম, সঙ্গে দোভাষী আর দুজন খালাসী।

গোটেক-এ পৌঁছলাম। পুল প্রকাণ্ড, অনেক লোক তাতে কাজ করছে। স্লীপার ফেলা হয়েছে, কিন্তু তখনো রেল বসানো হয়নি, দুই কিনারা থেকে লাইন বসাতে আরম্ভ করেছে মাত্র। বুড়ো পুলের কাছে এসে এক নজর দেখে নিল, তারপরেই মুখ ফিরিয়ে খাদে নামতে আরম্ভ

করল। ঐ খাড়া পাহাড়ের গায়ে এক-একটা পাকডাণ্ডি অর্থাৎ সরু পায়ে-হাঁটা পথ আছে, বুড়ো আর খালাসীরা সেই পথে চলল ; আমাকেও বার-বার তাদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করতে লাগল ; বুড়ো বলতে লাগল, "জবরদস্তি মৎ করো বাবা।"

আমি পুলের উপর দিয়েই চললাম। অতি সোজা কাজ, স্লীপার-এর উপর-উপর পা ফেলে চলে যাব। যতটুকু লাইন বসানো হয়েছিল ততটুকু তো নির্বিবাদে চলে গেলাম, কিন্তু তারপরই যত গোলমাল। স্লীপারগুলো ফেলা আছে বটে, কিন্তু তখনো পেরেক মারা হয়নি, কাজেই সেগুলো অতি সহজেই খট্‌খট্ করে নড়ে। স্লীপার-এর মাঝের জায়গাটুকু তখনো খোলা রয়েছে, নিচের দিকে চোখ পড়লেই একেবারে ১৫০-১৬০ ফুট নিচে নদীর জল দেখা যায়, মাথায় যেন একটু-একটু গোল বাধে! এখন কি করি? অতগুলো লোক একদৃষ্টে দেখছে আমার অবস্থা কি হয়, আর আমি কিনা ফিরে গিয়ে হাসির ফোয়ারা তুলব? তা হবে না, এই পুলের উপর দিয়েই পার হব। এক-পা, এক-পা করে অগ্রসর হতে লাগলাম।

মনে করেছিলাম বুড়োর অনেক আগে পার হব, কিন্তু যখন ওপারে পৌঁছলাম, দেখি বুড়ো আমার অপেক্ষায় বসে রয়েছে।

জিগগেস করলাম, "কতক্ষণ?"

"তা কুড়ি-পঁচিশ মিনিট।"

ওপারে পৌঁছে আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

● ৪ ● ১৯০১—১৯০২ ব্রহ্মদেশ ও শান স্টেট। সাদিক হুসেনের যে কাজ আগের বছর শেষ হয়নি, সেই কাজের ভার পড়ল আমার মাথায়। শেষ হলে

অন্য কাজে যেতে হবে। এ-বছর আর বুড়ো রামশবদ নেই, আমি একলাই চলেছি। বুড়ো পেনশান নিয়েছে। একমাস পরে অন্য সব লোক আসবে।

বনের ভিতর মাঝে-মাঝে গ্রাম আছে। আমি নক্সার কাজ করি এবার, সুতরাং সুবিধা পেলেই তাঁবু ফেলি। গ্রামে থাকি, আর কাজ করতে যাই চারপাশের পাহাড়ে, জঙ্গলে। আশে-পাশের পাহাড়-জঙ্গলের ম্যাপ আঁকা হলে, তাঁবু তুলে অন্য গ্রামে চলে যাই, গ্রাম না-থাকলে জঙ্গলেই আড্ডা করি।

এইরকম একটা গ্রামে আমি কিছুদিন ছিলাম। আমার জরীপের কাজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অনেক দূর অবধি দেখতে পাওয়া চাই, নতুবা কাজের সুবিধা হয় না, বিশেষত পাহাড়ের কাজের। পাহাড়ের চুড়োয় চড়েই কাজ আরম্ভ করতে হয়, যদি সেখানে বন থাকে, তাহলে প্রথম কাজ হয় ঐ বন কেটে পরিষ্কার করে কাজের সুবিধা করে নেওয়া। একদিন একটা পাহাড়ে উঠে, সঙ্গের লোকজনদের জঙ্গল কাটতে বলেছি, তারা দা-কুড়ুল নিয়ে তাদের কাজে লেগে গেছে। দু-চার ঘা ভালো করে দিতে-না-দিতেই এমন ভীষণ গর্জন করে একটা ভল্লুক বের হয়ে এল যে কি বলব! সে তার গর্তের ভিতর ঘুমুচ্ছিল, সেই কাঁচা ঘুম কেন ভেঙে দিল সেইজন্য তার রাগ।

যারা তার ঘুম ভাঙিয়েছিল, তারা অবশ্য তাকে দেখেই বাপ-মা'র নাম নিয়ে, প্রাণপণে ছুট দিয়েছিল! ভাল্লুক এসে আর তাদের কারো সাক্ষাৎ পায়নি, কাজেই রাগে গর্‌গর্‌ করতে-করতে আবার বনে ঢুকে পড়ল। মজার কথা এই যে, শেষে আর কেউ স্বীকার করতে চায় না যে ভাল্লুকের ভয়ে তারা পালিয়েছিল। শঙ্কর বলল, "আমি কি পালিয়েছিলাম, আমি গিয়েছিলাম আমার দাখানা আনতে।" এই শঙ্করই আগের বছর বলেছিল যে সে হাতি ছাড়া অন্য কোনো জানোয়ারকে ভয় পায় না!

ভাল্লুক বড় বেখাপ্পা জানোয়ার। ও-দেশের লোকেরা বাঘের চেয়েও ভাল্লুককে ভয় করে বেশি। বাঘে ধরলে হয়তো মেরেই ফেলল—আপদ চুকে গেল। ভাল্লুক বড় কষ্ট দিয়ে মারে, প্রাণে না মারলেও জন্মের মতো খোঁড়া করে দেয়, হয়তো চোখই কামড়িয়ে নিয়ে গেল।

একটা গ্রামে তাঁবু ফেলে ছ-সাত দিন ছিলাম। গ্রামের প্রধানটি বড় ভালোমানুষ, আমার উপর তার বড় স্নেহ জন্মেছিল। তার গ্রাম থেকে ছয় সাত মাইল দূরে হয়তো তাঁবু ফেলেছি, তার এলাকায়ও নয়, তবু সেখানে অবধি আমাকে দেখবার জন্য উপস্থিত হত। হাতে করে আমার জন্য তরি-তরকারী, নানা গ্রাম থেকে যোগাড় করে নিয়ে আসত। যখন তার গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম, তখন তো তার আর আনন্দের সীমাই রইল না। রোজ বিকেলে সে আমার কাছে এসে বসত, আর শিকারের জানোয়ারের আরও কত কিছু গল্প করত। তার ডান হাতখানি কি করে ভাল্লুক ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেই গল্প আমি তখন তার কাছে শুনেছিলাম।

প্রধান, তার গ্রামের আরও কয়েকজন লোকের সঙ্গে জুটে পাহাড়ে বাঁশ কাটতে গিয়েছিল। তাদের দেশে একরকম মোটা বাঁশ হয়, তাতে তাদের কলসীর কাজ চলে। তার এক-একটা চোঙায় পাঁচ-ছয় সের জল ধরে—তারা সেই বাঁশ আনতে গিয়েছিল। পাহাড়ে উঠে সকলে যে যার কাজে ছড়িয়ে পড়েছে—প্রধানও এক জায়গায় খুব মোটা-মোটা বাঁশ দেখতে পেয়ে কাটতে গেছে। বাঁশের পিছনে যে প্রকাণ্ড একটা ভাল্লুক শুয়ে রয়েছে সে তা দেখতে পায়নি। যেমন সে খটাং করে বাঁশের গায়ে কোপ বসিয়েছে, অমনি আর যাবে কোথায়? হ্যাঁও-হ্যাঁও করে বন-জঙ্গল কাঁপিয়ে, ভাল্লুক এসে তার ঘাড়ে পড়ল। প্রধান বেচারা অতশত কল্পনাও করেনি, তার কেমন ভাবাচাকা লেগে গেল, আর হাতের দাখানা কোথায় পড়ে গেল, কি যে করবে কিছুই বুঝতে পারল না। ভাগ্যিস তার সঙ্গের



লোকরা ভাল্লুকের গর্জন শুনে তখুনি ছুটে এসেছিল, তা না হলে সেদিন তাকে মেরেই ফেলত। হঠাৎ অনেকগুলো লোক উপস্থিত হওয়াতে ভাল্লুকটা পালিয়ে গেল, কিন্তু যাবার সময় প্রধানের ডান হাতখানা কব্জীর উপর অবধি ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

এমন জানোয়ারকে লোকে ভয় করবে না তো আর ভয় করবে কাকে? বাঘই হোক, ভাল্লুকই হোক, বনের ভিতর তাদের হল এলাকা—কাজেই সেখানে তাদের বিশেষ হিসেব করে চলতে হয়। সকল সময় আবার হিসেব করবারও সময় থাকে না, তার আগেই ছুট দিতে হয়, বা 'আর কিছু' করতে হয়।

'আর কিছু' কি রকম বলছি শোনো।

ঐ গ্রাম ছেড়ে, আমরা অন্য গ্রামে উঠে গিয়েছি। সেখানে একদিন

কাজ বন্ধ করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, আমরা তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ফিরতে আরম্ভ করলাম। সকলের আগে দুজন শান, তাদের পিছনে আমি, আমার পিছনে দোভাষী, আর তার পিছনে আমার সহিস ঘোড়া নিয়ে। খালাসীরা জরীপের যন্ত্রপাতি ঘাড়ে করে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত পিছনে পড়েছে।

শুকনো নালার ধারে-ধারে, আঁকা-বাঁকা পথ, তার একটা মোড় ঘুরেই তো সামনের শানটি ক্যাঁও-ম্যাঁও করে চীৎকার করে পিছনের দিকে এক লাফ দিয়েছে—পথের মাঝখানে চার-পাঁচ হাত দূরেই এক প্রকাণ্ড বাঘ! বাঘটা তখুনি লাফ দিয়ে নালায় পড়ল। পড়ল, কিন্তু পালাল না, সেইখানেই পায়চারী করতে লাগল।

এদিকে শানরা দুজন পালাবার যোগাড় করছে দেখেই আমি তাদের হাত ধরে ফেললাম, বললাম, "পালাচ্ছ কোথায় ?"

তারা উত্তর দিল, "বাবু, ওটা দুষ্টু বাঘ, দেখ না আমরা অত কাছেই রয়েছি, চেঁচামেচি করছি (পিছনের লোকদের ডাকা হচ্ছিল) তবু যাচ্ছে না, ফিরে-ফিরে আমাদের কাছেই আসছে।"

আমি বললাম, "তা হচ্ছে না বাপু, পিছনে আমার লোক রয়েছে, তারা না-এলে যাওয়া হচ্ছে না।"

এদিকে দোভাষী বনে আগুন ধরাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু হিমে লতা-পাতা ডাল-পালা সব ভিজে রয়েছে, কিছুতেই আর আগুন জ্বলে না। পিছনের লোকগুলোকে যতই ডাকি, "জলদি আও, জলদি আও," লোকগুলো ততই খালি বলে, "আতা হুঁ।"

আবার জিগগেস করে, "কেয়া হুয়া ?"

আমি বললাম, "তুমহারা নানা হিঁয়া বয়ঠা হ্যায় !"

লোকগুলো একটু ঢালু, প্রায় খাড়া জায়গা দিয়ে আসছিল। আমার কথা শুনে ঐ জায়গাটুকু হেঁটে নামবার অবসর হল না তাদের। তাদের

কাপড় আর পিছনের চামড়ার যে কি দশা হয়েছিল সেটা বুঝতেই পার। একেই বলেছিলাম 'আর কিছু' করা।

তখন আমরা সকলে মিলে, দশ-বারোজন এক সঙ্গে কতই চীৎকার করলাম, কিন্তু সে হতভাগা বাঘ কিছুতেই সে জায়গা থেকে নড়ল না। পাতার উপর মড়মড় করে পায়চারী করতে লাগল। তখন আর সেখানে থাকা নিরাপদ না মনে করে, সকলে হাত ধরাধরি করে চলে এলাম। হাত ধরা-ধরি করবার মানে, যাতে কেউ পিছনে পড়ে না থাকে—একলাটি পিছনে পড়লেই বাঘ এসে তাকে ধরবে।

বাঘ কিন্তু আমাদের ধমক-চমক হজম করতে পারল না। সে রাত্রে এসে, আমাদের তাঁবুর পিছনে দাঁড়িয়ে, অনেকক্ষণ ধরে আমাদের শাসিয়ে গেল।

প্রথমে যে গ্রামের কথা বলেছি, সেই গ্রামে বাঘের বড় উৎপাত ছিল। একটা চিতাবাঘ প্রায়ই রাত্রে এসে কুকুর, মোরগ ইত্যাদি যা পেত ধরে খেত। গ্রামের লোকরা সেটাকে মারবার জন্য কত রকম ফন্দি করল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বন্দুক নিয়ে তার অপেক্ষায় বসে থাকলে সেটা কেমন করে বুঝতে পারে, আর অন্য কোথায় চলে যায়—গ্রামের লোকদের রাত জাগাই সার হয়। তীর পেতে রাখলে সে অন্য পথে যাতায়াত করে, তীরের আশে-পাশেও মাড়ায় না। খোঁয়াড় তৈরি করে, তাতে কুকুরছানা পুরে রাখলে সে বেচারা সারারাত খালি কঁ্যাও-কঁ্যাও করে সারা হয়, বাঘ তার খবর নেয় না।

শেষটা তাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান লোক, অনেক চিন্তা করে এক ফন্দি বার করল। বড়-বড় বাঁশের ডগায় খুব মজবুত পাকা বেতের আঁশ বেঁধে সে কতকগুলো বঁড়শীর মতো তৈরি করল। গ্রামের চারদিকে বেড়া দেওয়া, সেই বেড়ার মাঝে-মাঝে ফুটো রয়েছে, আর সেই ফুটো দিয়ে বাঘ

গ্রামে প্রবেশ করে। বুদ্ধিমান লোকটি ঐ সব ফুটোর সামনে এক-একটা করে ঐ বঁড়শী পুঁতল, আর বাঁশ বেঁকিয়ে, ফুটোর মুখে ফাঁদ পেতে, তার সামনে একটা করে মুরগী বেঁধে রাখল।

তারপর দু-তিন দিন গেল। বাঘ আসে, কিন্তু ফাঁদ দেখে যেন সন্দেহ করে আর তাতে পা দেয় না। গ্রামের লোকেরা বলতে লাগল, "আর কেন? এখন ফাঁদগুলো তুলে ফেলি, ওতে কি আর বাঘ পড়বে?" সেদিন রাত্রেই বাঘের চেঁচানীতে তাদের ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি লাঠি সোঁটা, বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে, মশাল জ্বালিয়ে ঘরের বাইরে এসে দেখে, বাঘমশাই বাঁশের ডগায় ঝুলতে-ঝুলতে গর্জন করছেন। তাঁর পিছনের পায়ে ফাঁশ লেগেছে, সেখানে তার দাঁত পৌঁছচ্ছে না, আর ফাঁশ কেটে পালাতেও পারছেন না—খালি ছটফটানি আর তর্জন-গর্জন সার হচ্ছে। আর তা তিনি খুব ভালো করেই করছেন।

এমন তামাশা তো আর হামেশাই জোটে না, কাজেই সারাটা রাত জেগে শানেরা তা দেখল। তামাশায় একটু ঢিল পড়লেই বল্লমের খোঁচা মেরে বাঘমশায়কে আবার চাগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করল না। তারপর সকালে তারা গুলি করে বাঘটাকে মেরে ফেলল।

এর পর আর কোনো বাঘ তাদের মুরগি নিতে আসেনি।

ভিখারী নামে একজন লোক অনেকদিন আমার সঙ্গে ছিল। দু-পয়সা রোজগার করার সুযোগ পেলে সে ছাড়ত না। বদ্যি বল, রোজা বল, ভিখারী একাধারে সব। বদ বুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল তার পেটে।

একটি শান ছেলে প্রায়ই আমাদের ক্যাম্পে আসত। শানদের গোঁফ নেই, আর আমাদের খালাসীদের প্রায় সকলেরই গোঁফ আছে। তা দেখে শান ছেলেটির ভারি শখ হয়েছে তার গোঁফ হোক। সে কত অনুনয়



বিনয় করে খালাসীদের জিগগেস করে, কি করলে তার গোঁফ গজাবে। ভিখারী তাকে বলল, "গোঁফ চেষ্টা করলেই হতে পারে, কিন্তু তাতে খরচ আছে।" ছোকরা তো তা শুনে বড়ই খুশি, খরচ যতই লাগুক সে দেবে। তার গোঁফ হওয়া চাই-ই। তখন ভিখারী খুব গম্ভীর হয়ে বলল,

"পুজো করতে হবে। তাতে ফুল চাই, ধূপ-ধুনো চাই, আর দুটো শাদা ধবধবে মোরগ আর চার সের চাল।"

সেই ছোকরার গোঁফের বড়ই দরকার, বলা মাত্রই সে সমস্ত জিনিস এনে হাজির করল। ভিখারীও নতুন উনুন তৈরি করে, ভাত আর মোরগ চড়াতে একটুও দেরি করল না। যতক্ষণ রান্না হচ্ছিল, ততক্ষণ সে ধূপ-ধুনো নিয়ে বেশ জমকালো রকমের পূজো করল, বিড়-বিড় করে অনেক মন্ত্রও আওড়াল। তারপর সব খালাসী মিলে মোরগের ঝোল আর ভাত পেট ভরে খেয়ে, পরে সেই উনুনের কয়লা, রেড়ির তেল আর একটু চীনা কালি দিয়ে খাসা মলম তৈরি করে সেই শান ছোকরাকে বলল, "এই মলম দিয়ে বেশ করে গোঁফ এঁকে, নাকে-মাথায় কাপড় জড়িয়ে রাত্রে শুয়ে থাকবে, সকালে উঠে দেখবে, এয়া বড় গোঁফ হয়ে আছে। লেকিন্, খবরদার, একটুও যেন মুছে না যায়, তাহলে আর গোঁফ হবে না।

শান ছোকরাও তাই করেছে, কিন্তু, হায়! তার গোঁফ আর গজাল না। তখন সে এসে ভিখারীকে পাকড়াও করল। ভিখারী বলল, "এপাশের আঁকা গোঁফটা একটু মুছল কি করে?"

শান ছোকরা বলল, "রাত্রে কাপড় লেগে মুছে গেছে।"

ভিখারী বলল, "আমি তো আগেই বলেছি, মুছলে আর হবে না।"

আরেকবার ভিখারী গিয়েছিল এক বুড়ির মাথাধরা সারাতে। বুড়ি ভালো হলে তাকে একটা কুমড়ো দেবে। শানদেশের লোকেরা মাচার উপর ঘর বাঁধে। ভিখারী যেমনি সেই মাচার উপর ওঠবার জন্য সিঁড়িতে পা দিয়েছে, অমনি বুড়ির কুকুর এসে তার পায়ের গোড়ায় কামড়ে ধরেছে।

সেদিন আর ভিখারী বেচারার ডাক্তারী করা হল না, তাকেই কাঁধে করে তাঁবুতে আনতে হল!

আগেই বলেছি জঙ্গলের কাজে সকল সময়ে গ্রাম পাওয়া যায় না।

অনেক সময় জঙ্গলের মধ্যে একটু জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে তাঁবু খাটাতে হয়। শুকনো, খটখটে জায়গা আর জল দেখে তাঁবু ফেলতে হয়। এই রকম একটা জায়গায় তাঁবু ফেলা হয়েছে। সঙ্গে আমার ছজন খালাসী, দোভাষী, আর তিনজন শান কুলি। জায়গাটা ভালো নয়, কেননা ঐ বনে পাঁচ-ছ মাইলের মধ্যে আর জল নেই, ঐটুকু মাত্র জল। সকল জানোয়ার ঐখানটায় জল খেতে আসে, চারদিকে তাদের পাঞ্জার দাগ রয়েছে। আমার সঙ্গে ঘোড়া রয়েছে। ঘোড়া, খচ্চরের উপর নাকি বাঘের বড় লোভ। সকলে বলে যে ঘোড়া বা খচ্চর পেলে, বাঘ আর অন্য জানোয়ার ধরে না।

কাজ করে সন্ধ্যার সময় তাঁবুতে ফিরে দেখি, তাঁবুগুলো একটু বেকাদায় খাটানো হয়েছে। পাতা-লতা দিয়ে, ঘোড়ার জন্য একটা চালা করেছে, তার একটা দিক খোলা, খোলা দিকটা আবার জলের দিকে। ধুনি জ্বালিয়েছে মাঝখানটায়। আমি বিশেষ করে বলে দিয়েছিলাম ঘোড়ার জন্য চালাটা যেন মাঝখানে করা হয়, আর দুপাশে দুটো ধুনি করা হয়। দোভাষীকে ডেকে জিগগেস করলাম, "এ কি করেছ? গ্রামের লোক যে বলে দিয়েছিল এখানে বাঘের বড্ড ভয়।"

সে উত্তর দিল, "হুজুর, শানরা বন্দুক এনেছে, ভালো করে পাহারা দেবে, প্রকাণ্ড ধুনি জ্বালবে, তিন-চার রাত কেটে যাবে। কোনো ভয় নেই, জানোয়ার এদিকে আসবে না।"

আমার মনটা কেমন খুতখুঁত করতে লাগল, দোভাষীর কথায় আশ্বস্ত হল না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর, দোভাষী, খালাসী আর শান কুলিরা ধুনির পাশে বসে রাত সাড়ে-নটা-দশটা পর্যন্ত তামাক খেয়েছে, গল্পগুজব করেছে, তারপর শুতে গেছে। আমি আগেই শুয়ে পড়েছিলাম, কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম বলতে পারি না, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কেমন অস্বোয়াস্তির ভাব

মনে। ঘোড়াটার গলার দুপাশে দুটো মোটা বাঁশের কঞ্চি মজবুত দড়ি দিয়ে গলার সঙ্গে বাঁধা। ঐ বাঁশ দুটো একটু পর-পর খটাং-খটাং করে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। ঘোড়াটা অমন করছে কেন? আমার মন বলছে যে, কোনো একটা জানোয়ার তাঁবুর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। এই রকম অস্বোয়াস্তির ভাবটা আরও অনেকবার, অনেক ঘটনায় আমার হয়েছে।

আমার তাঁবুর পিছনেই নালা, নালার ওপারে পাহাড়। হঠাৎ মট করে একটা আওয়াজ হল, যেন কোনো জানোয়ারের পায়ের চাপে একটা শুকনো ডাল বা অন্য কিছু ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারি জানোয়ারের পা পিছলাবার একটু আওয়াজ কানে এল, সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোড়ার গলার খটাং-খটাং শব্দটাও খুব ঘন-ঘন হতে লাগল। আমি সবে মনে করছি উঠে দেখি ব্যাপার কি, আর অমনি ঘোড়াটা এক বিকট চিঁ-হি-হি করে চিৎকার করে উঠল, সঙ্গে-সঙ্গে আমিও জোরে চিৎকার করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম, শশী আর খালাসীরাও চিৎকার করতে-করতে তাদের তাঁবু থেকে বের হল।

কোথাও কিছু নেই! খালি ঘোড়াটা ঠকঠক করে কাঁপছে, গলার রসি-বাঁধা খোঁটা একটা একেবারে উপড়িয়ে ফেলেছে, আর শান স্টেটের ঐ দারুণ শীতের মধ্যেও তার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে।

পাহারাওয়ালা ঘুমিয়ে পড়েছে, ধুনি নিভে গেছে। ধমক দিয়ে আবার ধুনি জ্বালানো হল, কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করা হল আর ঘোড়াটাকে খুলে এনে খালাসীদের তাঁবুর সামনে ধুনির পাশে বেঁধে রাখা হল।

রাত কেটে গেল। ভোরে উঠে শানরা দেখতে পেল কেমন জানোয়ার এসেছিল। ঘোড়ার ঘরের পাশেই তার প্রমাণ মজুদ—বড়-বড় থাবার দাগ—বাঘ! শানরা বলাবলি করতে লাগল, "ঘোড়াটা এখানে রাখা আর নিরাপদ নয়। আমাদের গ্রামে পাঠিয়ে দাও।"

চার মাইল দূরে তাদের গ্রামেই পাঠিয়ে দিলাম। হতভাগা কিন্তু সেখানেও গিয়েছিল ঘোড়টার খোঁজে। তবে কিনা ঘোড়াটা গ্রামের প্রধানের ঘরে ছিল, সেইজন্য বিশেষ কোনো সুবিধা করতে পারেনি, বন্দুকের দু-চারটা আওয়াজ করার পর পালিয়ে গেল।

বর্মার লোকদের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল, বিশেষত শানদের সঙ্গে। মোটের উপর এদের আমার বেশ লাগত, যদিও মাঝে-মাঝে এদের তরকারির গন্ধে এফটু মুশকিলে পড়েছি। তবে এ কথাটা দুদিক দিয়েই খাটে—যেমন তাদের মশলার গন্ধ আমার সয় না, তেমনি আমাদের ঘিয়ের গন্ধও তারা সইতে পারে না।

মাছকে টুকরো-টুকরো করে কেটে হাঁড়ির ভিতর পুরে, হাঁড়ির মুখ ভালো করে বন্ধ করে মাটিতে তিন-চারমাস পুঁতে রাখে, তারপর সেটা পচে একেবারে গলে গেলে, সেটাকে বার করে খায়। এই জিনিসটিকে ওরা বলে 'ঙাপি' আর এমন সরেস জিনিস নাকি এ দুনিয়ায় নেই! আমাদের যেমন ঘি, গরম মশলা, তাদের ঐ জিনিসটাও তেমনি, সব তরকারিতেই তার একটু-একটু দেওয়া চাই, নইলে সে তরকারির 'লজ্জৎ'-ও হয় না, ইজ্জৎও হয় না। এদিকে ঘিয়ের গন্ধে তাদের পেটের ভাত উলটিয়ে আসে!

শুনেছি বর্মার কোন শহরে নাকি এক হিন্দুস্থানী ময়রা খাবারের দোকান করেছিল। কিন্তু তার ঘিয়ে ভাজার গন্ধে বর্মীরা গিয়ে ডেপুটি কমিশনারের কাছে নালিশ করেছিল যে সে এমন দুর্গন্ধময় জিনিস রান্না করে যে তারা সহ্য করতে পারছে না, তাদের ও পাড়ায় বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। গল্পটা প্রথমে শুনে অতিরঞ্জিত মনে করেছিলাম, কিন্তু এমন ব্যাপার আমার নিজেরই ঘটেছিল।

খেটেখুটে সন্ধ্যার সময় তাঁবুতে ফিরেছি—এইবার একটু আরাম করব।

হঠাৎ গোলমাল। ফুংগির আশ্রমে তাঁবু ফেলেছিলাম, ফুংগি মহা খাপ্পা হয়ে উঠেছেন, "এখান থেকে তাঁবু তুলে নাও বা রান্না বন্ধ কর।"

অপরাধ?

আমার লোক লুচি ভাজছিল, তার দুর্গন্ধে নাকি তার প্রাণ আইঢাই!

শশী একদিন খিচুড়ি রেঁধেছে। সেই রাঁধা খিচুড়ির গন্ধ পেয়েই তো সঙ্গের শানরা ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শশী জিগগেস করল, "খাবে?" তারা প্রথমে বলল, "না।" তারপর একটু হাতে নিয়ে, নাক-মুখ সিঁটকিয়ে মুখে দিল। পরে দু-চারবার মুখ নেড়েই তাদের আর হাসি ধরে না, তখন খালি বলে, "আরো দাও, আরো দাও।" শেষে যখন পেট ভরে এসেছে, তখন শশীকে জিগগেস করল, "কি দিয়ে রেঁধেছ?" শশী বলল, "চাল, ডাল, পেঁয়াজ, আদা, হলুদ, লঙ্কা আর ঘি।" সেকথা তারা তো কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, বলে, "ঘিয়ের গন্ধে তো বমি আসে, এতে তা থাকলে কি আর খাওয়া যেত?" যাই হোক, এর পরে তারা প্রায়ই শশীকে খিচুড়ি রাঁধতে বলত।

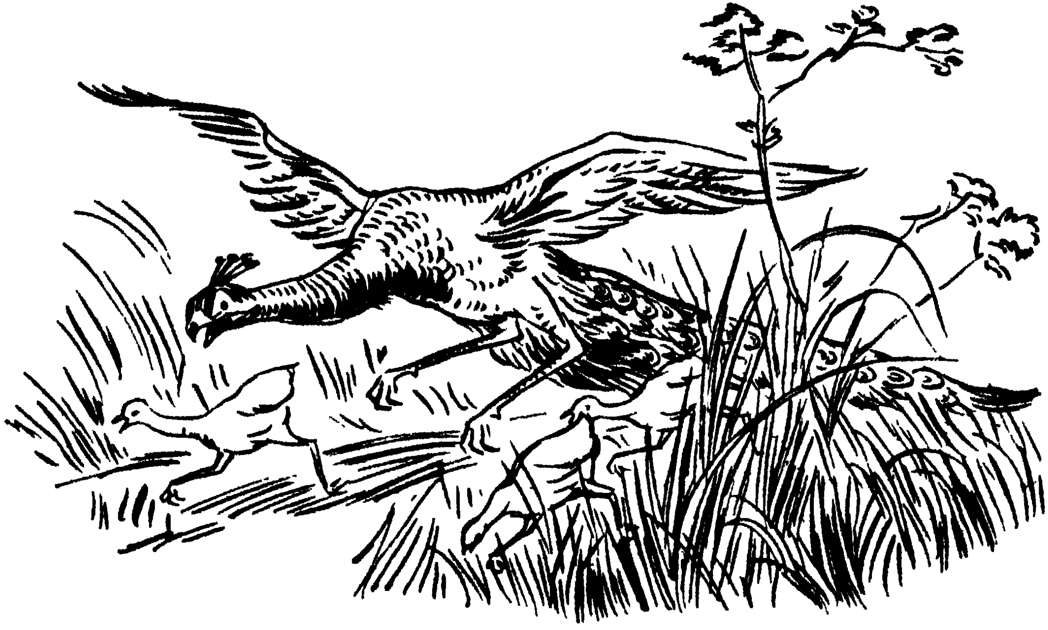
এই বছর, আমার কাজ খানিকটা জায়গায় ছিল যেখানে গ্রাম নেই। বহুকাল আগে নাকি এখানে বড়-বড় গ্রাম ছিল, এখন ঘোর বন। এই জায়গাগুলো জরীপ করবার সময় দশ বারোদিন জঙ্গলে ক্যাম্প করে থাকতে হয়েছিল। যে জায়গাগুলোয় ক্যাম্প করেছিলাম, সেখানে পুরোনো গ্রামের সব চিহ্ন বর্তমান—আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, সুপারি ইত্যাদি ফলের গাছ; পাকা 'ফয়া' অর্থাৎ প্যাগোডা—বৌদ্ধস্তূপ বা মন্দির আর জলের কুয়ো। আমরা চার-পাঁচদিন আগে লোক পাঠিয়ে দুটো কুয়োর জল সেঁচে ফেলে দিয়েছিলাম, তাতে আবার অতি পরিষ্কার জল বেরিয়েছিল, সেই জলই আমরা ব্যবহার করেছিলাম।

একটু দূরে অনেকটা জায়গা জুড়ে শরবন, তার মধ্যে খেতের আল আর জলের নালার চিহ্ন বর্তমান। সমস্ত দেখে-শুনে মনে হয়েছিল যে ঐখানে

নিশ্চয়ই আগে খুব বড় গ্রাম ছিল। এক বুড়ো শানের কাছে তার ইতিহাস শুনেছিলাম।

বহু বছর আগে, আমাদের ক্যাম্পের জায়গায় প্রকাণ্ড এক গ্রাম ছিল, ছোটখাট শহর বললেই চলে—প্রায় দুশো-আড়াইশো ঘর লোকের বসতি ছিল সে গ্রামে। এটা মং-নাই স্টেটের এলাকা। বর্মার রাজা মং-নাই আক্রমণ করেছিলেন, কেন না মং-নাই-এর রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেননি, মং-নাই-এর রাজা কেন বর্মার রাজার সঙ্গে লড়াইয়ে এঁটে উঠতে পারবেন? হাজার-হাজার বর্মী সৈন্য মং-নাই ছেয়ে ফেলল। মং-নাই-রাজ যুদ্ধে হেরে এই গ্রাম থেকে ন-দশ মাইল দূরে এক দুর্গম পর্বত কন্দরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বর্মী সৈন্য এসে এই গ্রাম আক্রমণ করল। গ্রামবাসী যথাশক্তি লড়েছিল, কিন্তু শেষটা হেরে গেল। বর্মীরা গ্রামের বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ সকলকে হত্যা করল, অন্যদের ধরে নিয়ে গেল আর গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। সেই অবধি এই গ্রাম উজাড়; এর কাছেও আর কোনো গ্রামের পত্তন হয়নি।

ঐ গ্রামের ন-দশ মাইল দূরে, যে জায়গায় মং-নাই-রাজ আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেটাও আমি জরীপ করেছিলাম। সে এক অদ্ভুত জায়গা, পনরো-কুড়ি বর্গমাইল হবে, আর দুটি মাত্র প্রবেশ-পথ। চারদিকে কাঁটা ও পাথরের পাহাড়, দেয়ালের মতো খাড়া আর ক্ষুরের মতো ধারাল, চার হাত-পায়ে চড়াও মুশকিল। দুদিকে দুটি মাত্র প্রবেশ-পথ যা আছে তাতেও এক সঙ্গে একজনের বেশি চড়তে পারে না। তাও আবার এমন খাড়া যে উপরে দশজন মাত্র লোক বসে থাকলে, হাজার লোক শত চেষ্টাতেও উঠতে পারবে না। আজও সেখানে সব প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথর সাজানো রয়েছে, এইসব পাথর শত্রুর উপর গড়িয়ে দেওয়া হত। বার দুই তিন চেষ্টা করে, বহু লোক বলি দিয়ে বর্মী সৈন্য সেখান থেকে পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য হয়েছিল।



এই জায়গাটুকুর মধ্যে কোনো নালা নেই, কিন্তু অনেকগুলো বড়-বড় 'ডেভিলস কলড্রন' আছে আর তাতে বেশ সুস্বাদু জল। মং-নাই-রাজ আর তাঁর লোকজনের জলের অভাব হয়নি।

আমার কাজ শেষ হলে, দু-তিনজন সার্ভেয়ারের কাজ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। একদিন একজন সার্ভেয়ারের কাজ দেখে ফিরছি, হঠাৎ ঝোপের ভিতর কি একটা নড়ল। ক্যাঁও-ক্যাঁও করে একটা ময়ূর উড়ে গেল, আর তার ডানার আড়াল থেকে তিনটে বাচ্চা বার হয়ে চি-চিঁ করে ছুটোছুটি করতে লাগল। তাড়া করে একটাকে ধরলাম। বাচ্চাটা পায়রার মতো বড়। আমি তাকে ধরে বুকে করে নিয়ে চলেছি আর বেচারার কি কান্না—ঠিক যেন তার মাকে ডাকছে। আমার বড় দুঃখ হল, বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিলাম। সে বেচারা অমনি যেদিকে তার মা গিয়েছিল, সেদিকে দৌড়ে গেল আর তার মাকে ডাকতে লাগল। উড়বার শক্তি তখনো হয়নি। মাকে পেল কিনা তা ভগবানই জানেন।

এবারকার মতো কাজ শেষ হল। আমরা আবার আমাদের হেড আপিস, ব্যাঙ্গালোরে ফিরে গেলাম।

● ৫ ● ১৯০২—১৯০৩। কেংটুং রাজ্য। এবার আমাদের ঢের দূরে যেতে হবে—রেলের লাইন থেকে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশদিনের পথ। আমার ঘাড়ে আবার দূরবীণের কাজ পড়েছে। সঙ্গে অনেক লোক আর ভারবাহী খচ্চর, বলদও প্রায় ষাট-পঁইষট্টিটা। আঠারো দিনের পথ চলে এসে আমরা একটা বড় নালার ধারে, এক ফুংগির আশ্রমে তাঁবু খাটিয়েছি।

নদীতে বাঁধ দিয়ে ফুংগি মাছ পুষেছেন। মাছগুলোকে ফুংগি বড় ভালোবাসেন, রোজ ভাত রেঁধে তাদের খেতে দেন। মাছও ঢের, জলে একটা কিছু ফেললেই চল্লিশ-পঞ্চাশটা এসে জড়ো হয়। আমরা লেবুর খোসা ফেলে অনেকক্ষণ ধরে তাদের তামাশা দেখলাম। সঙ্গের লোকদের রকম-সকম দেখে মনে হল যেন মাছগুলো দেখে তাদের জিভ দিয়ে জল পড়ছে। আমি সেইজন্য তাদের সাবধান করে বললাম, "খবরদার, ফুংগির মাছ যেন ধর না।" তারা ব্যস্ত হয়ে জিভ কেটে বলল, "আরে রাম, ফুংগির মাছ ধরতে যাব ?" আমার কিন্তু সন্দেহ মিটল না, আর কাজেও তাই হল। রাত্রে আমি যেই ঘুমিয়েছি অমনি তারা গিয়ে দুটো মাছ ধরেছে। এ খবর অবশ্য আমি পরে পেয়েছিলাম।

এর শাস্তি ভগবান হাতে-হাতেই দিয়েছিলেন। পরের দিন আমাদের সালউইন নদী পার হতে হবে। আমি আরও দুবার এই পথে যাওয়া-আসা করেছিলাম, কাজেই রাস্তা আমার বেশ ভালো করেই জানা। আমি আগের দিন বিকেলে সকলকে ডেকে একটা পাহাড় দেখিয়ে বললাম, "ঐ পাহাড়ের

নিচে গিয়ে দুটো পথ পাবে। যেটা পাহাড়ের উপর উঠে গেছে সেটাই আসল পথ। যেটা নালার ধারে-ধারে গেছে, সে পথে যেও না, গেলে দুদিনেও সালউন নদীতে পৌঁছতে পারবে না।”

তাদের কপালে দুর্ভোগ ছিল, তারা সেকথা শুনবে কেন? তারা আমার আধ-ঘণ্টা আগে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল, আর গিয়েছিল ঠিক যে পথে যেতে আমি নিষেধ করেছিলাম, সেই পথে। পাহাড়ের নিচে এসেই তাদের পায়ের দাগ দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ব্যাপারখানা কি। আমি তখনই তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য একজন লোককে দৌড়িয়ে পাঠালাম, তারা তার কথা গ্রাহ্যই করল না।

তাদের সঙ্গে একজন ভারি চালাক সার্ভেয়ার ছিল, সে নাকি আগের বছর এই সমস্ত জায়গা জরীপ করে গেছে। সে বলল, “পাহাড়ের রাস্তা বড় বিশ্রী, তাতে বেজায় চড়াই। আমি রাস্তা জানি, চল নদী ধরে যাই, ওদের ঢের আগে পৌঁছব।”

সেই ফাজিলের কথায় ভুলে বেচারারা বারোটা-সাড়ে-বারোটা পর্যন্ত নালায়-নালায় চলেছে, কখনো এপার, কখনো ওপার। তারপর কয়েকজন হাতিওয়ালার কাছে জানতে পারল যে সেদিকে আর পথ নেই। কাজেই তখন আবার সেই পাহাড়ের তলায় ফিরে আসতে হবে—এদিকে পা কিন্তু আর চলে না। দু-টাকা বকশিস কবুল করে, এই পথটুকু হাতিতে করে পৌঁছে দেবার জন্য হাতিওয়ালাদের রাজী করিয়েছিল, কিন্তু হাতিটা কিছুতেই তাদের বইতে রাজী হল না। দুপুরের রোদে তার মেজাজ বিগড়িয়ে গিয়েছিল, মাহুত যত তাকে বসতে বলে, হাতিটা ততই আরও চটে যেতে লাগল। কাজেই হেঁটে আসা ছাড়া অন্য উপায় আর রইল না।

এদিকে আমি সমস্ত জিনিসপত্র, খচ্চর, বলদ সুদ্ধ নদী পার হয়েছি, আর বালির উপর তাঁবু খাটিয়ে, কতক্ষণ অবধি তাদের আশায় বসে রয়েছি।

বসে-বসে সন্ধ্যা হয়ে গেল, আমি খালি ভাবছি—"তাইতো, তারা এখনো এসে পৌঁছল না। ভোরে সাড়ে-চারটের সময় বেরিয়েছে আর এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে—রাস্তা তো মোটে দশ মাইল।" এমন সময় একজন খালাসী বলল, "ঐ বাবুরা আসছে।" চেয়ে দেখি নদীর ওপারে তাদের দেখা যাচ্ছে, চলতে আর পারছে না। এক বেচারা তো নদীর কিনারায় পৌঁছে বালির উপর শুয়ে পড়ল, তার ওজন তিন মণ ছাব্বিশ সের! দেখে আমার বড় দুঃখ হল, তাড়াতাড়ি তাদের পার করিয়ে আনিয়ে, চা খাইয়ে একটু ঠাণ্ডা করলাম।

সেই চুরি-করা মাছ দুটো আর তাদের খাওয়া হল না, সেগুলো রোদে একেবারে পচে গিয়েছিল। দোভাষীরা বলাবলি করতে লাগল, "ফুংগির মাছ চুরি করার সাজা!"

সেই রাত্রে আমার চাকর শশীকে খাবার জন্য তার তাঁবুতে এক বাঘ ঢুকেছিল আর ঘড়ির এ্যালার্মের শব্দে পালিয়ে গিয়েছিল। শশী কিন্তু আগে বুঝতে পারেনি যে ওটা বাঘ, সে মনে করেছিল খচ্চর। তাই সে খচ্চরওয়ালাদের গালি দিয়েছিল, "বেটারা বড় পাজি। রোজ বলি খচ্চর বেঁধে রাখ, তা শোনে না। একদিন খচ্চরের পা ভেঙে দেব তখন বুঝতে পারবে।"

সকালে উঠেই আমাদের কাজে বের হতে হয়, তার আগে রান্না-বান্না তৈরি চাই, তাই শশী রাত চারটের সময় ওঠবার জন্য ঘড়িতে এ্যালার্ম দিয়ে রাখে। রাত্রে যখন সকলে ঘুমে অচেতন, বাঘ এসে শশীর তাঁবুতে ঢুকেছে। একেবারে ভিতরে আসতে পারেনি, তাঁবুর কানাতের তলা দিয়ে বুক অবধি ঢুকিয়ে ঠেলাঠেলি করছিল আর চারদিকে হাতড়াচ্ছিল—এক বিঘৎ আর এলেই শশীর মাথাটা পাবে। এমন সময় 'ক্র-ড়-ড়-র-র' শব্দে এ্যালার্ম বেজে উঠল। বাঘ বোধহয় ভাবল, "সর্বনাশ! বুঝি বা আকাশ ভেঙে পড়ল।"

বেজায় চমকে গিয়ে অমনি সে এমন এক লাফ দিল যে, তাঁবুর দড়ি ছিঁড়ে, খোঁটা উপড়িয়ে, তাঁবু সুদ্ধু ওলট-পালট ! শশীর এতে ঘুম ভেঙে গেছে, সে উঠেই খচ্চরওয়ালাদের গাল দিতে লাগল। গোলমাল শুনে সকলে ছুটে এসে দেখি কি ভয়ানক ব্যাপার। তাঁবুর ভিতরে বাঘের বুকের দাগ আর নখের আঁচড় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভগবানের কৃপায়, ঠিক সময়মতো এ্যালার্ম না পড়লে আর উপায় ছিল না !

এ-বছর আমার সঙ্গে খানসাহেব আ- দূরবীণের কাজ শিখতে গিয়েছিলেন। খানসাহেবের বিশাল দেহ, ছ-ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, বুক ৪৮" কোমর ৫৪", ওজন তিন মণ ছাব্বিশ সের। আজি জংশনে ওজন করেছিলাম তাঁকে।

আমি তো দশ দিনের পথ চলে ঘোড়া কিনেছি, খানসাহেব পদব্রজেই চললেন এবং প্রায় দুশো মাইল হেঁটে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন কাজ আরম্ভ হল, তখন তাঁর একটু কষ্ট হতে লাগল। তিনি তাঁর উপযুক্ত একটা ঘোড়া খুঁজতে লাগলেন। তাঁর উপযুক্ত ঘোড়া কি আর সে-দেশে মেলে ?

আমরা এবার শ্যামরাজ্যের সীমানায় কাজ করছিলাম। প্রত্যেকের সঙ্গে কুড়িজন সেপাই ও একজন হাবিলদার ছিল পাহারার জন্য। একজন সুবেদারের অধীনে সবসুদ্ধ আশীজন সেপাই এসেছিল। এই সুবেদারের সঙ্গে খানসাহেবের চীন দেশে বক্সার লড়াইয়ের সময় আলাপ হয়েছিল আর বেশ ভাবও হয়েছিল। খানসাহেব ঘোড়া খুঁজছেন আর উপযুক্ত ঘোড়া মিলছে না শুনে সুবেদারসাহেব ঠাট্টা করে বললেন, "আরে খানসাহেব, ভঁইষী লে লেও, সাওয়ারী ভি করোগে, আউর দুধ ভি পিওগে !" খানসাহেব তো মহা খাপ্পা ! এখানে বলে রাখি খানসাহেব দুধের বড় ভক্ত। আমরা টিনের দুধ দিয়ে চা খাই, কিন্তু তাঁর রোজ টাটকা দুধ চাই, আর সেই দুধের জন্য দোভাষীর উপর রোজ তম্বি করতেন, সুবেদার সেটা লক্ষ্য করেছিলেন।

খানসাহেব বাহাদুর লোক ছিলেন। নানা দেশে তিনি ঘুরেছিলেন, অনেক কাজ তিনি করেছিলেন। তার ফলে কুড়ি টাকায় কাজে প্রবেশ করে পাঁচশো টাকার পেনশান নিয়েছিলেন, আর প্রথমে 'খান সাহেব' ও পরে 'খানবাহাদুর' উপাধি লাভ করেছিলেন। শ্যাম দেশের সীমা কমিশন, চীনা সীমা কমিশন, বক্সার যুদ্ধ, তুরস্ক-পারস্য সীমা কমিশন প্রভৃতিতে খুব কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

আমি যখন প্রথম শান স্টেটে কাজ করতে যাই, সেই বছর ও তার আগের দু-তিন বছর খানসাহেব ও আমাদের আপিসের আরও কয়েকজন চীন সীমা কমিশন-এ কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে একবার একটা বীভৎস কাণ্ড হয়েছিল, তার গল্প খানসাহেবের কাছে শুনেছিলাম।

ঐ সীমা কমিশনে তাঁদের সঙ্গে কে- নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় সার্ভেয়ার ছিল। লোকটি খুব কাজের, কিন্তু বড় মাতাল, আর সেজন্য তাকে কখনো-কখনো মুশকিলে পড়তে হত। যে সময়ের কথা বলছি, তখন তাঁদের তাঁবু ছিল চীনের এলাকায়। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, সকলেই তাঁবুতে পৌঁছে গেছে, কিন্তু ঐ মহারাষ্ট্রীয় সার্ভেয়ারটি তখনো আসেনি।

কি হল ? শত্রুর দেশ এটা, কোথায় গেল ? তাদের বড় সাহেব ব্যস্ত হয়ে তাকে খুঁজবার জন্য চারদিকে লোক পাঠালেন। সকলে ফিরে এল, কিন্তু কে-র কোনো খবর পাওয়া গেল না। সাহেবের দোভাষী ছিল একজন চীনা, সেও খুঁজতে গিয়েছিল। কোনো খবর না পেয়ে সেও তাঁবু-মুখো ফিরে চলল। গিয়েছিল গ্রামে-গ্রামে ঘুরে, কিন্তু ফিরবার সময় মাঠের মাঝখান দিয়ে সোজা তাঁবুর দিকে চলল। মাঠটার মাঝামাঝি এসে একটা বিকট দুর্গন্ধে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হল।

"কিসের গন্ধ ? কোত্থেকে আসছে ? নিশ্চয় গ্রামের জমানো সারের কুণ্ডের মুখ খোলা পড়ে আছে আর হাওয়াতে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে চারদিকে।"

ঐ-দেশে গ্রামবাসী সকলের মল একটা প্রকাণ্ড কুণ্ডে জমা করে রাখা হয়, আর বৃষ্টির জলে সে এক বিটকেল ব্যাপার হয়। লম্বা বাঁশের ডগায় 'হাতা' বাঁধা, তা দিয়ে ঐ নরক-কুণ্ড থেকে তুলে-তুলে জমিতে সার দেওয়া হয়। একটা প্রকাণ্ড কাঠের ঢাকনি দিয়ে কুণ্ডের মুখটা রাত্রে ঢেকে রাখা হয়। দোভাষী চীনা, কাজেই সে বুঝতে পারল যে নিশ্চয় আজ কোনো কারণে কুণ্ডের মুখ খোলা পড়ে রয়েছে। ভাবল ওটাকে বন্ধ করে যাই।

কুণ্ডের কাছে গিয়ে তো চক্ষুস্থির ! কুণ্ডের ভিতরে কি যেন নড়ছে আর হাবুডুবু খাচ্ছে। ডাকল—উত্তর শুনেই বুঝল যে ঐ সার্ভেয়ার। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে ক্যাম্পে এসে সকলকে খবর দিল। তখন সকলে গিয়ে তাকে তুলল। একটা মজবুত রশি গর্তে ফেলে দিল, কে- সেটাকে তার বুকে জড়িয়ে বাঁধল, আর সবাই মিলে টেনে তাকে ঐ নরক-কুণ্ড থেকে তুলল।

বলা বাহুল্য, মদের নেশা তার আগেই ছুটে গিয়েছিল।

তারপর কত সাবান দিয়ে যে তাকে পরিষ্কার করা হয়েছিল তা বুঝতেই পার।

সেদিন হাট ছিল। ও-দেশে হাটে খুব মদ বিক্রি হয়। হতভাগা কাজ শেষ করে খুব মদ খেয়েছিল। তারপর বোধহয় টলতে-টলতে ঐ মাঠের মাঝখান দিয়ে তাঁবুতে আসছিল, আর পড়েছে ঐ নরক-কুণ্ডের মধ্যে !

অত শাস্তিতেও সে মদ ছাড়েনি, পরিণামে মদ খেয়ে-খেয়েই শেষে মারা গিয়েছিল।

ঐ চীন সীমা কমিশনে বুড়ো সার্ভেয়ার রামশবদও এক বছর কাজ করতে গিয়েছিল। সেখানে তাদের একটা খুব খাড়া পাহাড় চড়তে হয়েছিল। পাহাড়টাতে গাছপালা নেই, খালি ছোট-ছোট ঘাস আর গুড়িগুড়ি পাথর আর বেজায় খাড়া। রামশবদের সঙ্গে এক সাহেব অতি কষ্টে পাহাড়ে চড়ে কাজ করলেন, কিন্তু নামবার সময় প্রাণ ওষ্ঠাগত ! ওঠবার বেলা তবু

ঘাস ধরে-ধরে উঠেছিলেন, নামবার বেলা আর ধরবার কিছু নেই, ছোট-ছোট নুড়ি পাথরে পাও রাখা যায় না, পিছলে যায়। দু-চারবার চেষ্টা করবার পর সাহেব তো মাটিতে বসলেন আর পিছন ছেঁচড়ে দিব্যি নেমে এলেন। তাঁর মোটা কর্ডের পেণ্টেলুনেরও কিছু ক্ষতি হল না। বুড়োর আর সে রকম করবার সাহসে কুলোচ্ছে না, এদিকে সাহেব বিষম তাড়া দিচ্ছেন, "আরে জল্‌দি আও না! বৈঠ্ বৈঠ্ কর উৎরো!"

কি আর করা, অগত্যা তাই করতে হল।

এদিকে সাহেব তাড়া দিয়েই পথ চলতে শুরু করেছেন, পিছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে জিগগেস করলেন, "আয় গিয়া রমশবদ?"

"হাঁ, হুজুর, আয়া তো, লেকেন্ আধা পাৎলুন পাহাড় পর রহ্ গিয়া!"

বেচারার জীনের পাজামার পেছন দিকটা পাহাড়ে রেখে আসতে হয়েছে!

একদিন আমরা একটা বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, পথে দেখি একটা গ্রামের ঘরদোর সব পড়ে রয়েছে কিন্তু জনমানুষ নেই। দিনের বেলায় পর্যন্ত বাঘ এসে গ্রাম থেকে মানুষ ধরে নিয়ে যেত, সেইজন্য সবাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। কাজের জন্য এমন বনের মধ্যে দিয়েও চলতে হয়। একলাটি যাবার যো নেই, অমনি বাঘ এসে ধরে খাবে। আমাদের সঙ্গে একজন মুসো এসেছে পথ দেখাবার জন্য, সে আবার আরও দুজন মুসোকে সঙ্গে এনেছে, নয়তো আমাদের পৌঁছে দিয়ে ফিরবার সময় তাকে বাঘে ধরবে। বনের মধ্যে রাত হয়ে গেলে তারা 'আড্ডায়' থাকবে। আড্ডাগুলো আবার পাঁচিলঘেরা বাড়িঘর নয়, শুধু বাঁশের ঝোপের আগায় একখানি মাচা, তাইতে চড়ে বসে কাঁপতে-কাঁপতে রাত কাটাতে হয়।

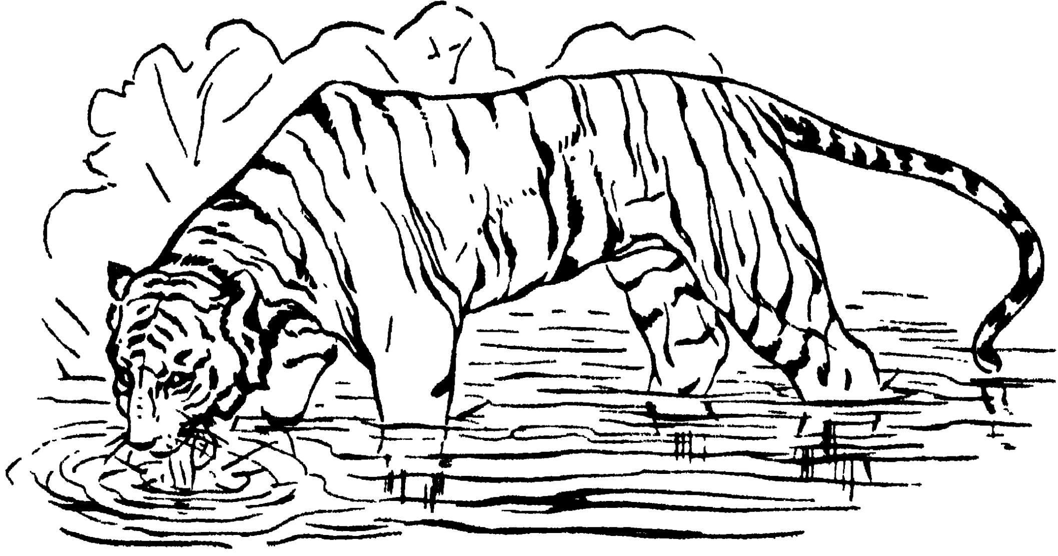
বাঘেরা বেশ জানে যে সে-বনের ভিতর তারাই রাজা। বেলা সাড়ে-আটটার সময় ঘোড়ায় চড়ে একটা নদী পার হচ্ছি, সঙ্গে পাঁচ-ছজন লোক।

নদীর মাঝামাঝি এসে দেখি এই বড় একটা বাঘ প্রায় আমাদের রাস্তার উপরে দাঁড়িয়েই জল খাচ্ছে। আমরা যে আসছি সেজন্য তার কোনো ভাবনা-চিন্তাই নেই। দু-এক চুমুক জল খায় আর মাথা তুলে এক-একবার আমাদের দেখে নেয়। আমরা অনেক চ্যাচামেচি করাতে আস্তে-আস্তে উঠে, রাজার মতো চালে সেখান থেকে চলল। দু-চার পা যায় আর ঘাড় ফিরিয়ে এক নজর আমাদের দেখে। ততক্ষণে পিছন থেকে আমাদের আরও ঢের লোকজন এসে পড়েছে, সকলে মিলে মহা সোরগোল তুললে পর বাঘটা ছুটে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

সেখান থেকে একটা গ্রামে গিয়ে দুদিন ছিলাম। তারপর আমাদের ঐ পথেই ফিরতে হবে আর ঐ জায়গাতেই রাত কাটাতে হবে। গ্রামের প্রধান অনেক মানা করল, কিন্তু কিছুতে আমাদের ফেরাতে না-পেরে, শেষটা দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে নিজেই বন্দুক হাতে আমাদের সঙ্গে চলল।

বিকেলে দুই নালার মোহানায় এসে তাঁবু খাটিয়েছি, চাকর-বাকররা কেউ রাঁধতে, কেউ খেতে, কেউ বা বাসন মাজতে ব্যস্ত। আমি তাঁবুর সামনে চেয়ারে বসে, পরদিনের কাজের পরামর্শ করছি। এমন সময় হঠাৎ আমার মনে হল, নালার দুই মোহনার কাছে একটা বড় গাছের আড়াল থেকে গলা বাড়িয়ে একটা কি যেন আমাকে দেখছে! বার কয়েক আমি হঠাৎ কথা বন্ধ করে সেইদিকে তাকাতে কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না। শেষটা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম দুটো কী জিনিস জ্বল-জ্বল করে উঠল।

আর বুঝতে বাকি রইল না ও দুটো বাঘের চোখ। অমনি তো আমি "বন্দুক আন্" বলে লাফিয়ে উঠেছি, আর বাঘও আর লুকিয়ে থেকে কোনো লাভ নেই দেখে দুই লাফে একেবারে আমার পায়ের নিচে। ছ-সাত ফুট নিচে হবে, আর দূরও হবে ছ-সাত ফুট।



এদিকে খালাসী মশাইরা বাঘের নাম শুনেই যে যার কাজ ফেলে, তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দরজা এঁটে দিয়েছেন। বন্দুকটা এনে দিতে কারো সাহসে কুলোল না। অগত্যা নিজেই তাঁবুর ভিতর থেকে রিভলভারটা নিয়ে এলাম। কিন্তু এসে আর বাঘটাকে দেখতে পেলাম না। সে হল্লা শুনে বেগতিক বুঝে সরে পড়েছে। পাতার উপর মড়মড় পায়ের আওয়াজ শুনে, সেইদিকে দু-তিনবার আওয়াজ করলাম। এতক্ষণে খালাসীদের মুখে কথা ফুটল, একজন বলতে লাগল, "কেয়া দেখা হুঁ। এত্তা বড়া থা, উধারসে চলা গিয়া।"

একটা পাহাড়ে কাজ করতে গিয়েছিলাম, সেটাকে দূর থেকে দেখলে একটা দেয়াল বলে মনে হত। ঐ জঙ্গলে থাকতে হবে অন্তত দুই রাত, সেই মুসো বস্তি থেকে কুলি নিয়ে গিয়েছি। পাহাড়ের মাঝামাঝি আট-দশ ইঞ্চি চওড়া একটু পথ, মুসোদের শিকারের রাস্তা, তার নিচেই একেবারে খাড়া দেয়ালের মতো পাহাড়। সেই পথে আমরা যাতায়ত করি।

একদিন সকালে উঠে আমি কাজে বেরিয়ে গিয়েছি, মুসো কুলিরাও জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে। পিছনে আছে খালি আমার চাকর শশী, একজন দোভাষী, আর শঙ্কর ও মঙ্গল নামে দুজন খালাসী।

মঙ্গলের সঙ্গে দোভাষীর কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে। মঙ্গল তাই চটে, "যাই সাহেবের কাছে রিপোর্ট করি" বলে চলে গেছে। তখন দোভাষী ভাবল যে তাড়াতাড়ি গিয়ে মঙ্গলের সঙ্গে ভাব করতে হবে, কি জানি যদি সত্যি রিপোর্ট করে বসে। বিদ্ঘুটে রাস্তা, পা হড়কালেই একশো-দেড়শো ফুট নিচে গড়িয়ে পড়তে হবে। দোভাষী ভয়ে-ভয়ে মাথা হেঁট করে পথের উপর চোখ রেখে চলেছে, আবার ক্ষণে-ক্ষণে মুখ তুলে দেখছে মঙ্গলকে দেখা যায় কিনা।

মঙ্গলের আবার তামাক খাবার রোগ। পথ চলতে-চলতে ক্রমাগত তাকে কলকে হাতে নিয়ে দাঁড়াতে হয়। দোভাষী একবার মুখ তুলে দেখতে পেল যে একটু সামনেই বাঁশঝাড়ের আড়ালে লাল পানা কি একটা দেখা যাচ্ছে। মঙ্গলের মাথায় লাল পাগড়ি, তাহলে নিশ্চয়ই মঙ্গল ওখানে বসে তামাক সাজছে। দোভাষী তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, আর মাথা নিচু করেই বলতে লাগল, "হ্যাঁ ভাই মঙ্গল, এটা কি ভালো হল? এক জায়গায় দশ-পাঁচটা হাঁড়ি থাকলে একটু-আধটু ঠোকাঠুকি হয়ই, তাই বলে কি কথায়-কথায় উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করতে আছে?" বলতে-বলতে সে বাঁশঝাড়ের সামনে এসে পড়েছে আর মুখ তুলেই দেখে— বাবা গো, কোথায় মঙ্গল? এ যে প্রকাণ্ড বাঘ ওঁৎ পেতে রয়েছে, আর দোভাষীর দিকে চেয়ে-চেয়ে লেজ ঘুরোচ্ছে!

দোভাষী তাড়াতাড়ি তার ছোট্ট তলোয়ারখানার মুখ বাঘের দিকে ধরে নিয়ে দাঁড়াল, যদি বাঘটা লাফিয়ে পড়ে!

বাঘটাও উঠে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু মাঝখানে বাঁশঝাড়, তাই আর লাফাবার সুবিধা পাচ্ছে না। দোভাষী ভাবছে শশী আর শঙ্কর তার পিছনে, শশী এখুনি বন্দুক চালাবে, কিন্তু শশী যে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে জুতোর ফিতে বাঁধছে তা কি আর সে জানে! শেষে যখন একটুখানি মুখ ফিরিয়ে

দেখে বুঝল যে পিছনে কেউ নেই, তখন সে চিৎকার করে উঠল। চিৎকার কি সহজে বের হতে চায় ? ভয়ে বেচারার গলা শুকিয়ে গেছে। যাই হোক, একটা গলাভাঙা গোছের আওয়াজ শশীর কানে পৌঁছুল, আর তখুনি তারা "ভয় নেই, ভয় নেই" বলে ছুটে এল। বাঘটাও তাই দেখে থতমত খেয়ে 'হুপ্' বলে গাল দিয়ে ছুটে পালাল। দোভাষী তখন ঠকঠক করে কাঁপছে, ঘামে তার গায়ের কাপড় সমস্ত ভিজে গেছে, কথা বলতে পারছে না। অনেক কষ্টে বললে, "বাঘ!"

এর পর আর সে কখনো একলা পথ চলত না।

এই শান স্টেট থেকে আমি দুটো বাঘের চামড়া এনেছিলাম। এই বাঘ-মারার ইতিহাসটি বেশ। একজন লোক বনে হরিণ মারতে গিয়েছিল। একটা হরিণের পায়ের দাগ ধরে তাকে খুঁজে বের করে সে গুলি করতে গেল, কিন্তু বন্দুকে আর আওয়াজ হল না, যাকে বলে মিস্-ফায়ার হওয়া। ঘোড়া তুলে আবার মারতে গেল, এবারও আওয়াজ হল না। লোকটা ভাবল বুঝি ক্যাপটাই খারাপ, ট্যাঁকে আরও ক্যাপ ছিল, তার একটা বের করতে গেল। কোঁচড় থেকে ক্যাপ বের করতে গিয়ে মুখ ফিরিয়েই দেখে তার পিছনেই প্রকাণ্ড এক বাঘ, সাত-আট ফুট দূরেও নয়। এই তাকে ধরে আর কি! তখন সে ভয়ের চোটে সেই খারাপ ক্যাপসুদ্ধই বন্দুক তুলে ঘোড়া টিপে দিলে, আর কি আশ্চর্য! গুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ হল, সঙ্গে-সঙ্গে বাঘের মগজও উড়ে গেল। ভগবান যাকে রক্ষা করেন, বাঘও তাকে মারতে পারে না।

অন্য বাঘটাকে মেরেছিল একটি বারো বছরের ছেলে। দুপুরবেলা মুসোদের গ্রামের মেয়ে-পুরুষরা সকলে খেতে কাজ করতে গেছে, গ্রামে আছে কেবল ছেলেপিলের দল। সে-দেশের ঘর হয় মাচার উপর, উপরে মানুষরা থাকে আর নিচে থাকে তাদের পোষা জন্তুজানোয়ার। দিনের

বেলাতেই একটা বাঘ একজনের ঘরের নিচে ঢুকে একটা শূয়র ধরেছে, আর শূয়রটা চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তুলেছে।

সেই ঘরে ছিল ঐ বারো বছরের ছেলেটি আর তার বাবার গুলিভরা বন্দুক। সে আস্তে-আস্তে উঠে, মাচার বাঁশের ফাঁক দিয়ে এক গুলিতেই বাঘমশাইয়ের শূয়র খাবার শখ মিটিয়ে দিল। তারপর গ্রামসুদ্ধ লোক মজা করে ঐ বাঘের মাংস খেল!

ঐ বছরই আমি একটা পাহাড়ে দূরবীণের কাজ করতে গিয়েছিলাম। গ্রাম অনেক দূরে, তাই মনে করেছিলাম যখন পাহাড়ের উপর জল আছে তখন সেখানেই জলের কাছে তাঁবু খাটাব আর দু-রাত ঐখানেই কাটাব। গ্রামের লোকরা কিন্তু বেঁকে দাঁড়াল। "ও-পাহাড় ভালো না। ওখানে 'নাট' (অপদেবতা) আছে, লোকের উপর অত্যাচার করে, হাতি দিয়ে পিষিয়ে মারে," ইত্যাদি।

হয়তো জঙ্গলে বুনো হাতি আছে সেইজন্য অনিচ্ছা। পাহাড়টার চূড়োয় চূড়োয় বুনো হাতির রাস্তা। রাজার লোক আমার সঙ্গে ছিল, সে গ্রামের প্রধানকে অনেক বুঝিয়ে বলল, কিন্তু কোনো ফল হল না। তাদের মহা ভয় পাহাড়ে যদি সরকারের লোকের কোনো অনিষ্ট হয়, তাহলে রাজা হয়তো আবার তাদের ধরে টানাটানি করবেন।

আমি দেখলাম তাদের যখন অত অনিচ্ছা, তখন জোর-জবরদস্তি করে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। জিগগেস করলাম, "যদি আমরা খুব ভোরে, এই চারটে-সাড়ে-চারটেয় কাজে বেরোই তাহলে কখন চূড়োয় পৌঁছব?" তারা হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল, "সূর্য এইখানে উঠলে পর," আন্দাজ বেলা দশটায়। আমি বললাম, "আমি যদি এইখানেই তাঁবু রেখে দিই আর ভোরে বেরিয়ে, কাজ সেরে, তোমাদের গ্রামেই শুই, তাহলে যেতে পারবে

তো ?" তারা মহা খুশি হয়ে বলল, "নিশ্চয়ই। যদি সন্ধ্যা হয়ে যায়, বড়-বড় মশাল জেলে চলে আসব। সঙ্গে বন্দুক নেব।"

সেই বন্দোবস্তই করলাম। ভোর সাড়ে-চারটে-পাঁচটায় বেরিয়ে, কাজ করে, সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটা-আটটার মধ্যে তাঁবুতে ফিরে এলাম।

এই ঘটনার দুবছর পরে আমাদের আপিসের এক সাহেব ঐ পাহাড়ে জরীপের কাজ দেখতে গিয়েছিলেন। গ্রামের লোকেরা তাঁকেও বাধা দিয়েছিল, কিন্তু তিনি সে কথা শুনবেন কেন ?

সকালে উঠে সাহেব সার্ভেয়ারের কাজ দেখতে বেরিয়ে গেছেন, লোকজনদের হুকুম দিয়ে গেছেন যে পাহাড়ের সব চেয়ে উঁচু চুড়োটার নিচে যেন তাঁবু লাগায়। পথ নেই, সেইজন্য তারা হাতির রাস্তা ধরে, খচ্চরের পিঠে জিনিসপত্র বোঝাই করে উপরে উঠল। বিকেলে চুড়োর নিচে পৌঁছে দেখল সেখানে বেশ জল আছে, কাজেই সেখানেই তাঁবু ফেলল। গ্রামের লোকেরা তাদের পৌঁছে দিয়েই ফিরে এল, ও-পাহাড়ে তারা কিছুতেই থাকবে না।

এদিকে সাহেব কাজে বেরিয়েছেন। তিনিও কাজ শেষ করে ঐ জায়গাতেই আসবেন, তবে তাঁকে সমস্ত বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত ঘুরে সার্ভেয়ারের কাজ দেখতে-দেখতে আসতে হবে। সেদিন কিন্তু সাহেবের কপালে তাঁবুতে পৌঁছনো ঘটে উঠল না। বনের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে রাত হয়ে গেল। অন্ধকারে চলতে না পেরে সাহেব ও তাঁর সঙ্গের লোকরা পাহাড়ের উপরে এক জায়গায় গাছের নিচে ধুনি জ্বালিয়ে শুয়ে রইলেন। ভাবলেন সকালে উঠে তাঁবুতে যাবেন।

এদিকে তাঁবুতে সকলে তাঁর পথ চেয়ে বসে রয়েছে, কখন সাহেব আসবেন, কিন্তু সাহেবের আর দেখা নেই। ডাকাডাকি করে বেয়ারাদের গলা ধরে গেল, কিন্তু সাহেব তখন ঢের দূরে, সে-ডাক শুনতে পেলেন না।

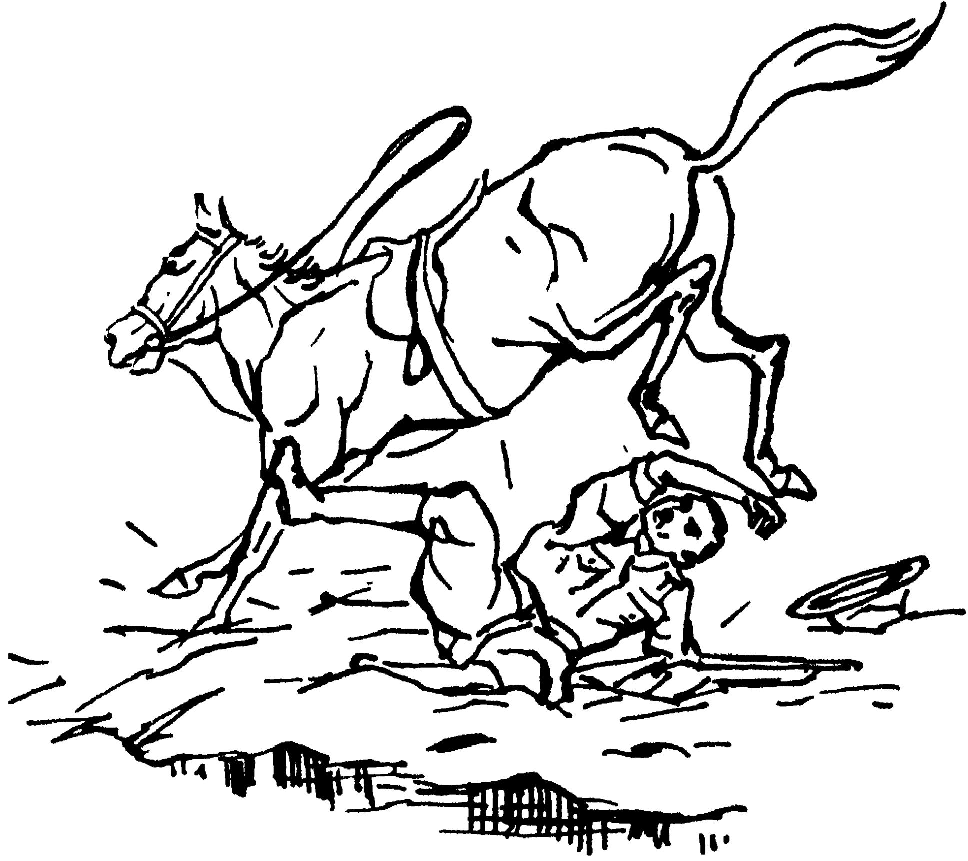
শেষটা তারা আশা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে খচ্চরগুলোর ছুটোছুটিতে সকলের ঘুম ভেঙে গেছে। ব্যাপারখানা কি ? এই ভেবে যেমন একজন খালাসী তাঁবুর দরজা ফাঁক করে গলা বের করেছে, আর অমনি দেখে—ওরে বাবারে, এয়া বড় দাঁত-ওয়ালা হাতি, তার পিছনে আরও হাতি। সে আস্তে-আস্তে সকলকে সাবধান করে দিয়ে যেমন তাঁবুর পিছন দিক দিয়ে বেরোতে যাবে অমনি হাতিও তাঁবুর উপর এসে পড়ল। তখন সকলে গড়িয়ে-গড়িয়ে খাদের ভিতর ঢুকে কোনোরকমে প্রাণ বাঁচাল, আর হাতিগুলো সেই রাস্তায় চলে গেল। তাঁবু-টাঁবু যা কিছু তাদের সামনে পড়েছিল, সব তারা শুঁড় দিয়ে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে খাদের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেল। খচ্চরগুলোও রাস্তার উপর বাঁধা ছিল, তারা সকলে দড়ি-টড়ি ছিঁড়ে পালাল, শুধু একটা খচ্চর মজবুত নতুন দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল, সে বেচারা পালাতে পারেনি। হাতিরা সেটাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে একেবারে পিষে দিয়ে গেল।

সকালে সাহেব তাঁবুতে ফিরে তো একেবারে হতভম্ব !

এবারকার মতো কাজ শেষ করে আমরা ব্যাঙ্গালোরে, আমাদের হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেলাম।

● ৬ ● ১৯০৩-১৯০৪। কেংটুং রাজ্য। এবছর দুজন সাহেব আমার সঙ্গে দূরবীণের কাজ শিখতে গিয়েছিলেন। আমি দূরবীণের কাজ করব আর সাহেবরা চৌদ্দ-পনেরোদিন আমার সঙ্গে-সঙ্গে থেকে কায়দাকানুন শিখে নিজের-নিজের কাজে চলে যাবে। আমাদের সর্বদাই রেলের লাইন ছেড়ে কুড়ি-বাইশদিনের পথ চলতে হয়, এবার তিনজনে এক সঙ্গে যাচ্ছি, গল্প-



গুজবে বেশ পথ চলাটা আরামে কাটালাম। সকলেই ঘোড়া কিনেছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঘোড়া কটাই সব বুনো। একে তো এইরকম হ্যাট-কোটওয়ালা অদ্ভুত জীব তারা আগে কখনো দেখেনি, তার উপর আবার তাদের পিঠে নিয়মমতো বড় একটা কেউ চড়েনি। কাজেই ঘোড়াগুলোকে বাগ মানাতে যে আমাদের বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। এক-এক সময়ে সামান্য কারণে বা অকারণে হঠাৎ দৌড় দেয়, আবার কখনো বা তাদের মেজাজ বিগড়ে যায়, আর কিছুতেই নড়বে না, চার পা শক্ত করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে!

ভোরে বেরিয়েছি, কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। আগে-আগে চলেছে একজন শান পথ দেখিয়ে, তার পিছনে আমি, আমার পিছনে এক সাহেব, তার পিছনে অন্য সাহেব, তার পিছনে তিনজন সহিস। একটা বেশ

বড় নালার কিনারায়-কিনারায় তিন-চার ফুট চওড়া রাস্তা একে-বেঁকে চলেছে, রাস্তার অন্য পাশে খাড়া পাহাড়।

চলতে-চলতে সামনে একটা পাহাড়ী নদী পড়ল, তাতে বেশ জল আর স্রোত, কিনারাটা খাড়া আর বেজায় পিছল। শানটিকে পা টিপে-টিপে নামতে দেখেই আমি ঘোড়ার রাশ টেনে ধরেছি, কিন্তু তবু একটু পিছলে গেল। চার-পাঁচ ধাপ চলার পর আমার খেয়াল হল যে পিছনের দুজনকে সাবধান করে দেওয়া দরকার। ডেকে বললাম—সাবধান, লুক আউট্, আর সঙ্গে-সঙ্গে ঝপাং করে জলে পড়বার আওয়াজ! ফিরে দেখি একজন সাহেবের মাথা থেকে কোমর অবধি জলের নিচে, খালি ঠ্যাং দুটো উপরে বেরিয়ে রয়েছে। টুপিটা জলে ভেসে যাচ্ছে।

"আরে, আরে," বলে সহিসটা দৌড়ে এসে সাহেবকে তুলল, টুপিটা ধরল।

আর আমার সেই হতভাগা বুনো ঘোড়া, ঐ পিছল ঢালু জায়াগায় পৌঁছে ঐ জলের স্রোত দেখে ভড়কে গিয়ে, হঠাৎ সামনের পা দুটো শক্ত করে আর মাথাটা মাটির দিকে ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর আমি তার মাথার উপর দিয়ে উল্টে একেবারে জলে!

বেচারা আমরা! ঐ শীতের মধ্যে প্রায় সমস্তদিন ভিজে কাপড়ে থাকতে হল।

আরেকদিন আমি একলাই চলেছি, সঙ্গে সহিস আর একজন খালাসী, আগে-আগে লাংরিয়া (পথ-প্রদর্শক)। একটা নালা পার হতে হবে, তাতে এক হাঁটু কাদা আর দু-তিন ফুট উঁচু কিনারা। ঘোড়া তো নালায় নামল, কিন্তু অন্য পাড়ে আর কিছুতেই উঠবে না। তিন-চারবার চেষ্টা করেও তাকে ওপারে তুলতে পারলাম না। এক-একবার সামনের দু-পা পাড়ের উপর তুলে দেয় বটে, কিন্তু তক্ষুনি আবার নামিয়ে নেয়। একবার যেই সামনের

দু-পা পাড়ের উপর তুলেছে অমনি আমি সপাং করে দু ঘা চাবুক লাগিয়েছি তার পিছনে, আর হতভাগা পিছনের পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে, ঠিক কুকুরের মতো কাদার মধ্যে বসে পড়েছে! আমি তো কাদায় একেবারে ঢুকে গেলাম, ঘোড়াটাও ডিগবাজী খেয়ে আমার উপর দিয়ে ডিঙিয়ে গেল। সহিস ও খালাসী "হায়, হায়" করে ছুটে এল, না জানি কী হয়েছে! কিন্তু এক হাঁটু কাদার মধ্যে পুঁতে গিয়েছিলাম বলে আমার কোনো চোটই লাগেনি, খালি কাদা মেখে ভূত!

এমনি করে হাসি-তামাশার মধ্যে নিজের-নিজের কাজের জায়গায় পৌঁছলাম। প্রায় দুশো-সওয়াদুশো মাইল পথ-চলার কষ্ট যেন বুঝতেই পারলাম না।

একদিন একটা পাহাড়ে উঠেছি, দেখি সামনে অন্য একটা পাহাড়ের চূড়োর জঙ্গল না-কাটালে কাজ করা অসম্ভব। কিন্তু কুলিরা কিছুতেই ঐ চূড়োর জঙ্গল কাটবে না। সেখানে নাকি তাদের 'নাট' থাকেন, সেখানকার গাছ কাটলে তিনি চটবেন, আর চটলে বড়ই মুশকিল হবে। কিন্তু সরকারী কাজ তো আর এসব কথায় বন্ধ থাকতে পারে না, কাজেই আমাদের খালাসীদের নিয়েই জঙ্গল কাটাতে হল। প্রায় সমস্ত গাছই কাটা হয়ে গেছে, শুধু দুটো বড়-বড় গাছ বাকি আছে, এমন সময় সেখানকার দুজন মাতব্বর লোক এসে বললে, "ও দুটি আমাদের পুজোর গাছ, ওদের ছেড়ে দিন।" তাই আর ও-গাছ দুটিকে কাটালাম না।

এর পরের বছর আবার সেই পাহাড়ে আমার যাবার দরকার হয়েছিল। গিয়ে দেখি পাহাড়ের উপরের গ্রামটা আর সেখানে নেই, দু মাইল দূরে আরেকটা পাহাড়ে চলে গেছে। প্রধানকে জিগগেস করলাম, "গ্রাম ছেড়ে চলে এলে কেন?"

প্রধান বললে, "সে তো তোমাদেরই দোষ। তোমরা সেই যে বন কেটে

ফেলেছিলে তাতে দেবতা চটে গিয়ে বাঘ হয়ে এসে আমাদের কি যেমন-তেমন সাজা দিয়েছে ভেবেছ ! মানুষ গরু শূয়োর সব মেরে আর কিছু বাকি রাখেনি। কাজেই আমাদের পালিয়ে আসতে হয়েছে।"

বন আর পাহাড়ের দেশ, পদে-পদেই বিপদের সম্ভাবনা। কাজেই ভূতের ভয়, বাঘের ভয়, ভালুকের ভয়, হাতির ভয়, লোকের মনে লেগেই আছে। বনের দেবতা আর ভূতের ভয় এদের বড্ড বেশি, আমি আগে সে কথা জানতাম না।

এই পাহাড়টাতে বাস্তবিকই বড্ড বেশি বাঘ। বাঘের জ্বালায় গ্রাম ছেড়ে তো সকলে পালিয়ে গেল, দেবতাই এই সব করেছেন বলে নিজেদের মনকে প্রবোধ দিল আর দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য পাহাড়ের উপর ঘটা করে পুজো দিল। বাঘের সংখ্যা কিন্তু তাতে একটুও কমল না।

আমি ভোরবেলায় ঐ পাহাড়ের চড়াই উঠছি। আমি উঠছি ঘোড়ায় চড়ে আর বাঘমশাইও হেলতে-দুলতে ঐ পথেই নামছে! হঠাৎ দুজনে চোখাচোখি, আর অমনি 'হুপ' করে শব্দ করে দে এক লাফ, হুড়মুড় করে একেবারে কুড়ি-পঁচিশ ফুট নিচে খাদের ভিতর পড়ল। একবার চেয়েও দেখল না যে কোথায় পড়ছে !

আরেকবার ঐ পাহাড়ের উপর দিয়ে আমাদের দুজন ডাকওয়ালা যাচ্ছিল। তাদের বিশেষ করে বলে দেওয়া হয়েছিল, যেন খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে যায় আর বেশ রোদ থাকতেই যেন পাহাড়ের অন্যদিকে নিচের গ্রামে পৌঁছে যায়, কেন না ওখানে বড় বাঘের ভয় !

তাদের আরও বলা হয়েছিল যে পাহাড়ের দুই তৃতীয়াংশ পার হয়ে গেলে দুটো রাস্তা পাবে। একটা ডান দিকে পাহাড়ের ধারে-ধারে গেছে, অন্যটা ছোট রাস্তা পুবমুখী নিচে নেমে গেছে। ডানদিকেরটা বুনো রাস্তা, ওপথে গেলে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে মরবে। ঐ পুবের ছোট রাস্তা দিয়েই যেতে

হবে, আর ঐ দোবাট থেকে পাঁচ-ছয় মাইল এগিয়ে গেলেই গ্রাম পাবে।

ডাকওয়ালারা দুজনেই অযোধ্যার লোক। বুদ্ধির দোষেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, তারা শেষ পর্যন্ত ডানদিকের রাস্তা দিয়েই চলে গেল। তিন-চার ঘণ্টা চলার পর হুঁশ হল—তবে না বলেছিল যে রাস্তাটা নিচে নেমে যাবে? আর দোবাট থেকে পাঁচ-ছয় মাইল পরেই গ্রাম পাবে? এ যে পাহাড়ের উপরে-উপরেই চলেছে, আর শেষই হচ্ছে না। তবে বা ঐ ছোট রাস্তাটাই ঠিক ছিল। ওঠ গাছে, দেখ কোনদিকে গ্রাম। একজন গাছে উঠে বলল, পুবদিকে, অনেক দূরে, পেছনে খেত দেখা যাচ্ছে। তখন গাছ থেকে নেমে ছুটোছুটি করে তারা সেই দোবাটে ফিরে চলল। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই বুঝতে পারল যে দোবাটে পৌঁছবার বহু আগেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তখন তারা বাঘের কথা মনে করে তাড়াতাড়ি রাত কাটাবার জায়গা খুঁজতে লাগল। পাহাড়ের উপর শিকারীদের একটা বিশ্রামের জায়গা ছিল, সেখানে গাছের নিচেটা পরিষ্কার আর কাছেই একটা ছোট নালায় জল আছে। তারা ভাবল এইখানেই রাত কাটিয়ে, ভোরে দোবাটে ফিরে গিয়ে, ছোট রাস্তাটা ধরে গ্রামে যাবে।

গাছতলায় জিনিসপত্র রেখে একজন কাঠ জড়ো করতে লাগল। রান্না করতে হবে, ধুনি জ্বালতে হবে, বলে দিয়েছে এ পাহাড়ে বড় জানোয়ারের ভয়। অন্য লোকটি বালতি নিয়ে জল আনতে গেল। অমনি—'হুঁ-উ-ম্-ম' বন-জঙ্গল কেঁপে উঠল, যেদিক থেকে তারা ফিরেছে সেই দিক থেকে বাঘ ডাকল। দুজনেই হাতের কাজ ফেলে দৌড়ে এসে গাছের গোড়ায় উপস্থিত হল। আবার 'হুঁ-উ-ম্-ম্'—যেন একটু কাছে! আবার 'হুঁ-ম্-ম্-ম্'—আরও কাছে! বাঘটা এইদিকেই আসছে আর একটু পর-পর হুঙ্কার ছাড়ছে।

হুটোপুটি করে দুজনেই গাছে উঠল, আর বেশ উঁচুতে উঠে, ঘন পাতার

আড়ালে লুকিয়ে রইল। পাছে পড়ে যায়, এই ভয়ে পাগড়ি খুলে গাছের ডালের সঙ্গে নিজেদের বেশ করে বাঁধল।

বাঘও 'হুঁ-উ-ম্-ম্' করতে-করতে গাছের নিচে এসে হাজির হল। এসেই সোজা গিয়ে ওদের লোটা-কম্বল শুঁকতে আরম্ভ করল আর এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল। কোথাও কিছু না দেখতে পেয়ে আবার হুঙ্কার! আবার খোঁজ-খোঁজ, আবার হুঙ্কার! তারপর জলের ধারে চলে গেল। সেখানে তাদের বালতি দেখেই হোক, বা অন্য কোনো কারণেই হোক, আবার গজন। জল খেয়ে উপরে উঠে এসে এক-একবার জিনিসপত্র শুঁকে দেখে, আবার হুঙ্কার!

কতক্ষণ ধরে এই রকম করে, তারপর গাছতলায় বাঘ বসে রইল। কিছুক্ষণ বসে থাকে, আবার উঠে পায়চারি করে, লোটাকম্বল শোঁকে আর হুঙ্কার দেয়। লোক দুটির অবস্থা বোঝাই যায়। বাঘের ভয়ে শীত কোথায় পালিয়ে গিয়েছে, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গিয়েছে। সমস্ত রাত বাঘটা ঐ রকম করল, তারপর ভোরের দিকে ডাকতে-ডাকতে, যেদিক থেকে এসেছিল, সেইদিকেই আবার চলে গেল।

ডাকওয়ালারা বেলা আটটা-নটা অবধি গাছের উপরেই বসে রইল, তারপর বাঘের আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই দেখে, নেমে এসে, জিনিসপত্র নিয়ে দে দৌড়! খাওয়া দাওয়া চুলোয় গেল, একেবারে গ্রামে পৌঁছে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল! গ্রামের প্রধান সমস্ত শুনে তাদের খুব বকুনি দিল—এ পাহাড়ের বাঘ বড় দুষ্টু, মানুষ খেকো। অত করে বলে দেওয়া সত্ত্বেও ও-রাস্তায় গেলে কেন?

আরেকটা পাহাড়ে এক সাহেবের তিনটে খচ্চর বাঘে খেয়েছিল। সাহেবের আগে আমিও ঐ পাহাড়ে কাজ করেছিলাম। পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে এক মাইল দূরে একটা আড্ডা আছে, জঙ্গলের আড্ডা। নিতান্ত



অপারগ না-হলে কেউ ঐ আড্ডায় থাকে না, আর ওখানে রাত কাটাবার দরকার হলে, অনেক লোক এক সঙ্গে জুটে তবে ক্যাম্প করে।

আমারও ইচ্ছা ছিল ওখানে ক্যাম্প করব, কিন্তু গ্রামের লোকেরা মানা করল, "ওখানে যেও না, বড় বাঘের ভয়, আমরাও ওখানে কখনো রাত কাটাই না, একলা ও-পথে যাই না।" আমি ঐ আড্ডায় না-গিয়ে পাহাড়ের উত্তরে, প্রায় চার মাইল দূরে মুসোদের গ্রামে ছিলাম। বেজায় চড়াই আর বিশ্রী রাস্তা। সাহেবেরও ঐ পাহাড়ে একটু কাজ ছিল। তিনি বললেন, "ঐ চার মাইল চড়াই আমি উঠছি না। জঙ্গলের আড্ডাতেই থাকব।"

আমি অনেক করে মানা করলাম, গ্রামের লোকেরাও বলল, কিন্তু সাহেব কিছুতেই শুনলেন না। ঐ জঙ্গলের আড্ডাতেই ক্যাম্প করলেন। বড় ধুনি জ্বালানো হল, সঙ্গের খচ্চরগুলোকে তার পাশেই বেঁধে রাখা হল। খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে শুয়ে পড়ল। অনেক রাতে চ্যাচামেচিতে সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। "কেয়া হুয়া ?" শুনলেন তিনটি খচ্চর বাঘে নিয়ে গেছে, আর বাঘও একটা নয়। ধুনি জ্বালানো হয়েছিল বটে কিন্তু পাহারা রাখা হয়নি। ধুনি নিভে গিয়েছিল।

খচ্চরওয়ালা বেচারীরা তো একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। সাহেবেরও বড্ড রাগ হল, ভোরে উঠেই খুঁজতে বেরোলেন। খাদের ভিতর সন্ধান মিলল। একটার অর্ধেক খেয়েছে, অন্য দুটো আস্তই রয়েছে। সাহেব হুকুম দিলেন, "গাছে মাচা বাঁধ, আমি বাঘ মারব। এখন কাজে যাচ্ছি, তিনটের সময় ফিরে চারটের সময় মাচায় বসব।"

চীনা খচ্চরওয়ালা তো মহা খুশি। সকলে মিলে মাচা বেঁধে সব ঠিক-ঠাক করে রাখল। সাহেব কাজ থেকে ফিরে, চা খেয়েই, বন্দুক টোটা ইত্যাদি নিয়ে বাঘ মারতে চললেন, চারটেও বাজেনি তখনো। গিয়েই তো চক্ষুস্থির! সোজা তালগাছের মতো একটা গাছ, তার কুড়ি-পঁচিশ ফুট উপরে একটা ডাল বেরিয়েছে, সেইখানে মাচা।

"উঠব কী করে ?"

খালাসীরা বলল, "হুজুর, ঐ মোটা লতার মই তৈরি করেছি, তাই বেয়ে উঠতে হবে। আমরাও তাই করেছিলাম।"

সাহেবের পায়ে জুতো, কাজেই অতি সন্তর্পণে উঠতে হবে। বন্দুকটা একটা খালাসীর হাতে দিয়ে, তাকে তাঁর পিছনে-পিছনে উঠতে বলে, সাহেব তো গাছে চড়তে আরম্ভ করলেন। কতকটা চড়েছেন, আর অমনি একটু দূরেই 'হুঁ-উ-ম্-ম্'—বাঘ ডেকে উঠল। বোধহয় পেট ভরে খেয়ে

একটু আয়েস করছিল আর এরা গিয়ে বেচারার কাঁচা ঘুমটা ভেঙে দিয়েছেন, কিম্বা হয়তো কিঞ্চিৎ জলযোগের জন্য আসছিল, এদের দেখে বিরক্তি প্রকাশ করল। যাই হোক, সেই 'হুঁ-উ-ম্-ম্' শুনেই তো খালাসীর হাত থেকে বন্দুক নিচে পড়ে গেল আর সেও লাফিয়ে পড়ে দে দৌড়! সাহেবও লাফিয়ে নেমে, বন্দুক ঘাড়ে করে একেবারে তাঁবুতে। বাঘ মারা আর হল না।

● ৭ ● (১৯০৪-১৯০৫ বেলুচিস্থান। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) পরের বছর আবার শান স্টেটে যাব বলে সব ঠিক। এক মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতা হয়ে, কয়েকদিন সেখানে কাটিয়ে তবে যাব। হঠাৎ শিমলা থেকে তারে হুকুম এল : একে এক্ষুনি কোয়েটা পাঠিয়ে দাও। ৪৮ ঘণ্টা সময় দেওয়া হল বেলুচিস্থানের উপযোগী কাপড়-চোপড় তৈরি করে নেবার জন্য। তাড়াহুড়ো করে কাপড়-চোপড় করিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম। ব্যাঙ্গালোর থেকে কোয়েটা লম্বা পথ। পুণা, বম্বে, বরোদা, মাড়োয়ার, হায়দারাবাদ ও সিবি হয়ে তবে কোয়েটা। পথে সিবিতে প্লেগ ক্যাম্পে আমাকে দুদিন আটকিয়ে রাখল, কেননা আমি ব্যাঙ্গালোর থেকে আসছি আর সেখানে প্লেগ হচ্ছিল।

লম্বা পথ, ট্রেনে চলতে-চলতে একেবারে প্রাণ আইঢাই! রাজপুতানার মরুভূমিতে তো বালিতে নাক-চোখ বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। আর ভীষণ গরম!

কোয়েটা পৌঁছে কাজে বেরোবার জন্য সব গুছিয়ে নিয়েছি, পরদিন ভোরে রওয়ানা হব, আবার তার এল : কোহাট যাও। কাজকর্ম অন্য

লোকের জন্য ছেড়ে দিয়ে আবার ট্রেনে চাপলাম, গেলাম কোহাট। কোহাট থেকে বন্নু আর টর্চি উপত্যকা। কোহাট অবধি রেল, তারপর টঙ্গা।

এত লম্বা ট্রেন যাত্রা আমি জন্মে কখনো করিনি। কোথায় ব্যাঙ্গালোর আর কোথায় কোহাট! কতদিন পর্যন্ত খটাং-খটাং খট-খট করে আমার কানের ভিতরেও ট্রেন চলেছিল।

আমি বেলুচিস্থানে যে কাজ ফেলে এলাম, দুদিন পরে আমাদের আপিসের এক সাহেব সেই কাজ করতে গেলেন। আফগানিস্থানের সীমানা পর্যন্ত কাজ করতে হবে। সে সব দেশের লোকেও আইনকানুন বড় একটা মানে না। তাই সাহেবের সঙ্গে বারো-চৌদ্দজন সিপাই গেছে। তারা রাত্রে তাঁবু পাহারা দেবে, দিনে তাঁর সঙ্গে কাজ করবে। এই সিপাইরাও ঐ দেশেরই লোক—'বেলুচ'। তাদের উপর একজন হাবিলদার ছিল। সিপাইদের মধ্যে আবার দুই দল ছিল, দুই দলের মধ্যে একটু মনোমালিন্যও ছিল, সেইজন্য প্রায়ই খুঁটিনাটি নিয়ে কথা কাটাকাটি লেগেই থাকত। হাবিলদার এক দলকে একটু অনুগ্রহ করত, সেইজন্য অন্য দল বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না। সে-দলের একজন সিপাই হাবিলদারের নেকনজরে ছিল না, সম্ভবত তার উপর কিছু-কিছু জুলুমও চলত। সেও দু-একবার সাহেবের কাছে নালিশ করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সিপাইরা তাঁর অধীন নয় মনে করে তিনি তার নালিশে কান দেননি।

এর ফলে তাদের গোলযোগ আরও গুরুতর হয়ে উঠল, এমন কি সঙ্গীন অবস্থা হয়ে দাঁড়াল। এই সময়ে প্রায় একেবারে আফগান সীমার উপরে সাহেবের তাঁবু পড়ল। পাঁচ-ছয়শো গজ মাত্র ব্যবধান। সেইদিনই রাস্তায় ঐ সিপাই আর হাবিলদারের মধ্যে কিছু বচসা হয়েছে। সিপাই তাঁবুতে এসেই সাহেবের কাছে নালিশ করল যে হাবিলদার তার উপর অন্যায় জুলুম করেছে, ইত্যাদি। এবারও সাহেব শুনলেন না। হাঁড়িপানা

মুখ করে সিপাই বসে রইল। রাত্রে হাবিলদার ওরই ঘাড়ে পাহারা চাপাল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সকলে শুয়েছে, সিপাই পাহারায় দাঁড়াল। দু-ঘণ্টা বাদে অন্য সিপাই এসে তাকে বদলি করবে। সাহেবের তাঁবুর পাশেই সিপাইদের তাঁবু, মাঝখানে কয়েক ফুট জায়গা। রোজ পাহারাওয়ালা সিপাই তাঁবুর সামনে পাইচারি করে, কিন্তু সেদিন ঐ সিপাই তাঁবুর চারদিকে ঘুরতে লাগল আবার মাঝে-মাঝে দুই তাঁবুর মাঝখান দিয়েও যাতায়াত করতে লাগল, আবার যেন কখনো-কখনো দুই তাঁবুর মাঝে দাঁড়িয়ে কী দেখতে বা ভাবতে লাগল।

সাহেবের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, আর শুয়ে-শুয়ে ভাবছিলেন, আজ পাহারাওয়ালা অমন করছে কেন? একবার ভাবলেন বাইরে গিয়ে দেখি ব্যাপার কি, আবার তক্ষুনি তন্দ্রা এল। চোখ বুজতে-না-বুজতে দুড়ুম করে বন্দুকের আওয়াজ, পাক্‌ড়ো-পাক্‌ড়ো চিৎকার! সকলেই উঠেছে, সাহেবও পিস্তল হাতে তাঁবু থেকে বের হলেন।

"কি ব্যাপার? কে গুলি চালল?"

ঐ সিপাই।

আলো জ্বালা হল। হাবিলদারকে প্রাণে মেরেছে, আরও দু-তিনজন সিপাই জখম হয়েছে। তাদেরও অবস্থা খারাপ। সিপাইটা আরও একটা রাইফল্‌ আর দু-তিন ব্যাণ্ডোলিয়ার কার্তুজ নিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে। আলো জ্বালানো হল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই নিভিয়ে দিতে হল। কারণ, হতভাগা সিপাই একটু দূরে একটা পাহাড়ের উপর আশ্রয় নিয়েছিল, আর একটু পর-পর লণ্ঠনের আলো তার নজরে পড়তেই পিং করে গুলি ছুঁড়ছিল।

সকালে লোকজন সিপাইদের ওখানে রেখে, রাইফল্‌ আর কার্তুজ নিয়ে সাহেব একলাই গেলেন চোদ্দ মাইল দূরে কেল্লায় খবর দিতে। তারপর

সেখান থেকে ডাক্তার, সিপাই ইত্যাদি এসে সকলকে নিয়ে গেল। দু-তিনদিন বিশ্রাম করে, অন্য দল সিপাই নিয়ে, সাহেব আবার কাজ শুরু করলেন।

সিপাইটার আর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, সে আফগান এলাকায় চলে গিয়েছিল।

আগেই বলেছি আমি বেলুচিস্থানের কাজ ফেলে বন্নু আর টচি উপত্যকায় চলে গিয়েছিলাম। বর্মায় যেমন বাঘ-ভাল্লুকের ভয় ছিল, এখানে তার কিছুই নেই। এ-দেশের ভয় হল শীতের, আর বাঘ-ভাল্লুকের চেয়েও হিংস্র মানুষের—ডাকাতের।

উঃ, সে কি ভয়ানক শীত! পাহারাওয়ালা বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয় আর দুঘণ্টা পর-পর বদলি হয়। বাইরে বলতে আবার একেবারে খোলা মাঠ নয়, মাথার উপরে চাল আছে। গায়ে তো তাদের এক বোঝা কাপড়-চোপড় আর 'পোস্তিন'। লোমসুদ্ধ ছাগলের চামড়ার কোটকে 'পোস্তিন' বলে, তার মতো গরম আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু তাতেও কি আর শীত যায়? কয়েকজন পাহারাওয়ালা এই সব সুদ্ধই জমে মরে গেল।

উপরে মোটা-মোটা তিনটে কম্বল, গায়ে গরম গেঞ্জি, ফ্ল্যানেলের জামা আর সোয়েটার, পায়ে দু-জোড়া গরম মোজা, তবু মনে হয় না কিছু গায়ে দিয়েছি। এর উপর একটা 'পোস্তিন' চড়ালে তবে কিছু আরাম বোধ হয়। তবু কিন্তু নাক-মুখ ঢেকে শুতে হয়, আর তা সত্ত্বেও ভোরের দিকটা হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে ঘুম ভেঙে যায়। তাঁবুর বাইরে তো সমস্ত একেবারে শাদা ধবধব করছে। পাহাড় মাঠ সব শাদা, নদীর জলও জমে গেছে, উপরের দিকটা।

তাঁবুর ভিতরে বালতির জল কম্বল চাপা দিয়ে রাখলেও জমে পাথরের মতো হয়ে যায়। আর তাতে মাঝে-মাঝে বড় তামাশা হয়। একজন বাঙালী ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে একজন পাঞ্জাবী চাকর। লোকটা বেশ মজবুত, খাটতেও পারে খুব, কিন্তু বুদ্ধিটা একটু

কম। বাবুর বোধহয় সেদিন ভালো করে হজম হয়নি, তাই তিনি ভোরে উঠে, ব্যস্ত হয়ে চাকরকে বললেন, "জলদি এক লোটা পানি দেও।" হুকুম দিলেন বটে কিন্তু চাকর আর জল দেয় না, বাবু যতই তাড়া দেন সে ততই বলে, "হুঁ, হু, যাচ্ছি।" বাবুর আর সবুর সয় না, তিনি চ্যাঁচামেচি আরম্ভ করলেন আর আমার তাতে ঘুম ভেঙে গেল। আমি উঠে বাবুর ভঙ্গী দেখে বুঝলাম তাঁর অবস্থা বেগতিক। তখন আমার লোক তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল এনে দিল, বাবুও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

ব্যাপার হয়েছে কি, চাকরটি রাত্রে বালতির মধ্যে লোটা রেখে দিয়েছিল। তাড়া দেওয়া মাত্র সে ছুটে জল আনতে গেছে, কিন্তু এদিকে বালতি সুদ্ধ জল জমে পাথর! তার ভিতর থেকে লোটা বের হবে কী করে? উনুন ধরিয়ে, বালতি সুদ্ধ বরফ চাপিয়ে লোটা বের করতে পনরো মিনিট লেগেছিল।

থার্মোমিটার ১৭° ফ্যারেনহাইট পর্যন্ত নেমেছিল, আবার যখন গরম পড়ল তখনো প্রাণ ওষ্ঠাগত, ডাকবাংলোর বারান্দার ছায়াতে ১১৭°!

ও-দেশে জঙ্গল নেই, অন্তত বর্মায় বন বলতে আমরা যা বুঝতাম তা নেই। সমস্ত পাহাড় ন্যাড়া, তাতে খালি ছোট-ছোট ঘাস আর পাথর, সেই ঘাস আবার শীতের ধাক্কায় একেবারে জ্বলে গেছে। পাঠানের দেশ, বড় শক্ত জায়গা। দিনে হাতিয়ার-বাঁধা পাহারাওয়ালা নিয়ে কাজে বেরুতে হয়, আবার রাতেও বন্দুক নিয়ে লোক পাহারা দেয়। এই কাজের জন্য একুশ-বাইশজন লোক সঙ্গে আছে, এরাও পাঠান, এই দেশেরই লোক হাতিয়ারও তাদের নিজের, আমরা খালি তংখা দিই। তারা কেল্লায় পলিটিকেল সাহেবের কাছে গিয়ে দলিল সই করে দিয়ে এসেছে যে গবর্ণমেণ্টের এতজন লোক, এতগুলো জানোয়ার ও আসবাব ইত্যাদি বুঝে পেল, আবার গুণে ফিরিয়ে দেবে। জিনিসপত্র বইবার জন্য সঙ্গে উট আছে, উটওয়ালারা

পাঞ্জাবী মুসলমান, পাঠান দেশের দু-চারটি কথা বলতে পারে। সঙ্গের খালাসীরাও পাঞ্জাবী মুসলমান।

সে দেশে বড় ডাকাতের ভয়, সুবিধা পেলেই সব লুটে নেয়। সেইজন্য রাত্রে সর্বদা পাহারা রাখতে হয়, আর নিজেও সশস্ত্র থাকতে হয়। দিনে কাজে যাই কোমরে রিভলভার বেঁধে, রাতে শুই গুলিভরা রিভলভার বালিশের তলায় রেখে। এই দারুন শীত কিন্তু আগুন জ্বালবার যো নেই। একে তো কাঠই মেলে না, তার উপর ধুনি জ্বালালে দূর থেকে ডাকাতরা দেখতে পেয়ে গুলি চালাবে।

কাজ শেষ করে সন্ধ্যার আগে তাঁবুতে ফেরা চাই। অন্ধকারে চোর-ডাকাতের সুবিধা, যদি পথের পাশেই বসে থাকে তাহলেও দূর থেকে দেখা যাবে না। মেরে, কেটে, লুটে নেওয়া তাদের ব্যবসা বললেও চলে।

ও-দেশের প্রধানদের 'মালিক' বলে। একজন মালিক আমার কাছে বখশিস চেয়েছিল। আমি বললাম, "টাকা তো আমার কাছে নেই, কেল্লার তহশীলদারের কাছে টাকা রেখে এসেছি। আমি চিঠি দিচ্ছি, তাঁর কাছে যাও বখশিস মিলবে।"

সে হেসে বললে, "আচ্ছা বাবুসাহেব, আমি তো ওয়াজির, লুটে খাওয়া আমার পেশা, যখন সুবিধে হবে বখশিসটা নিয়ে নেব।"

নিজেদের মধ্যেও অনেক সময় মারামারি কাটাকাটি! অনেক সময় দেখা যায় এ গ্রামের কোনো-কোনো লোক গ্রাম বিশেষে যায় না। কেন? ও-গ্রামের অমুকদের সঙ্গে এদের বংশগত শত্রুতা—ব্লাড ফিউড—আছে। কোন প্রাচীন যুগে এদের পূর্বপুরুষদের কেউ ওদের পূর্বপুরুষদের কাকেও হত্যা করেছিল। তারপর আবার ওদের কেউ এদের আর কাউকে মেরে সেই রক্তের ঋণ শোধ করেছিল, আবার এরা তার প্রতিশোধ নিয়েছিল, এমনি করে বংশানুক্রমে রক্তের বিরোধ চলে আসছে।

এখন ওদের পালা। এদের কাউকে পেলেই শেষ করবে।

টর্চি উপত্যকার উত্তর পশ্চিম দুইদিকে আফগান রাজ্য। দক্ষিণ মাসুদদের দেশ, মাসুদরাও ওয়াজির, সকলেই লুটপাটে ওস্তাদ! আমাকে কাজের খাতিরে আফগান সীমানায় যেতে হত। দুবার-দুবার ওরা আমার ক্যাম্প লুটে নেবার বন্দোবস্ত করেছিল, আর দুবারই ভগবানের কৃপায় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম।

এবার আফগান সীমানার দু-আড়াই মাইল দূরে একটা গ্রামে আমার তাঁবু ছিল। প্রোগ্রাম মতো বরাবর কাজ করে এসেছি, কিন্তু এই প্রথম একদিন দেরি হল। ঠিক সময়ে কাজ শেষ হল না, কাজেই বাধ্য হয়ে আমাদের আরও একদিন সেখানে থেকে যেতে হল। হুকুম মতো ভোরে উঠেই একখানি চিঠি সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। একজন সওয়ার চিঠি নিয়ে চোদ্দ-পনরো মাইল দূরে কেল্লায় চলে গেল, আমি কাজে বেরোলাম।

বিকেলে ঐ সওয়ারের ফিরবার কথা, চোদ্দ-পনরো মাইল রাস্তা ঘোড়ায় চড়ে গেছে, কিন্তু সে ফিরল না। পরদিন আমি কাজে বেরিয়েছি, পথে ঐ সওয়ার, তহশীলদার সাহেব, আরও বহুলোকের সঙ্গে দেখা। কী ব্যাপার? আমার যে আগের দিন ফিরবার কথা ছিল এ-খবরটা কী করে নাকি ডাকাতরা জানতে পেরে, লুটপাট করবার জন্য পথে এক জায়গায় আড়ি পেতে বসেছিল। আমার সওয়ারটি পাহাড়ের উপর থেকে, প্রায় এক মাইল দূরে, রাস্তার ধারে একটা কি চকচক করছে দেখতে পেয়ে, সন্দেহ করে দাঁড়াল।

দু-তিনবার ঐ চকচকে জিনিসটা তার চোখে পড়ল। ভালো করে দেখে বুঝতে পারল যে ওটা বন্দুকের নলিতে রোদ পড়ে চকচক করছে। তখন সে সেই রাস্তায় না গিয়ে পাহাড়ের উপরে ছাগল-ভেড়ার রাস্তা ধরে চলল।

তিন-চতুর্থাংশ গিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেল অনেক লোক পাথরের আড়ালে বন্দুক হাতে গুড়ি মেরে বসে আছে। লোকগুলোও ততক্ষণে তাকে দেখতে পেয়েছে, আর সে ভালো রাস্তা ছেড়ে জংলী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দেখে বুঝতে পেরেছে যে ও তাদের দেখে ফেলেছে। তখন তারা বেরিয়ে এসে ওকে তাড়া করল, দু-চারটে বন্দুকও ছুঁড়ল, এও বন্দুক ছুঁড়ল, তারপর ঘোড়া হাঁকিয়ে পালিয়ে গেল, ওরা কুড়ি-পঁচিশজন আর ও একলা।

অনেক ঘুরে দুটো-তিনটার সময় কেল্লায় পৌঁছেছিল। তহশীলদার সাহেব সব শুনে তার সঙ্গে লোকজন পাঠিয়েছেন। পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন বড্ড বেঁচে গিয়েছ। ঐ গ্রামে নিশ্চয়ই ওদের চর আছে।

আর একবার ঐ একই গ্রামে আমার তাঁবু ছিল। এবার যথাসময়েই কাজ শেষ হয়েছিল, কিন্তু আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। কেল্লার কাছে একটু কাজ ছিল তাও শেষ করতে হবে। খোঁজ করলাম অন্য রাস্তা আছে কিনা যাতে ঘণ্টা দু-তিন আগে পৌঁছানো যায়। শুনলাম একটা ছোট পথ আছে। গ্রামের লোকেরা বলল সেটা দিয়ে গেলে চার-পাঁচ মাইল বেঁচে যাবে, কিন্তু রাস্তা খারাপ, বোঝা নিয়ে উট চলতে পারবে না। প্রায় তিন-চার জরীপ খারাপ রাস্তা, এক জরীপ হল বাইশ গজ। ঐটুকুর জন্য চার-পাঁচ মাইল ঘুরব! আমি বললাম, "এই রাস্তাতেই চল। খারাপ জায়গাটাতে বোঝা নামিয়ে উট পার করে নেব। আবার বোঝাই করলেই হবে।"

গ্রামের কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে ঐ পথেই চললাম। খুব সাবধানে উটগুলো খারাপ জায়গাটা পার হল, বোঝা নামাতে হল না। কেল্লায় পৌঁছে যথাসময়ে কাজ শেষ করলাম।

পরদিন তহশীলদার সাহেব খবর দিলেন যে আবার আফগান ডাকাতরা ঐ জায়গায় আমাদের অপেক্ষায় বসেছিল। অনেকক্ষণ বসে থেকে, যে গ্রামে

তাঁবু ছিল সেখানে গিয়ে মহা তম্বি! কেন সরকারী লোকদের গ্রামে থাকতে দেওয়া হয়েছিল! আর তারা গেল কোথায়? কোন রাস্তায় গেল, ইত্যাদি।

একদিন সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গেই কাজ শেষ করে তাঁবুতে ফিরেছি, কাপড়-চোপড় ছেড়ে, হাত-পা ধুয়ে, বিশ্রাম করে, খেয়ে, শুয়ে পড়েছি। সমস্তদিনের পরিশ্রম, বেজায় শীত, আবার থাকি তাঁবুতে, কাজেই একটু তাড়াতাড়ি তাঁবুর দরজা বন্ধ করে লেপ মুড়ি দিতে পারলেই ভালো লাগে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি বলতে পারি না, বন্দুকের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। ওদেশের লোকেরা শত্রুর ভয়ে সব গ্রামের চারধারে উঁচু মাটির দেয়াল দেয়। আমরা একেবারে সেই দেয়ালের গা ঘেঁষে তাঁবু খাটিয়ে ছিলাম। জিগগেস করলাম, "কিসের আওয়াজ?"

"ডাকাত এসেছে, তাদের বন্দুকের আওয়াজ।"

"কত দূরে ডাকাত?"

"তিন-চার-শো গজ হবে, তবে রাত বলে ভালো বোঝা যাচ্ছে না।"

জ্যোৎস্না রাত বলে রক্ষা। আমাদের লোকেরা ততক্ষণে সকলে জেগে গেছে, পাহারাওয়ালারা বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত, হুকুম পেলেই চালায়। আমি সবেমাত্র দোভাষীকে দিয়ে হুকুম দিয়েছি, অমনি আবার সেই বন্দুকের আওয়াজ। তখন আমাদের লোকরাও বন্দুক চালাতে আরম্ভ করল, বার দশেক চালাবার পর আবার সমস্ত চুপচাপ হয়ে গেল। তারপর লোক-জনদের সকলের খোঁজ নিলাম, সকলেই ভালো আছে, কারো গায়ে গুলি লাগেনি। তখন পাহারাওয়ালাদের সাবধান করে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে দেখা গেল একটা উটের পায়ে গুলি লেগেছে, বিশেষ কিছু না, কয়েকদিন ওষুধ লাগাতেই সেরে গেল।

ও-দেশের লোকরাই আমাদের সঙ্গে পাহারা দিত। জন দুই মালিক আর পনরো-কুড়িজন অন্য লোক। বন্দোবস্ত ছিল যে মালিকরা দৈনিক

মজুরী পাবে দেড়-টাকা-দু-টাকা করে আর অন্যরা আট আনা হিসাবে। নিজেদের এলাকায় তারা রক্ষণাবেক্ষণ করবে, অন্য এলাকায় যাবে না। এক সর্দারের এলাকার কাজ শেষ হলে, পথে এসে অন্য এলাকার লোক বসে থাকত আর তাদের হাত থেকে গুণে সকলের ভার নিত। এই পাহারাওয়ালাদের খাসাদার বলে।

একটা গ্রামের কাছে গিয়ে তাঁবু ফেলেছি, গ্রাম থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে। এই এলাকার লোকরা কেল্লা থেকে আমাদের মালপত্র সব গুণে এনেছে, কিন্তু তবুও সন্ধ্যার সময় গোলযোগ আরম্ভ করেছে। শুনতে পেলাম একটা কিছু খুঁটিনাটি চলছে, তর্ক হচ্ছে। সর্দার দুজন যেন এক-একবার বেশ গরম হয়ে উঠছে।

দোভাষীকে জিগগেস করলাম : "কী হয়েছে?"

দোভাষী বললে, "খাসাদাররা গোল করছে, শয়তানী আরম্ভ করেছে, বলছে তাদের প্রত্যেককে এক টাকা করে না দিলে তারা কাজ করবে না, এক্ষুনি চলে যাবে।"

সর্দার দুজনকে ডেকে পাঠালাম, তাদের সঙ্গে চার-পাঁচজন খাসাদারও এল। জিগগেস করলাম, "ব্যাপার কি? কিসের গোলমাল?"

সর্দাররাও দোভাষীর কথার পুনরুক্তি করল, আর বলল, "এরা বদমাস, তাই গোলমাল করছে।"

খাসাদারদের জিগগেস করলাম, "তোমরা তো রোজ আট আনা হিসাবে রাজী হয়ে এসেছ, এখন আবার গোল করছ কেন?"

ওরা বলল, "আমরা রাজী হইনি, সর্দাররা রাজী হয়েছে। আমরা এক টাকা রোজের কম রাজী হব না। এক্ষুনি চলে যাব।"

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে, আর তাঁবুও গ্রাম থেকে সিকি মাইল দূরে, সেই জন্যেই বেটাদের শয়তানী।

আমি সর্দারদের জিগগেস করলাম, "তোমরাও কি চলে যাবে ?"

তারা উত্তর দিল, "তাহলে আর এতক্ষণ ধরে ওদের সঙ্গে ঝগড়া করছি কেন ? আমাদের কথার নড়চড় হবে না।"

আমি বললাম, "আমি আট আনার বেশি এক পয়সা দেব না।"

তখন মহা খাপ্পা হয়ে খাসাদাররা সকলে চলে গেল আর যাবার সময় বেশ করে শাসিয়ে গেল, "রাত্রে ভালো করে পাহারা দিস, চাই কি আমরাই আসতে পারি।"

সর্দাররাও পাল্টা শাসিয়ে জবাব দিল, "জানিস এটা সায়েদাখানের এলাকা ? রাত্রে আসবার সময় খুব সাবধানে আসিস, কার গর্দানে কটা মাথা আছে দেখা যাবে !"

সায়েদাখান ওখানকার ওয়াজিরদের প্রসিদ্ধ মালিক, তার দোর্দণ্ড প্রতাপ। আমার সঙ্গের সর্দাররা সায়েদাখানের আপনার লোক। আমরা সে রাতটা খুব সাবধানে কাটালাম, খুব কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করলাম। সর্দাররা খালাসীদের সাবধান করে দিল যেন রাত্রে কেউ তাঁবু থেকে বাইরে না যায় বা বাতি না জ্বালায়। সামান্য নড়াচড়ার উপরেই রাত্রে গুলি চলবে। যাই হোক, রাত কেটে গেল, কোনো গোলযোগ হল না।

সর্দারদের সঙ্গে তাদের আপনার লোক তিনজন ছিল। সকালে উঠে একজনকে আমি কেল্লায় পলিটিকেল তহশীলদারের কাছে পাঠালাম, দুজনকে তাঁবু পাহারায় রাখলাম আর সর্দার দুজনকে সঙ্গে নিয়ে কাজে চলে গেলাম। কাজ শেষ করে সেদিন শিগগির ফিরেছি, এসে দেখি তাঁবুতে লোকেলোকারণ্য, তহশীলদার সাহেব, সিপাই আরও মেলা লোক। তাঁবুতে পৌঁছানো মাত্র তহশীলদার সাহেব বললেন, "বাবুসাহেব, তুমি করেছ কি ! কাল তোমাকে খোদা বাঁচিয়েছেন। পাঁচটি মাত্র লোক সঙ্গে নিয়ে কেউ এ-জায়গায় রাত্রে থাকে ? তোমার তক্ষুনি গ্রামে চলে যাওয়া উচিত ছিল।"

"তহশীলদার সাহেব, চটো কেন ? কাল যদি ওদের অন্যায় আবদারে রাজী হতাম বা ওরা চলে গেলে পর আমিও ভয়ে গ্রামে চলে যেতাম, তাহলে ফলটা কী হত? তুমি তো পলিটিকেল লোক, একবার চিন্তা করে দেখ। ওরা হয়তো আবার দেড় টাকা চেয়ে বসত, বা অন্য চাল চালত। আর চলে গেলে এখানে আর কেউ কাজ করতে পারত না, বদনাম হত, সরকারের কাজের ক্ষতি হত।"

একটু চিন্তা করে তহশীলদার সাহেব সেকথা মেনে নিলেন, কিন্তু তাঁবু তুলে গ্রামে নিয়ে যেতে বললেন।

আমি বললাম "তা হবে না, এখানেই থাকব, আপনি অন্য খাসাদারের ব্যবস্থা করুন।"

অনেক চেষ্টা করে তহশীলদার অন্য লোকের বন্দোবস্ত করে দিলেন। এর পর আরও দুদিন ঐ আড্ডায় ছিলাম। কাজ শেষ করে তবে কেল্লায় ফিরলাম।

ও-দেশে আছে সব ঝানু চোর। বন্নু শহরে আমার তাঁবু ছিল ডাক-বাংলোর কমপাউণ্ডে। উটওয়ালারা উট নিয়ে সরাইয়ে আশ্রয় নিয়েছে। সরাইয়ের চারদিক ঘেরা, তার ভিতর থেকে দেয়াল কেটে কখন কে উট বের করে নিয়ে গেছে, কেউ টেরও পায়নি। বহু কষ্ট করে প্রায় দুমাস পরে ঐ উট পাওয়া গিয়েছিল।

একদিন বন্নু শহর থেকে প্রায় পাঁচ-সাত মাইল দূরে একটা পাহাড়ে কাজ করতে গিয়েছি, সঙ্গে চারজন খাসাদার। পাহাড়ের উপর উঠে দূরবীণ (থিওডোলাইট) লাগিয়ে কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় একজন খালাসী বলল, "হুজুর, হরিণ!" চেয়ে দেখলাম আন্দাজ ৩৫০-৪০০ গজ নিচে নালার ধারে চার-পাঁচটা হরিণ চরছে। একজন খাসাদার অমনি রাইফল্ হাতে নিয়ে শুয়ে পড়ল, আর খুব ভালো করে লক্ষ্য করে গুলি

ছুঁড়ল। একটা হরিণ তক্ষুনি মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল, আর বাকি কটা নিমেষের মধ্যে কোথায় যেন উড়ে গেল।

দুজন খাসাদার আমার বড় পেন-নাইফখানা চেয়ে নিয়ে হরিণটাকে হালাল করতে ছুটল। হরিণটা মরেনি, গুলি লেগে তার কোমর ভেঙে গিয়েছিল, নড়বার শক্তি ছিল না। এরা ছুটে গিয়ে তাকে জবাই করল, তারপর গোটা একটা পিছনের ঠ্যাং ছাড়িয়ে নিল, দুজনে মিলে হরিণটাকে ঘাড়ে করে নিয়ে এল। আর দুজন এর মধ্যেই শুকনো ঘাস, কাঁটাঝোপ ইত্যাদি জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়েছে, আর একটা চ্যাপটা সমান পাথর আগুনের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। হরিণ নিয়ে এলে পর চারজনে মিলে ঐ পাটাকে ফালি-ফালি করে কেটে, ঐ গরম পাথরটার উপর রাখতে লাগল। মিনিট দুই ছ্যাঁকছোঁক করলে পর, উল্টে দিল, আরও মিনিট দুই ছ্যাঁকছোঁক করলে পর, তুলে খেতে আরম্ভ করল। তখনো রক্ত পড়ছে।

একজন আমাকে জিগগেস করল, "খাবে ?"

আমি বললাম, "না।"

তাই শুনে একজন ঠাট্টা করে বলল, "বাবু ক্যায়সা খায়গা ? ঘি চাহিয়ে, মাশালা চাহিয়ে, তব না বাবু খায়গা !"

দেখতে-দেখতে চারজনে মিলে একটা গোটা রাং, চার-পাঁচ সের মাংস হবে, সমস্তটা খেয়ে শেষ করল।

একবার আমাদের এক সাহেবের তাঁবু পড়েছে এক গ্রামে। তাঁবু থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে উটওয়ালারা উট চরাচ্ছে, সঙ্গে লোকজন রয়েছে। বেলা সাড়ে-তিনটে-চারটের সময় কোথা থেকে আট-দশজন লোক হাতিয়ার-টাতিয়ার নিয়ে এসে উপস্থিত ! আর এসেই উটগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। উটওয়ালাদের চিৎকার শুনে খাসাদাররা বন্দুক হাতে ছুটল, একটু কাছে পৌঁছতেই গুলি চালাতে আরম্ভ করল। 'লুটেরা'-রা যখন দেখল উট

সুদ্ধ পালাতে পারবে না, তখন উট ছেড়ে দিয়ে পিট্টান দিল। যাবার সময় দুটো উটের পা কেটে দিয়ে গেল। খাসাদাররা ঐ দুটো উটকে তাড়াতাড়ি জবাই করে ফেলল, আর চারদিকের লোকজন মিলে তো মহা ভোজ!

ওখানকার লোকগুলোই বেখাপ্পা। সর্বদা হাতিয়ার সঙ্গে থাকে আর কথায়-কথায় হাতিয়ার চালায়। শেষটা আমাদের সার্ভেয়ারদের উপরও গুলি চালাতে আরম্ভ করল। বেচারা সার্ভেয়াররা সমস্তদিন খেটে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে, স্নান করে, খেয়ে-দেয়ে শুয়েছে, এইবার একটু আরাম করবে, আর অমনি দুড়ুম-দুড়ুম তাঁবুর উপর গুলি! সার্ভেয়ারদের সঙ্গেও সশস্ত্র পাহারা আছে, কিন্তু অন্ধকারে তারা কী করবে? তার উপর তাঁবু নালার ধারে, গুলি চালাচ্ছে পাহাড়ের উপর থেকে। কোনো রকমে রাত কাটিয়ে, সকালে উঠে একেবারে কেল্লায়!

অবশেষে সেবারের মতো কাজ বন্ধ করে আমরা আবার ব্যাঙ্গালোরে ফিরে গেলাম।

● ৮ ● (১৯০৫-১৯০৬ ব্রহ্মদেশ। শান স্টেট) আবার আমরা শান স্টেটে গেলাম। দুবছর আগে আমি আর এক সাহেব এই সমস্ত জায়গাতে দূরবীণের কাজ করেছিলাম, এবার আমার ঘাড়ে জরীপ করবার ভার পড়ল।

পাহাড়ের উপর জঙ্গলের লোকরাও চাষবাস করে কিন্তু তাদের প্রক্রিয়াটা অন্য ধরনের। হাল সেখানে চলে না, কেননা একে তো পাহাড়ে সমান জমি নেই; দ্বিতীয়ত, জমি পাথরের মতো শক্ত। সুতরাং বাধ্য হয়ে তাদের চাষের অন্য ধারা বের করতে হয়েছে।

পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে, মাটি পরীক্ষা করে, উপযুক্ত জমি ঠিক করে

নেয়। ধান, তুলো, আফিঙ—প্রত্যেকটার জন্য বিশেষ রকমের জমি চাই। জমি ঠিক হলে, তারা সমস্ত জঙ্গল কেটে ফেলে। জঙ্গল কেটে দু-আড়াই মাস ফেলে রাখে, গাছপালা সমস্ত রোদে শুকিয়ে প্যাঁকাটির মতো হয়ে যায়। তারপর ভালো দিন দেখে, পুজো দিয়ে, তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেলে, জায়গাটা পরিষ্কার করে নেয়। তারপর তাতে ছোট-ছোট গর্ত খুঁড়ে, গর্তে দু-চারটি করে বীজ রেখে, পোড়া মাটি চাপা দেয়। ধান, কচু, কুমড়ো, লঙ্কা—সমস্ত ঐ একই জমিতে। তারপর চারা বেরোলে, মাচা বেঁধে রাত জেগে পাহারা দেয়, নইলে বুনো শূয়োর বা হরিণ এসে সব শেষ করবে।

মার্চ-এপ্রিল মাসে যখন এই সব জমিতে আগুন ধরিয়ে দেয় তখন চারদিক ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায়। এক-এক সময় এমন ধোঁয়া হয় যে দিনের বেলাও তিন-চার মাইল দূরের পাহাড় দেখা যায় না। অনেক সময় এই খেতের—বর্মীরা বলে 'টাউনিয়া,' আসামে বলে 'জুম'—আগুন সমস্ত পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে, আবার কখনো গরমের দিনে শুকনো গাছে আপনা থেকেই আগুন লেগে যায়, এক ডালের সঙ্গে অন্য ডালের ঘষা লেগেই বোধ করি। রাত্রে দূর থেকে দেখতে বেশ, কিন্তু যারা জঙ্গলে থাকে তাদের মাঝে-মাঝে বিপদে পড়তে হয়।

একবার একজন সার্ভেয়ারের তাঁবু এই জঙ্গলের আগুনে পুড়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে দু-তিনজন খালাসীও পুড়ে মরেছিল। তাঁবুর চারদিকে লম্বা-লম্বা ঘাস ছিল। ভোরে যখন খালাসীরা রান্না করতে উঠেছে, তখন তারা দূরে পাহাড়ের উপরে আগুন দেখতে পেয়ে বলেছিল, "বাবু, আজ কাজে যেও না। ঐ দেখ আগুন, মনে হচ্ছে যেন এইদিকেই আসছে। আজ আমরা তাঁবুর চারদিকের ঘাস পরিষ্কার করে ফেলবার জন্য পাল্টা আগুন ধরাতে চাই।"

সার্ভেয়ার বললে, "আগুন ঢের দূরে। এখানে পৌঁছতে এখনো দু-তিন-দিন লাগবে। একদিনের তো কাজ বাকি। আজ সেইটুকু শেষ করে, কাল ভোরে চলে যাব।"

সার্ভেয়ার কাজে চলে গেল। সন্ধ্যার পর ফিরে এসে, খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল। ভোরে উঠে চলে যাবে। রাত্রে ঝড়ের মতো হাওয়া চলতে লাগল, আর ঘুম ভাঙবার আগেই আগুন এসে তাদের ঘিরে ফেলল। সার্ভেয়ার আর জন তিনেক লোক অতি কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিল, বাকিরা পুড়ে মরেছিল।

একদিন আমিও এই আগুনের হাতে পড়েছিলাম। পাহাড়ের উপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছি, সামনে আগুন, তখনো পথ থেকে একটু দূরে। লোকজনদের এগিয়ে দিয়ে, পিছন থেকে তাড়া দিয়ে, লম্বা-লম্বা পা ফেলে চললাম, আগুন পথের উপর পৌঁছবার আগেই পার হয়ে যাব। লোকজন সকলেই পার হয়ে গেছে, আমিও প্রায় পেরিয়ে গিয়েছি, এমন সময় হাওয়াতে আগুন উড়িয়ে এনে ফেলল প্রায় পথের পাশে। আমি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম, ইচ্ছেটা যে আগুন ঘিরে ফেলবার আগেই পার হয়ে যাব, আর তখুনি একটা জ্বলন্ত ডাল এসে পড়ল একেবারে সামনে ঘাসের উপর। দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল, সঙ্গে-সঙ্গে পিছনে দুমদাম বাঁশ ফাটতে আরম্ভ করল, আর ঘোড়াটা ভড়কিয়ে গিয়ে একেবারে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দে ছুট! খালাসীদের পার হয়ে একটা নিচু গাছের ডালের তলা দিয়ে ছুটল। ডালটা আমার বুকে লেগে আমি তো পাঁচ-সাত ফুট দূরে ছিটকিয়ে পড়লাম, ঘোড়াটা দিব্যি গলে বের হয়ে গেল। আমার শুধু পায়ে একটু চোট লেগেছিল, তিন-চারদিন খুঁড়িয়ে হেঁটেছিলাম। পকেট থেকে ঘড়িটা দশ-বারো ফুট দূরে ছিটকিয়ে পড়েছিল কিন্তু থামেনি, সমানে টিকটিক করছিল। আর ঘোড়াটা পঞ্চাশ কদম গিয়েই থেমেছিল।

● ৯ ● (১৯০৬-১৯০৭ ব্রহ্মদেশ। পকোক্কু, চীন হিল্‌স্) শান দেশে আর আমার যাওয়া হয়নি। এবছর অন্য আপিসের সঙ্গে পকোক্কু আর চীন হিল্‌স্-এ কাজ করতে গিয়েছিলাম। লোকজন, দেশ, ভাষা সবই আমার কাছে নতুন। পাঁচ-ছয় বছর শান স্টেটে কাজ করে শান ভাষা একটু-একটু শিখেছিলাম। এখানে এসে সেসব আমার কোনো কাজে লাগল না। নতুন করে সব জিনিসের পত্তন করতে হল।

এখানেও জঙ্গলের কাজ, স্থানে-স্থানে পথের কষ্ট, অর্থাৎ পথ না থাকার কষ্ট। রাস্তা নেই বললেই চলে, বিশেষত পাহাড়ে। পাহাড়ে নদী, তাই আশ্রয় করে লোকজন চলে। আর একটা পথ আছে কিন্তু তাতে বড্ড ঘোরফের।

নদীতে হাতি চলা অসম্ভব—এদেশে খচ্চর নেই, মাল বইবার জন্য সরকারী হাতি একটা সঙ্গে আছে। পথ বলতে যা বোঝায় তার কিছুই নেই, আছে শুধু জল আর বড়-বড় চ্যাটালো পাথর। নদীর কিনারাগুলো এক-এক জায়গায় নীরেট পাথর আর দেয়ালের মতো খাড়া, তার গায়ে পা রাখবার মতো একটু-একটু জায়গা আছে বটে, কিন্তু সে অতি সামান্য। তার উপর দিয়ে বাঁদরের মতো চার হাত-পায়ে না হলে চলবার যো নেই। মানুষেরই এই দশা, হাতি চলে কী করে?

ভোরবেলায় উঠে, তাড়াতাড়ি চা খেয়ে কাজ দেখতে বেরিয়েছি, সঙ্গে একজন বর্মী সার্ভেয়ার, মাং-ফো-হান, বড় ভালোমানুষ। আমাদের তাঁবু ছিল আটশো ফুট উঁচুতে, আর যেতে হবে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়ে। মালপত্র নিয়ে হাতি গেছে অন্য পথে, তার সঙ্গের লোকজনদের পাঁচ-ছয় মাইল দূরে একটা হাতিওয়ালাদের আড্ডায় পৌঁছে তাঁবু ফেলতে বলে দিয়েছি। দু-আড়াই মাইল দূরেই আরও একটা হাতির আড্ডা আছে বিশেষ করে বলে দিয়েছি যেন সেখানে না যায়।

আমরা কাজ করতে-করতে চলেছি। একে তো ঐ রাস্তা, তায় আবার পাহাড় বেজায় চড়াই, তার দশ আনা উঠতে-না-উঠতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কাজেই সার্ভেয়ারকে বললাম, "চল, এখন ফিরি, বাকি কাজ কাল এসে শেষ করব।"

আমরা সোজাসুজি নদীতে নামতে আরম্ভ করলাম। নামতে-নামতে হাঁটুতে ব্যথা ধরে গেল, তবু পথ আর ফুরোয় না। ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল, তখনো নদী প্রায় সিকি মাইল নিচে রয়েছে। বাকি পথটুক আরও খাড়া, আলো না হলে তাতে চলা অসম্ভব। কাজেই আমরা সেখানে বসে-বসে শুকনো বাঁশ দিয়ে চার-পাঁচটা বড়-বড় মশাল তৈরি করে নিলাম। মশাল জ্বেলেও কি সহজে নামা যায়? কাঁটাগাছ ধরে-ধরে নামতে গিয়ে অনেকেরই হাত ছড়ে গেল।

নদীতে পৌঁছে সার্ভেয়ারকে জিগগেস করলাম, "আড্ডা কত দূরে?"

সে বললে, "একটা আধ মাইল নিচে, আরেকটা দেড়-দু মাইল উপরে হবে, অন্ধকারে ভালো করে বুঝতে পারছি না।"

উপরের আড্ডাটাতেই আমাদের যেতে হবে। সে যে কী বিদঘুটে রাস্তা তা আর কখনো ভুলব না। কখনো বালির উপর দিয়ে, কখনো বা পাথর ডিঙিয়ে, আবার কখনো বাঁদরের মতো কাঁটা, বাঁশ, লতাপাতা আঁকড়িয়ে ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছি। দুটো মশালের আলোতে সে অন্ধকারে বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল না। দেড় মাইল পথকে মনে হচ্ছিল যেন আট-দশ মাইল। হাঁটতে-হাঁটতে যখন আর পা চলতে চায় না, তখন সার্ভেয়ারকে জিগগেস করলাম, "আর কদ্দুর?"

সে বললে, "অধেক এসেছি।" শুনে তো আমার চক্ষুস্থির!

খালাসীরা বললে, "হুজুর, একটু না জিরোলে আর চলতে পারছি না।"

কী করি? তাদের সেখানে রেখে, সার্ভেয়ার আর একজন খালাসীকে—

যার কাছে আমার খাবারটুকু ছিল—সঙ্গে নিয়ে চললাম। খালাসীর হাতে একটা মশাল বেশি দিয়েছি, দরকার হলে জ্বালাব। এমনি করে আরও কিছু দূর গেলাম। মনে হচ্ছিল কত ঘণ্টাই না জানি চলেছি। জিগগেস করলাম, "আর কদ্দূর ?"

সার্ভেয়ার বললে, "পঞ্চাশ-ষাট জরীপ হবে।"

শুনে মনে একটু উৎসাহ হল, আবার খানিকটা চলে একটা নদী পার হলাম। ততক্ষণে সার্ভেয়ারের হাতের মশালটা নিবু-নিবু হয়ে এসেছে। সে খালাসীকে বললে, "সেই যে আরেকটা মশাল এনেছিলি—সেটা দে।"

সে বললে, "সেটা তো ফেলে দিয়েছি।"

ব্যস, আমাদের তো চক্ষু চড়কগাছ !

"ফেলে দিয়েছিস কি রে ব্যাটা ? কার হুকুমে ফেললি ?"

"কেন বাবু যে বলল আর বেশি দূর নেই।"

তখন আরেকটা মশাল তৈরি করা ছাড়া উপায় নেই। খালাসীকে বললাম, "তোর সঙ্গে দা আছে, সেটা দে।"

কিন্তু দাখানাও বেটা পিছনের লোকদের কাছে রেখে এসেছে। এখন উপায় ? সার্ভেয়ারকে বললাম, "শুকনো লতাপাতা জড়ো করে এই নিবু-নিবু মশালটার বাকি বাঁশটুকু দিয়ে একটু আগুন জ্বাল। তারপর শুকনো বাঁশ পাথর দিয়ে থেঁতলে মশাল বানাও।"

ততক্ষণে মশালটা নিবে গিয়েছিল। সার্ভেয়ার আর খালাসী শুকনো পাতা জড়ো করে, তার ভিতর ঐ মশালের বাকি বাঁশ কখানা চাপা দিয়ে, উপুড় হয়ে তাতে ফুঁ দিতে লাগল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি। আমার পিছনে ছোট নদী, সামনে হাত ছয়-সাত দূরে একটা মস্ত বড় চওড়া পাথর প্রায় আমার সমান উঁচু। ওরা ক্রমাগত খালি ফুঁ-ই দিচ্ছে, হিমে ভেজা পাতা সহজে জ্বলতে চায় না।



এমন সময় ঐ বড় পাথরটার দিকে আমার চোখ পড়ল। দেখলাম তা: উপর কিসের দুটো চোখ জলজ্বল করছে। চোখ দুটো আমারই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। চোখ পাথরটা থেকে প্রায় দেড় হাত উঁচুতে ভাবলাম নেকড়ে বা হায়েনা হবে। আবার ভাবলাম যদি তাই হয় তে অতো দূরে-দূরে কেন?

ততক্ষণে পাতায় সবে একটু আগুন ধরেছে। এখন যদি আমি কিছু বলি বা গোলমাল করি, ওরা আর আগুন জ্বালাতেই পারবে না, আর তা হলে বিপদ। কাজেই আমি চুপ করে রইলাম। ওরা তখনো খালি ফুঁয়ের উপর ফুঁ দিচ্ছে, দিতে-দিতে হঠাৎ যেমনি দপ করে আগুন জ্বলে উঠল, অমনি সেই জানোয়ারটাও ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। বাবা! এই বড় বাঘ! এতক্ষণ গুঁড়ি মেরে ছিল, তাই বেশি উঁচু দেখাচ্ছিল না।

বাঘটা উঠেই লাফ দিয়ে মাটিতে নামল, আর অমনি সার্ভেয়ারও বুঝতে পেরেছে। সে সেই দেশের লোক, বনে-বনে ঘুরে বেড়ায়, তার কাছে লুকোবার যো নেই। সে লাফিয়ে উঠে বলল, "ওটা কী রে?"

আমি বললাম, "যাই হোক, এখন তো চলে গেছে, শিগগির মশাল জ্বাল।"

ততক্ষণে আগুন খুব জ্বলে উঠেছে আর চারদিক আলো হয়ে গেছে। বাঘটা তাই দেখে আস্তে-আস্তে পাহাড়ে উঠে গেল। শুকনো পাতার উপর তার পায়ের শব্দ শুনে সার্ভেয়ার বলল, "বড়া জবর শের।"

খালাসীটা কিছু বলল না, সে খালি ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

যাই হোক, আমরা তাড়াতাড়ি মশাল তৈরি করে জ্বেলে নিয়ে সেখান থেকে রওয়ানা দিলাম। সার্ভেয়ার ঠিকই বলেছিল, একটু চিৎকার করে ডাকবামাত্র আড্ডা থেকে জবাব এল, আর আমরাও একটু পরেই আড্ডায় পৌঁছলাম।

আড্ডায় পৌঁছে দেখি সেখানে খালি সার্ভেয়ারের দুজন খালাসী আর তার বিছানাটি আর খালাসীদের খান কয়েক কম্বল আছে। হাতি বা অন্য লোকজন বা জিনিসপত্র কিছুই আসেনি। সে সব যে কোথায় গেছে এরা তার কিছুই জানে না। জিগগেস করলে খালি বলে, "তারা আসেনি।"

সে রাত্রে আর খাওয়া-দাওয়া হল না, একটা কম্বল জড়িয়ে কোনো রকমে রাত কাটানো গেল। সকালে উঠে দুজন খালাসীকে হাতির খোঁজে পাঠালাম, আর বাকি লোকদের নিয়ে আমরা কাজে বেরিয়ে গেলাম। একজন খালাসীর কাছে সের খানেক চাল ছিল, খালাসীরা তাই রেঁধে নুন দিয়ে খেল, আমাদের দুজনের উপোস! সন্ধ্যার পর কাজ থেকে ফিরে দেখি গুণধররা হাতি নিয়ে এসেছেন। দাঁত বের করে বললেন, "ভুলে অন্য আড্ডায় গিয়েছিলাম।"

যে আড্ডার সম্বন্ধে বিশেষ করে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল, সব জায়গা ছেড়ে হতভাগারা সেইখানেই গিয়েছিল। এখন যে এসেছে তাও আমাদের পাঠানো দূত গিয়ে ডেকে এনেছে বলে!

যাই হোক, তখন আর আলোচনায় কোনো লাভ নেই। ত্রিশ ঘণ্টা পেটে কিছু পড়েনি, খিধেয় প্রাণ ওষ্ঠাগত! কাজেই তাড়াতাড়ি চারটি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। সে রাত্রে আমার যে কী চমৎকার ঘুম হয়েছিল সে আর কি বলব! তখন কেউ আমার দুটো আঙুল কেটে নিলেও টের পেতাম কিনা সন্দেহ!

এপ্রিল মাস, বেজায় গরম পড়েছে। সার্ভেয়ার, খালাসী সকলেই ব্যস্ত, তাড়াহুড়ো করে ভোরে কাজে বেরোয়, সমস্ত সকালটা খেটেখুটে ক্লান্ত হয়ে বেলা দুটো-তিনটের সময়ে যদি কোনো নালায় জল পায়, খেয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা করে। যতক্ষণ ঠাণ্ডা থাকে পাহাড়ের উপরে-উপরে কাজ করে। দুপুর পার হলে জলের খোঁজে নালায় নামে। কখনো-কখনো আবার জল পাওয়াই যায় না, নালা শুকনো, তাতে আছে খালি বালি আর পাথর।

সার্ভেয়ার রণজিৎ সিং জলের আশায় এমনি একটা নালায় নেমেছে, আর নালার ভিতরে জরীপ টেনে চলেছে। সার্ভেয়ার একটা মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে, টিণ্ডেল আর মেট জরীপ টেনে আনছে। একজন খালাসী আগে-আগে গিয়েছে, সে সামনের মোড় থেকে সিগনাল দেবে। হঠাৎ লোকটি দাঁড়াল, কী যেন নিবিষ্ট মনে দেখল, তারপর ফিরে উর্ধ্বশ্বাসে দে দৌড়! একেবারে সার্ভেয়ারের কাছে হাজির।

"কেয়া হ্যায় রে?"

"বাবুজী, বড়া জবর সরপ্ হ্যায়, হামারা জং কা মাফিক্ মোটা হোগা!"

ততক্ষণে পিছনের লোকরা এসে পড়েছে। তাদের সঙ্গে দুজন বর্মী কুলি ছিল, তারা বললে, "চল, মারব। ও সাপ আমরা খাই, বড় চমৎকার খেতে।"

রণজিৎ সিং-এর হাতে একটা বল্লম ছিল, কুলীদের কোমরে খুব ধারাল দা ছিল, আর সকলে বাঁশ কেটে চোখা-চোখা বল্লম তৈরি করে নিল। সেই

জায়গায় এসে কিনারার ঘাসের দিকে আঙুল দেখিয়ে খালাসী বলল—"উও হ্যায়।"

সকলে তাকিয়ে দেখল প্রকাণ্ড গোসাপের মাথার মতো একটা মাথা দেখা যাচ্ছে! আর মুখ দিয়ে যেন জিভ বের হয়ে রয়েছে। বর্মীরা পাথর ছুঁড়ে মারল, আর সমস্ত ঘাস নড়ে উঠল, কিন্তু মাথাটা খুব সামান্য নড়ল। তখন সকলে মিলে বাঁশের বল্লম নিয়ে জায়গাটুক ঘিরে ফেলল আর ঢিল ছুঁড়তে লাগল। একজন কাছে গিয়ে তার হাতের বল্লমটা ছুঁড়ে মারল আর সাপটাকে একেবারে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলল। তখন সব ওলটপালট হতে লাগল। বর্মীরা তাড়াতাড়ি আরও দু-তিনটে বল্লম দিয়ে সাপটাকে জায়গায়-জায়গায় মাটির সঙ্গে চেপে ধরল। বেচারা আগেও বিশেষ নড়তে পারছিল না, এখন একেবারে অচল হয়ে গেল।

সার্ভেয়ার কাছে গিয়ে দেখল ওটা জিভ নয়, সাপটার মুখ দিয়ে কোনো জানোয়ারের লেজ বেরিয়ে আছে, জানোয়ারটা সাপের পেটে। দুজন বর্মী দা দিয়ে চাপ দিয়ে সাপটাকে হাঁ করাল আর দুজন ঐ ল্যাজটা ধরে টানতে লাগল। টানতে-টানতে বের হয়ে এল প্রকাণ্ড একটা হনুমান। কী করে যে হনুমানের মতো হুঁশিয়ার জানোয়ারকে সাপটা ধরেছিল কে জানে!

বর্মীরা বলল তারা সাপটার চামড়া ছাড়িয়ে মাংস নেবে। সার্ভেয়ার রাজী হল না, তাঁবু অনেক দূরে, শিগগির না ফিরলে রাত হয়ে যাবে। কাল তো বাকি কাজটুকুর জন্য আসতেই হবে, তখন মাংস নিতে পারবে।

অগত্যা সাপটাকে ঐ রকম মাটির সঙ্গে গাঁথা অবস্থায় রেখেই তারা চলে এল। পরদিন সকালে গিয়ে দেখে সাপটার কোনো চিহ্নই নেই, যেন উড়ে গেছে। সকলে আন্দাজ করল যে আগের দিন পেট ভরা ছিল বলে সাপটা বেশি নড়া-চড়া করতে পারেনি, পালাতেও পারেনি, আর সেই জন্যই তাকে অত সহজে কাবু করতে পেরেছিল। তারপর এরা চলে এলে রাত্রে

যখন সে একটু প্রকৃতিস্থ হল, তখন দু-চারবার গায়ে মোচড় দিয়ে ঐ সব বল্লম উপড়িয়ে ফেলে চলে গেছে।

● ১০ ● (১৯০৭-১৯০৮। পূর্ব-বঙ্গ ও আসাম) আমাদের গোটা আপিসটাই ব্রহ্মদেশ থেকে চলে এসেছে। পূর্ব-বঙ্গ ও আসামের শ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা ইত্যাদি জরীপ করতে হবে। আমার উপর আবার দূরবীণের কাজের ভার পড়েছে, স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্য ও লুশাই পাহাড়ে কাজ করতে হবে।

যেমন পথের কষ্ট বর্মায় ছিল, এখানেও তেমনি কষ্ট বা তার চেয়েও বেশি। সে সব কষ্ট সহ্য করেই সব জায়গায় কাজ করে এসেছি, হার মানতে হয়েছিল খালি ত্রিপুরার রাজার দেশে এক জায়গায়। বেজায় জঙ্গল, রাস্তা নামে আছে মাত্র, কাজের বেলা খুঁজে পাওয়া দায়। প্রায়ই নালায়-নালায় পথ, সারাদিন জলে-জলেই চলতে হয়, মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট গ্রাম আছে, তাতে কুকী ইত্যাদিদের বাস। আমাকে লংতরাই যেতে হবে। সে বড় বিদঘুটে পাহাড়, তার দু পাশ দেয়ালের মতো, শুধু শাদা, কালো আর লাল পাথর, আর ঘোর বন। অনেক জায়গায় আবার শুধুই পাথর, গাছপালার নামগন্ধ নেই।

এই পাহাড়ের উপর আমাকে যেতে হবে, সঙ্গে হাতি আছে কিন্তু হাতি সেখানে চড়তে পারবে না। আমাদের সঙ্গে হাজারীবাগের খালাসী আছে, শুধু তাদের দিয়েও কুলোবে না। কাজেই দেখলাম যে আরও পনরো-কুড়িজন লোক না হলে সে পাহাড়ে যাওয়া অসম্ভব। এখন মুশকিলের কথা এই যে যদিও আশে-পাশে দশ-বারো মাইলের মধ্যে গ্রাম আছে, সেখানকার কেউই লংতরাই যেতে রাজী নয়। বাপরে, সে যে তাদের দেবতা! সেখানে গেলে

কি আর তারা কেউ বাঁচবে? যে যাবে সেই মরবে। তারা লংতরাইকে পুজো করে, তার গায়ে পা ঠেকালে কি আর রক্ষে আছে!

গ্রামের চৌধুরীকে ডেকে কত বোঝালাম, কিন্তু তারও মনটা লংতরাইয়ের পাথরের মতোই শক্ত, কিছুতে যেতে সম্মত হল না। সে বললে, "তোমাদের এক সাহেব আমাদের নিষেধ কাকুতি-মিনতি না শুনে লংতরাই গিয়েছিল। মহারাজার হুকুম, কী করি, না গিয়ে উপায় ছিল না। আমরা শূয়োর, মুর্গি, হাঁস দিয়ে লংতরাইকে তুষ্ট করে পাহাড়ে চড়লাম। সাহেব তার কিছুই করল না। তার সাজাটাও তাকে পেতে হল। সেই যে লংতরাই তাকে জ্বর দিয়ে দিলেন, আর সে ভালো হল না, কদিন পরেই মরে গেল। আর আমরা যাব না সেখানে, সেবার অনেক খরচ করিয়ে আমাদের লংতরাই ছেড়ে দিয়েছিলেন, এবার আর ছাড়বেন না।"

শেষ পর্যন্ত আমাকে বাধ্য হয়ে লংতরাই না গিয়েই ফিরতে হল, এমন একটি লোক পেলাম না যে আমাদের শুধু পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

ত্রিপুরা রাজ্যে শিকার জুটত বেশ। পাখি, হরিণ, শূয়োর, আরও বড়-বড় জানোয়ার মায় গণ্ডার, হাতি। শিকারের অবসর আমাদের নেই, তবে কাজের শেষে পেটের দায়ে যা কিছু রাস্তায় মিলে যায়।

শিকারী পর্বতে কাজ করতে গিয়েছিলাম। কেন যে শিকারী নাম হয়েছে তা আর কেউ বলতে পারল না। এক জায়গায় অনেকগুলো বুনো' ফলের গাছ, গ্রামের লোকেরা বলল সকাল সন্ধ্যায় ওখানে জানোয়ার আসে—হরিণ, শূয়োর—ফল খাবার লোভে। আগে থেকে গিয়ে চুপ করে বসে থাকলে একটা কিছু শিকার মিলবেই। গাছের উপর তারা মাচা তৈরি করে রেখেছে। আমি বললাম, "মাচায় ওঠা হবে না, জুতো নিয়ে উঠতে পারব না, পড়ে গেলে হাত-পা ভাঙবে।"

"হরিণের খোঁজে বাঘও আসে।"

"তা আসুক।"

বিকেল চারটের সময় গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে একটা বড় গাছে পিঠ দিয়ে বসলাম—আমি আর একজন খালাসী, গ্রামের লোকটি জায়গা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

একটু বাদেই জানোয়ারের সাড়া পাওয়া যেতে লাগল, ছোট হরিণের, যাকে বলে 'বার্কিং ডিয়ার'—তার ডাক শুনতে পেলাম, বেশ কাছেই ডাকছিল। একটু পরেই জানোয়ারের পায়ের সুর-সুর শব্দও একটু-একটু কানে আসতে লাগল। থেকে-থেকে শুকনো পাতার উপর পায়ের শব্দ হচ্ছিল। তখনো বেশ আলো রয়েছে, আমি তো বন্দুক বাগিয়ে তৈরি, এই বের হল আর কি! পর মুহূর্তেই আমি একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম, ঝোপ থেকে বেরোল আমারই এক খালাসী, শোধন।

"হতভাগা, তাঁবুতে মানা করে এলাম এদিকে যেন কেউ না আসে, আর তুই এখানে মরতে এলি কেন?"

"লাকড়ি ঢুঁড়তে-ঢুঁড়তে চালা আয়া হুজুর, খেয়ালসে উতর গায়া যো কি হুজুর হিঁয়া পর শিকারকে লিয়ে বৈঠে হ্যায়।"

বলা বাহুল্য সেদিন আর আমাকে দিয়ে শিকার করা হল না, ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম। শোধন জাতে নাপিত কিন্তু বুদ্ধি মোটেই নাপিতের মতো নয়। আর একবারও ঐ শোধনের বুদ্ধির দৌড়ে হাতের শিকার ফসকে গিয়েছিল, সে কথা পরে বলছি।

মহারাজার দেশে দূরবীণের কাজ শেষ করে আমরা লুশাই পাহাড়ে চলেছি। সাড়ে-ছশো-সাতশো বর্গ মাইলের মধ্যে আর গ্রাম নেই, কোনো রাস্তাও নেই। সেই লুশাই পাহাড়ের সীমানায় আমাদের জন্য লুশাই পাহাড়ের

প্রধান শহর আইজল থেকে লোক রসদ ইত্যাদি আসবার কথা, ততদূর অবধি পৌঁছে দেবার জন্য মহারাজার লোক আমাদের সঙ্গে চলেছে। পথে একটি পাহাড়ে আমরা কাজ করব। এতে চার-পাঁচদিন লাগবে, আমরা আটদিনের খোরাক সঙ্গে নিয়েছি। লঙ্গাই নদীতে সীমানা, সেখানে পৌঁছবার আগে একটা উঁচু পাহাড় পার হতে হয়, তারই চুড়োতে আমাদের কাজ।

পথ নেই, বুনো হাতির রাস্তা আছে। মাঝে-মাঝে কাঠুরেদের আড্ডা আর রাস্তা পাওয়া যায়, তারা কখনো-কখনো এই জঙ্গলে কাঠ কাটতে আসে। আমি যে পাহাড়টাতে কাজ করব সেটা মহারাজার লোকদের দেখিয়ে দিলাম। তারা অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করে, চলতে লাগল।

ভীষণ বন, আর পাহাড়ের পর পাহাড়, খালি পাহাড়ের পর পাহাড়। সরু-সরু নালা আর তার দুপাশে পাহাড়, একবার চড়ো, একবার নামো, আবার চড়ো, আবার নামো—সকাল থেকে সন্ধ্যা এই রকম করতে হয়। মাঝে-মাঝে ভাঙা কুঁড়েঘর পাওয়া যায়, সেগুলো কাঠুরেদের আড্ডা। তার অনেকগুলোই বুনো হাতিতে ভেঙে ফেলেছে। বন এমনি ভয়ানক যে সূর্যের মুখ আর দেখা যায় না, কোনদিকে যে যাচ্ছি তাও সব সময় বুঝতে পারা যায় না। সেইজন্য মাঝে-মাঝে বড়-বড় গাছে—দেড়শো-দুশো ফুট উঁচু গাছও আছে—চড়ে দেখে নিতে হয় পাহাড়টা কোন দিকে।

তিনদিনে সেই পাহাড়ে পৌঁছে আমরা তার উপর কাজে লেগে গেলাম। লোকজনদের বলে দিলাম, "যেখানে জল পাবে সেইখানে পাহাড়ের উপর তাঁবু লাগাও, নালার ধারে তাঁবু লাগিও না যেন।"

সন্ধ্যার সময় ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি ঠিক জানোয়ারের রাস্তার মাঝখানে তাঁবু খাটিয়েছে। রাত্রে যে কোনো জানোয়ারই আসুক না কেন, সে ঐ পথে এসে একেবারে তাঁবুতে হাজির হবে।

তখুনি তাড়াহুড়ো করে, তাঁবুর সামনে আর পিছনে, পথের উপর

প্রকাণ্ড দুই ধুনি জ্বালানো হল। তারপর বাঁশ কেটে রাস্তা বন্ধ করে দিলাম, সে পথে জানোয়ার আসবার আর কোনো সুবিধাই রইল না।

রাত্রে একটা প্রকাণ্ড বাঘ এসে অনেক চেষ্টা করেও সে পথে নামতে না-পেরে সে কি তার রাগ আর গর্জন! আমি তাড়াতাড়ি বন্দুক নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লাম, কিন্তু বাঘটাকে দেখতে পেলাম না। তার গর্জনে এদিকে কানে তখনো তালা লাগছিল, আর মাটি সত্যি-সত্যিই কাঁপছিল। শেষটা আন্দাজে তিন-চারবার বন্দুকের আওয়াজ করবামাত্র বাঘটা সরে পড়ল।

এদিকে খালাসী বেচারারা বাঘের ডাক শুনেই দল সুদ্ধ ছুটে গিয়ে তাঁবুতে ঢুকেছে। দু-তিন হাত উঁচু বাঁশের মাচা বেঁধে, তার উপর তারা তাঁবু খাটিয়েছিল। এতগুলো লোক এক সঙ্গে দৌড়ে তাঁবুতে ঢুকবামাত্র বাঁশের মাচা-টাচা ভেঙে হুড়মুড় করে সকলে চিতপাত! তারপর সব হেসে গড়াগড়ি!

এর পর আরও একদিন আমরা সেই জায়গায় ছিলাম, কিন্তু বাঘমশাই আর আসেননি।

আগেই বলেছি যে আটদিনের খাবার সঙ্গে নিয়ে আমরা লঙ্গাই নদীর দিকে চলেছি। সেখানে লুশাই পাহাড় থেকে আমাদের জন্য লোক আসবে, রসদও সঙ্গে আনবে। সেই লোকজন এসেছে কিনা দেখবার জন্য আমি লঙ্গাই নদীতে কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলাম।

পরদিন অন্য লোকজন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজেও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখি লুশাই পাহাড়ের লোকদের কোনো খবর নেই। দেখেই তো আমার চক্ষুস্থির! আমার চাল ফুরিয়ে গেছে, সঙ্গে কুড়ি-বাইশজন লোক, এরা খাবে কি?

খালাসীদের যার কাছে যেটুক চাল ছিল তাড়াতাড়ি সব জড়ো করে

এনে আমার নিজের তাঁবুতে রেখে দিলাম। তিন-চারজন লোককে টাকা দিয়ে তক্ষুনি মহারাজার রাজ্যে চাল আনতে পাঠালাম। দুজন খালাসীকে পাঠালাম নদীর ধারে-ধারে নিচের দিকে নেমে গিয়ে লুশাই পাহাড়ের লোকদের খবর দিতে। বাকি সকলে সেইখানেই থাকলাম।

রোজ সকালে মাথা পিছু তিন বা সাড়ে-তিন ছটাক চাল মেপে দিই, তারা তাই রেঁধে ফেন শুদ্ধ খায়। বেচারা খালাসীদের বড় কষ্ট! রোজ এক সের চাল খাওয়া যাদের অভ্যাস, সাড়ে-তিন ছটাকে তাদের কী হবে?

বন্দুক নিয়ে বনে-বনে ঘুরি কিন্তু শিকার আর মেলে না। খালাসীরা এসে মিনতি করে বলতে লাগল, "যে চাল আছে আমাদের দিন, আমরা একবার পেট ভরে খাই, তারপর কপালে যা আছে তাই হবে।" আমি অনেক বুঝিয়ে তাদের তাঁবুতে ফিরিয়ে দিলাম।

পরদিন ভোরে উঠে লোকজন সঙ্গে নিয়ে আবার শিকারের খোঁজে বেরোলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য! যখন কাজে বেরোই কত জানোয়ার দেখতে পাই, আর সেদিন কিছুই চোখে পড়ছে না, একটা পাখিও না। অনেকক্ষণ ঘুরে-ঘুরে যখন নিরাশ হয়ে তাঁবুর দিকে ফিরে চলছি, তখন খুব বড়-বড় দুটো হরিণ—সম্বর—দেখতে পেলাম। হরিণ দুটো জানোয়ারের রাস্তা ধরে পাহাড় থেকে নামছিল।

আমরা উপর থেকে দেখতে পেয়ে, ঘুরে এসে, পথের পাশে এক জায়গায় বুনো হলুদের গাছ ছিল, তার মধ্যে গুড়ি মেরে বসে রইলাম। তখনো হরিণ দুটো নিচে নামেনি, আমি তো বন্দুক ঘাড়ে তৈরি! আর খালাসীরা সেই জঙ্গলে সব মড়ার মতো শুয়ে পড়ল।

হরিণ দুটো আস্তে-আস্তে নামছে আর মাঝে-মাঝে দুটো-একটা লতাপাতায় মুখ দিচ্ছে, দেখে ভাবছি আরেকটু নেমে এলেই গুলি চালাব

কাছেও হবে আর কোনো গাছের আড়ালও হবে না। মাত্র হাত পনরো-কুড়ি দূরে আছে, হঠাৎ পিছন থেকে শোধন চেঁচিয়ে উঠল, "মারো, হুজুর, মারো!"

আর হরিণ তো একেবারে উধাও!

"হতভাগা, এ কি করলি!"

"মেরা খেয়াল হুয়া ক্যা হুজুর হারিণ দেখা নেহি।"

ব্যস! সকলে তাকে চেপে ধরল, এই মারে তো এই মারে! বেচারাদের কপালে সেদিনও শিকার মিলল না।

এমনি করে তিনদিন গেল, চতুর্থ দিনে আমাদের সেই তিনজন খলাসী মহারাজার রাজ্য থেকে চাল নিয়ে এল। খালাসীদের বেজায় ফুর্তি। এমনি পেট ভরে খেল যে আর সেদিন কাজ করবার সাধ্য রইল না! আবার সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় অন্য দুজন লোক আমাদের চাল-ডাল সুদ্ধ সেই লুশাইদের নিয়ে ফিরে এল।

খাওয়ার কষ্টের কথায় মনে পড়ল, বোধা টিণ্ডেল আর দশজন লোককে পাঠিয়ে ছিলাম দুটো পাহাড়ের জঙ্গল কাটতে। একে তো ঘোর বন, তার উপর আবার বেজায় কুয়াশা, বেলা সাড়ে-দশটা এগারোটার আগে সে কুয়াশা ছোটে না। বেচারীরা রাস্তা ভুল করে ফেলল। প্রথম পাহাড়ের কাজ শেষ করে আটদিনের দিন গিয়ে দ্বিতীয় পাহাড়ে পৌঁছল। মাত্র তিনদিনের খোরাক বাকি আছে। কাজ আরম্ভ হল। বোধা হুঁশিয়ার লোক, সমস্ত চাল তার নিজের হেফাজতে রাখল আর প্রত্যেক খালাসীকে মেপে রসদ দিতে আরম্ভ করল। রসদ আছে মাত্র তিনদিনের, কাজ পাঁচ-সাতদিনের কমে হবে না। আধ সের হিসাবে চাল আর তাতে দুমুঠো ডাল দিয়ে, পাতলা সাবুর মতো খিচুড়ি রেঁধে খেতে লাগল।

চারদিন পর দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে বোধা পাহাড় থেকে নেমে

ধলেশ্বরী নদীর কিনারায় এসে বসে রইল, আশা যদি কোনো লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ধলেশ্বরীতে মাঝে-মাঝে নৌকো যাতায়াত করে। দুদিন কিছু খায়নি। দ্বিতীয় দিন বিকেলে আমার লোকেদের সঙ্গে দেখা হল, তারা কুড়ি-বাইশ মাইল দুর থেকে চাল নিয়ে ফিরছিল। এরা এক বস্তা চাল নিয়ে পরদিন আবার পাহাড়ে চড়ল। গিয়ে দেখে বাকি আটজন লোক একেবারে চলৎশক্তি রহিত, দুদিন তাদের সেই পাতলা খিচুড়িও জোটেনি। দুদিন বসে তাদের খাইয়ে চাঙ্গা করে তুলে, তবে কাজ শেষ করে ফিরে এল।

জিগগেস করায় বোধা উত্তর দিল,"হাঁ, হুজুর, তকলিফ বহুত হুয়া, লেকেন সরকার কো কাম করনাই হ্যায়। তিন বরস সরকার কো নিমক খায়া, অব বেইমানি ক্যায়সে করুঁ ?"

বোধাকে যে উপযুক্ত রকম পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল সে কথা বলা বাহুল্য।

লুশাই পাহাড়ের যে জায়গায় আমার কাজ ছিল সে বড় ভয়ঙ্কর জায়গা। সাড়ে-ছশো সাতশো বর্গ মাইল জায়গা, তার মধ্যে একটা গ্রাম নেই, পথ নেই। সঙ্গে প্রায় যাটজন লোক, জিনিসপত্র। খোরাক ইত্যাদিও ঢের। সে সব বইবার জন্য দুটো হাতিও আছে।

দশ-বারোজন লুশাই বন কেটে পথ করে আগে-আগে চলে, তবে আর সবাই এগোতে পারে। অত করেও, অত মেহনতের পরও একদিনে চার-পাঁচ মাইলের বেশি অগ্রসর হওয়া যায় না। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন তাঁবু পড়ে, তখন কারো হাত-পা যেন চলতে চায় না। তার উপর আবার পাহারা দিতে হয়।

সে ঘোর বনে মানুষের নামগন্ধ নেই, শুধু জানোয়ারের কিলিবিলি !

সন্ধ্যার পর পা ফেলতে গেলে মনে হয় এই বুঝি বাঘই মাড়ালাম।

বেলা নটা-দশটার আগে আর সূর্য দেখা যায় না। এক-এক জায়গায় এমনি ঘন বন যে আকাশ দেখবার যো নেই, ঠিক মনে হয় যেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আমি সকলের আগে-আগে চলি, সঙ্গে একজন বুড়ো লুশাই থাকে, সে বড় শিকারী। তার পিছনে দুজন খালাসী, তাদের মধ্যে শ্যামলালের হাতে আমার দূরবীন, বন্দুক আর টোটার থলে, অন্যজনের হাতে আমার খাবার আর জল। তিনজনের হাতেই এক-একখানি দা।

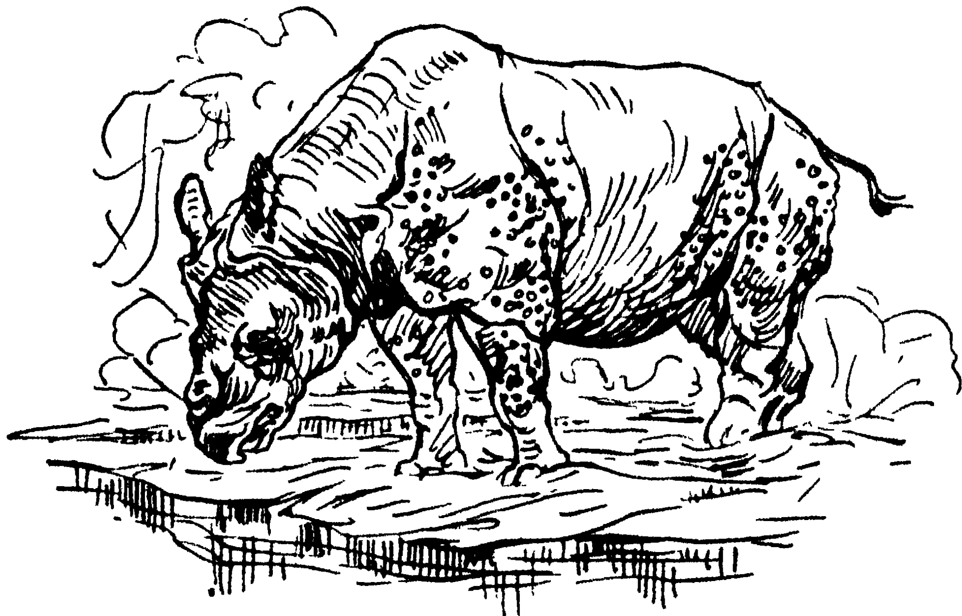
আমরা চারজনে গাছে দাগ কেটে অন্য সকলের আধ মাইল বা কিছু বেশি আগে-আগে যাই, আর সেই দাগ দেখে লুশাই কুলিরা বন কেটে পথ তৈরি করে, হাতি আর বাকি লোকদের নিয়ে আসে। রোজই এমনি করে চলতে হয়। একদিন পনরো-কুড়ি ফুট চওড়া একটা বুনো হাতিদের রাস্তা পাওয়া গেল, লোকজনদের খুব মজা, বন কাটতে হচ্ছে না।

চলতে-চলতে এক জায়গায় দেখলাম পথের উপর প্রকাণ্ড গাছ পড়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম আমাদের হাতি দুটো এ-গাছ ডিঙোবে কী করে? ভাবতে-ভাবতে গাছটার উপর চড়তে আরম্ভ করলাম, আর অমনি আমার পায়ের নিচেই যেন একটা কী হুড়মুড় করে উঠল। জিগগেস করলাম, "কেয়া হায় রে?" শ্যামলাল বললে, "হনুমান হোগা হুজুর।"

বলতে-না-বলতে সেটা গাছপালা ভেঙে কামানের গোলার মতো বেরিয়ে এল—গণ্ডার! এক নজর আমাদের দিকে দেখেই 'ঘোঁৎ' বলে দৌড় দিল। আমি পিছনের দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছি শ্যামলাল বন্দুক দেবে, কিন্তু কোথায় শ্যামলাল! সে ততক্ষণে প্রাণ বাঁচাবার সোজা পথ খুঁজছে। গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে, শ্যামলালের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে, টোটা ভরে, গণ্ডার মারতে ছুটলাম, কিন্তু ততক্ষণে গণ্ডার কোথায় যে গা ঢাকা দিয়েছে, আর তাকে খুঁজে পেলাম না।

পরদিন খুব ভোরে উঠে চলতে আরম্ভ করেছি। আজকের পথ নালায়-নালায়, সঙ্গে সেই বুড়ো লুশাই আর শ্যামলাল। ভোরবেলা নানারকম শিকার পাওয়া যায়, সেইজন্য বন্দুক ভরে নিয়েই চলেছি। শিকার সামনে পড়ছে কিন্তু মারতে পারছি না, একে ঘোর বন, তায় কুয়াশা। শিকার দেখতে-না-দেখতে জঙ্গলে মিলিয়ে যায়। হাতি, গণ্ডার, বাঘ, হরিণ, সকলেরই তাজা পাঞ্জা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পাখিরও অভাব নেই, গোটা দুই ফেজেণ্ট মেরেছি। হাতির পথ ধরে, নালাটাকে কখনো এপার কখনো ওপার করতে-করতে পাকোয়া নদীর দিকে চলেছি, আজ রাত্রে সেখানে ক্যাম্প করব।

একটা শুকনো নালা সামনে পড়েছে, আমরা তার মধ্যে নামলাম, লুশাইবুড়ো আমার আগে আর শ্যামলাল পিছনে। শ্যামলাল তখনো নালার ভিতর নামেনি, আমরা নালা পার হয়ে উপরে উঠতে যাব, এমন সময় আমাদের সামনেই ভারি একটা জল-কাদা তোলপাড়ের শব্দ হল। নিশ্চয় বুঝতে পারলাম হাতি, গণ্ডার বা বুনো মোষ হবে, কাদায় লুকিয়ে আয়েস



করছিল, আমাদের সাড়া পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমরাও তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে, দুই লাফে নালার যে পার থেকে নেমেছিলাম সেখানে উঠে ফিরে চেয়ে দেখলাম ব্যাপারখানা কী। ব্যাপার গুরুতর, বিশাল-দেহ এক গণ্ডার, যমদূতের দাদামশায়ের মতো, দাঁড়িয়ে ফোঁস-ফোঁস করছে। লাল দুটো চোখ মিটমিট করছে, কান দুটো পিছন দিকে হেলানো। আমার পকেটে তিনটি মাত্র গুলিওয়ালা টোটা, মাঝে ফুট পনরো চওড়া নালা, ওপারে গণ্ডার, শ্যামলাল পালিয়েছে।

লুশাইটি ক্রমাগত বলছে, "মারো সাহেব!" তার মুখে দাখানা, পা তুলে দিয়েছে গাছের গোড়ায়, বেগতিক দেখলেই বাঁদরের মতো চড়ে যাবে। আমি কী করব? সেই ছেলেবেলায় গাছে চড়তাম এখন সে বিদ্যা একেবারেই ভুলে গেছি, তার উপর পায়ে বুট! কাজেই ধীরে-ধীরে বন্দুকে গুলি ভরে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। গণ্ডার যদি নালা পার হয়ে এপারে আসতে চায় তবেই গুলি চালাব, নইলে চালাব না।

লুশাই খালি বলছে "মারো, মারো," কিন্তু তিনটি মাত্র গুলি সম্বল নিয়ে, গণ্ডার মারতে গিয়ে শেষে কি প্রাণটা হারাব?

যাই হোক, আমাকেও গুলি চালাতে হল না, লুশাইবুড়োকেও গাছে চড়তে হল না, গণ্ডারটা মিনিটখানেক পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থেকে, একটা হুঙ্কার দিয়ে, দৌড়ে পাহাড়ে উঠে গেল। তার সামনে যত বাঁশ পড়ল, সমস্ত প্যাঁকাটির মতো পটপট করে ভেঙে গেল।

তখন আমরাও আস্তে-আস্তে চলতে লাগলাম। আধ মাইলও যাইনি, আবার সামনে ভীষণ হুড়োমুড়ি! তারপর মড়মড় করে বাঁশ ভাঙার শব্দ। তারপর, উঃ, কি ভীষণ গর্জন! সারা বন থরথর করে কেঁপে উঠল। এবার একটু বেকায়দা, লুশাই বুড়োর আশে-পাশে গাছ নেই, কিসে চড়বে? শ্যামলাল হতভাগা ইতিমধ্যে এসে জুটেছে, টোটার

থলে থেকে আট-দশটা গুলিভরা টোটা নিয়ে ইতিপূর্বেই পকেটে পুরেছি।

পথ ছেড়ে দিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে বন্দুক হাতে দাঁড়ালাম। দাঁতওয়ালা হাতি, হয় পাগল (মস্ত্) তা না হয় অন্য কোনো জানোয়ার দেখেছে। লুশাই বলল, "বোধহয় সেই গণ্ডারটা ওর সামনে পড়েছে।"

হাতিটা কিন্তু আমাদের দিকে এল না, তিন-চারটে ডাক দিয়ে, ধীরে-ধীরে বাঁশ ভাঙতে-ভাঙতে পাহাড়ে উঠল। আমরাও চলতে লাগলাম।

আমরা পাকোয়া নদীর কিনারায় পৌঁছলাম। নদীটা সত্তর-আশি হাত চওড়া হবে, তাতে এক কোমর জল। নদীর ধারে হাতির পায়ের তাজা দাগ। একটার পিছনে একটা, তার পিছনে একটা, এমনি করে এক পাল হাতি গেছে। পায়ের দাগ দেখে আমি বললাম, "পাঁচ-সাতটা হাতি হবে।"

লুশাই বুড়ো ভালো করে দেখে বলল, "চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটার কম নয়। ঠিক দাগে-দাগে পা ফেলে গেছে বলে বোঝা যাচ্ছে না।"

সারাদিন জলে-জলে চলে আমার কাপড়-চোপড় সব ভিজে গিয়েছিল। আমি পাহাড়ে হেলান দিয়ে বসে জুতো-মোজা খুলতে আরম্ভ করলাম। লুশাইকে বললাম, "ওপারে গিয়ে তাঁবুর জায়গা দেখ।"

লুশাই ওপারে চলে গেল, শ্যামলালও বন্দুক তার সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। আমি বসে-বসে 'হুঁ-উ-উ' করে চিৎকার করে পিছনের লোকদের ডাকতে লাগলাম, খাবারওয়ালা খালাসী তাদের সঙ্গে, আমার বেজায় খিদে পেয়েছে।

বার দুই 'হুঁ-উ-উ' করে চেঁচিয়েছি, অমনি ঠিক আমার উপরের একটা পাহাড় থেকে একটা হাতি 'হুঁ-উ-উ' বলে ডেকে উঠল, আর আমার ওখান থেকে পঞ্চাশ-ষাট হাত দূরে আরও অনেক হাতি গুড়গুড় শব্দ করে তার জবাব দিতে লাগল। আমি আবার চেঁচালাম, হাতিগুলোও আবার

ঠিক তেমনি করল। আবার চেঁচালাম, আবার তাই হল। একটা হাতি পাহাড়ের উপর 'হুঁ-উ-উ' করে, আর বাকিগুলো নালার কিনারা থেকে গুড়গুড় শব্দ করে আর নাকে ফোঁসফোঁস আওয়াজ করে।

এমন সময় আমার মাথার উপর থেকে মড়মড় করে বাঁশ ভাঙবার আওয়াজ হতে লাগল আর নদীর ওপার থেকে শ্যামলাল আর লুশাইবুড়ো ব্যস্ত হয়ে আমাকে ডাকতে লাগল, "চলে এস, চলে এস।" তিন-চারটে হাতি আমার চিৎকার শুনে দেখতে আসছে এ কি রকম জানোয়ারের ডাক, আমার মাথা থেকে বোধহয় ১০০-১২৫ গজ উঁচু পর্যন্ত নেমে এসেছে।

আমি তাড়াতাড়ি নদীর ওপারে গিয়ে, শ্যামলালের হাত থেকে বন্দুক নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। শ্যামলাল আর লুশাইবুড়ো খুব হল্লা জুড়ে দিল, তাই শুনে হাতিগুলো আবার পাহাড়ের উপর উঠে গেল। তারপর অনেকক্ষণ নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম, হাতি আর দেখতে পেলাম না, তবে ক্রমাগতই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম আর নদীর জল ঘোলাটে হয়ে উঠছিল।

চারটে-সাড়ে-চারটের সময় অন্য লোকজন এসে পৌঁছল। নদীর ওপারে বন কেটে তাঁবু খাটানো হল, খুব বড়-বড় ধুনি আর পাহারার বন্দোবস্ত করা হল। আগেই বলেছি আমাদের সঙ্গে দুটো হাতি ছিল, মাহুতরা রোজ তাদের চরে খাবার জন্য বনে ছেড়ে দেয়, সেদিন কিন্তু তাঁবুর কাছে বেঁধে রাখল। ছেড়ে দিলে বুনো হাতিতে এ-দুটোকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে, নয়তো মেরে ফেলবে। লুশাইরা শুকনো বাঁশের মশাল তৈরি করে, লম্বা-লম্বা কাঁচা বাঁশের আগায় বেঁধে রাখল। রাত্রে হাতি এলে ঐ মশাল জেলে, তার লম্বা বাঁশের বাঁট ধরে ঘুরিয়ে হাতি তাড়াবে। এমনি করে লুশাইরা তাদের খেত থেকে হাতি তাড়ায়।

সে রাত্রে আর হাতির জ্বালায় ঘুম হয়নি। অন্ধকার হতেই হাতিগুলো

আমাদের কাছে এল, আর বোধহয় ধুনির আলোতে আমাদের হাতি দুটোকে দেখতে পেয়ে তাদের ভারি খটকা লাগল, ও-দুটো আবার ওখানে কী করছে! পাঁচ-সাতটা হাতি মিলে এপারে আসবার জন্য এক-একবার নদীতে নামে, তারা নদীর মাঝামাঝি আসতে-না-আসতেই আমাদের হাতি দুটো ছটফট আর চিৎকার করতে আরম্ভ করে। অমনি আমাদের লোকরাও প্রাণপণে মশাল ঘুরিয়ে বিকট চিৎকার করতে-করতে ছুটে আসে আর হাতিগুলো দৌড়ে আবার ও-পারের বনে ঢোকে। সারাটা রাত এইভাবে কাটল। ভোরবেলা কতকগুলো হাতি পুবের পাহাড়ে আর কতকগুলো পশ্চিমের পাহাড়ে উঠে গেল।

সকালে উঠে, চা খেয়ে, জিনিসপত্র বেঁধে আমরাও আবার পথ ধরলাম। সেই পুবের পাহাড়ে আমাদেরও যেতে হবে। রোজ যেমন যাই, আজও তেমনি চলেছি, আমার পিছনে যথাক্রমে শ্যামলাল, খাবারওয়ালা আর আমার চাকর গঙ্গারাম।

কিছুদূর গিয়েই একটা ঝিল পেলাম, তাতে জল নেই কিন্তু খুব কাদা। আমরা বলাবলি করতে লাগলাম কোন দিক দিয়ে, কেমন করে ঝিল পার হব, এমন সময় সেই ঝিলের মাঝখানের শরবনের আড়াল থেকে উঠে একটা হাতি বাঁশবন ভেঙে সে যা হুড়মুড় করে ছুট দিল! পাহাড়-পর্বত যেন সব একেবারে ভেঙে পড়ল।

যাই হোক এতে আমাদের এই উপকার হল যে কোন দিক দিয়ে যে ঝিল পার হতে হবে তা আর আমাদের বুঝতে বাকি রইল না। সেই হাতির পায়ের দাগ ধরে আমরাও ঝিল পার হয়ে গেলাম। তখন লুশাইবুড়ো জিগগেস করল, "কোনদিকে যাব?"

আমি বললাম, "যেদিকে হাতি গেছে সেই দিকে।"

হাতির পায়ের দাগ দেখে আর বাঁশ ভাঙা দেখে আমরাও সেইদিকে

চলতে লাগলাম। খানিক দূর পাহাড় চড়ে বন্দুকটা আবার শ্যামলালের হাতে দিলাম।

লুশাইবুড়ো আগে গিয়ে পাহাড়ের উপর পৌঁছল, পৌঁছেই ডেকে বলল, "মস্ত দেয়াল (হাতির রাস্তা), কোনদিকে যাব ?"

আমি বললাম, "পুবদিকে যাও, উপরের দিকে।"

সে উপরের দিকে পঞ্চাশ-ষাট হাত উঠেছে, আমিও ততক্ষণে এসে দেয়ালে পৌঁচেছি, শ্যামলাল আমার চার-পাঁচ হাত পিছনে, গঙ্গারাম আর অন্য খালাসীটি আরেকটু পিছনে।

দেয়াল ধরে উপরের দিকে হয়তো সবে আট-দশ হাত গিয়েছি, এমন সময় সামনে ভয়ঙ্কর একটা গোলমাল, বাঁশ ভাঙার হুড়মুড়, জানোয়ারের গর্জন আর লুশাইবুড়োর চিৎকার। আমি হাঁকলাম, "কেয়া হুয়া রে ?"

শ্যামলাল পিছন থেকে উত্তর দিল, "গেণ্ডা হোগা হুজুর।"

সামনের দিকে চেয়ে দেখি লুশাইবুড়ো উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে নামছে আর তার পিছনে প্রকাণ্ড এক হাতি শুঁড় তুলে কামানের গোলার মতো আসছে।

তাই দেখে আমি "বন্দুক লাও" বলে পিছনে হাত বাড়িয়েছি, কিন্তু বন্দুক আর আসে না, চেয়ে দেখি শ্যামলাল লম্বা দেবার ফিকির করছে! দুই লাফে তাকে ধরে, দুই থাপ্পড় দিয়ে বললাম, "ভাগ্‌তা কাঁহা ?" তারপর বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে উপরের দিকে ছুটলাম। বন্দুক হাতে মনে পড়ল তার এক নলে ছিটা আর একটা নলে মাত্র গুলি ভরা। ছুটছি আর টোটা বদলাবার চেষ্টা করছি। সহজে কি বদলানো যায় ? তাড়াতাড়িতে এক সেকেণ্ডের কাজ পাঁচ মিনিটেও হতে চায় না।

যাই হোক, কোনো রকমে ছিটা বদলে গুলি ভরলাম। তখনো দৌড়চ্ছি, তায় আবার উপরের দিকে, মাটির দিকে চোখ রেখে পাছে পড়ে যাই।

গুলি ভরে, সামনের দিকে চাইলাম। সর্বনাশ! লুশাইবুড়ো দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতের দাখানা ফেলে দিয়েছে, রাস্তার মাঝখানে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতিটা তার কাছ থেকে হাত ন-দশ মাত্র দুরে, এই ধরল বলে!

সেখানে রাস্তায় দুটো মোড় ছিল, আমার চোখের সামনেই হাতির কপালটা। আর কথা নেই, বন্দুক তুলে কপালে গুড়ুম করে ছেড়ে দিলাম। হাতি কিন্তু তাতে থামল না, এক পা আরও চলে এসেছে। এবার তার পাঁজর আমার সামনে। বন্দুক আমার তোলাই ছিল, গুড়ুম করে সেই পাঁজরে অন্য নলটি ছেড়ে দিলাম। এবাব ওষুধ ধরল। আওয়াজও করা আর হাতির যা চিৎকার! পাহাড়বন থরথর করে কাঁপতে লাগল। আর সঙ্গে-সঙ্গে হাতিটাও ঘুরে কয়েক পা ছুটে গিয়েই কুড়ুঙ্গের ভিতর হুড়মুড় করে পড়ল—আবার যা চিৎকার!

আমি দুই গুলি মেরেই, পথ ছেড়ে দিয়ে আরও দুটো গুলি ভরে নিয়েছি, আর হাতিটার পিছনে আরও একটা চালিয়েছি, কিন্তু সে গুলিটা বাঁশে আটকে গেল, হাতির গায়ে লাগল না।

বিপদ তো কেটে গেল, এখন চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। লুশাই বেচারা তখনো সেইখানেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। আমার কাছ থেকে মোটে ছ-ধাপ দুরে, আর হাতিটাকে যেখানে গুলি মেরেছিলাম, সে জায়গাটা লুশাইবুড়োর কাছ থেকে মোটে তিন ধাপ হবে। আমার তো মনে হচ্ছিল হাতির শুঁড়টা যেন ঠিক তার মাথার উপর ছিল। পিছনে চেয়ে দেখি কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে গঙ্গারাম, শ্যামলাল আর অন্য খালাসীটা ঠকঠক করে কাঁপছে আর খালি বলছে, "বাবা 'রে বাবা, ওরে বাবা!" তারা এগোয়ও না, পালায়ও না। গঙ্গারামের বেজায় দুর্দশা, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে খালি বলে, "বাবা রে বাবা, এত্তো বড়া কপাল!" হাতির কপালটাই শুধু তার চোখে পড়েছিল।

আমি লুশাই বুড়োর কাছে গেলাম, বেচারা প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছিল। আমি কাছে যাবামাত্র আমার পা জড়িয়ে ধরল, মুখে কথা নেই।

তখন পর্যন্ত হাতির চিৎকারে বন-জঙ্গল কাঁপছে, আর যেদিক দিয়ে সে গিয়েছিল সেদিকে খালি রক্ত আর রক্ত !

আমরা হাতির কাছ থেকে লুশাই বুড়োকে বাঁচাতে ব্যস্ত আছি, আর ততক্ষণে আমাদের অন্য লোকজন সকলে এসে হাজির হয়েছে। বন্দুকের আওয়াজ শুনে তারা খুব ফুর্তি করতে-করতে আসছে—আজ খুব হরিণের মাংস খাওয়া যাবে। এসেই সামনে পেয়েছে শ্যামলাল, গঙ্গারাম আর খালাসীকে, তাদের মুখে খুব ভালো করেই শুনেছে ব্যাপারখানা কী ! তখন আর কারো মুখে হাসি নেই।

একজন লুশাই দোভাষী ছিল, সে কজন লুশাই কুলিকে সঙ্গে নিয়ে দেখতে গেল হাতির কি হল। খালাসীরাও দু-চারজন তাদের সঙ্গে গেল।

একটু দূর গিয়েই তারা চ্যাঁচামেচি লাগিয়েছে। দোভাষী আর দুজন লুশাই ছুটে এসে বলল, "চল, হাতিটা যেন কুড়ুঙ্গের ভিতর পড়ে আছে, আজ হাতির মাংস খাওয়া যাক।"

আমি কিছুতেই রাজী হলাম না, বললাম, "বিপদ কেটে গেছে। লোকটার প্রাণ বেঁচেছে এই ঢের, আর হাতির মাংস খেয়ে কাজ নেই।"

তখন তারা আমার বন্দুকটা চাইল, তাও দিলাম না দেখে শুধু দা, কুড়ুল নিয়ে চলে গেল। তারা কুড়ুঙ্গের ভিতর কিছু দূর নেমে গেল, তারপর আবার চ্যাঁচামেচি, তারপরই আবার তারা ছুটে এসে হাজির।

"শিগগির এস, শিগগির এস—হাতির বাচ্চা !"

ছোট্ট একটা হাতির বাচ্চা, যে পথ দিয়ে হাতিটা কুড়ুঙ্গের মধ্যে নেমেছে, সেই পথ দিয়ে নামছে। ঐ হাতিটারই বাচ্চা, হাতিটা কুণকী

ছিল। বাচ্চাটার এক পায়ে চোট লেগেছে, বেচারী খোঁড়াচ্ছে। দোভাষী দৌড়ে গিয়ে তার শুঁড় ধরেছিল আর ব্যস্ত হয়ে অন্য সকলকেও এসে ধরবার জন্য ডাকছিল, কিন্তু কেউ আর ভরসা করে এগোলো না। বাচ্চা হলে কী হবে, হাজার হোক, হাতিরই তো বাচ্চা! সে ঢিপঢাপ করে দোভাষীকে ঢুঁ মারতে আরম্ভ করল আর ছোট-ছোট পা দিয়ে লাথি! দোভাষী তাই থতমতো খেয়ে ছুটে এসেছে আমাদের খবর দেবার জন্য।

ঐ বাচ্চার খাতিরেই তার মা লুশাইবুড়োকে মারবার জন্য তাড়া করেছিল। সন্তানের মায়া! বাচ্চাটা চলতে পারেনি বলে সে তাকে নিয়ে পালের সঙ্গে যেতে পারেনি, পিছনে পড়েছিল। তারপর বুড়ো গিয়ে হঠাৎ তার সামনে পড়াতে বোধহয় বেচারীর মনে হয়েছিল—ঐ যাঃ, বুঝি আমার বাচ্চাকে ধরে নিতে এসেছে!

লুশাই পাহাড়ে বাঘ মারবার এক মজার ফন্দি দেখেছিলাম। বনের ভিতর বাঘ ভাল্লুক চলবার পথ আছে, কোনপথ দিয়ে বাঘরা বেশি যাতায়াত করে লুশাইরা আগে সেই খোঁজ নেয়। তারপর সেইপথের ধারে, যেখানে পাহাড়ের গা খুব ঢালু, সেখানে কোদাল দিয়ে খুঁড়ে আরো বেশি খাড়া আর গভীর গর্ত করে রাখে।

তারপর লম্বা-লম্বা বাঁশের খোঁটা পুতে, ঐ গর্তের উপর, রাস্তার বরাবর সমান করে বড় মাচা বাঁধে। তার উপর মাটি ফেলে, ঘাস, লতাপাতা বসিয়ে ঠিক পাহাড়ের গায়ে অন্য জমির সঙ্গে বেমালুম মিলিয়ে দেয়। মাচার নিচে অবশ্য ফাঁক থাকে, আর তার নিচে মাটিতে এই বড়-বড় ভীষণ ধারাল বল্লম পোঁতা থাকে। সমস্তটাকে ডালপালা দিয়ে ঢেকে এমন সুন্দর করে রাখে যে হঠাৎ দেখে বোঝবার যো নেই যে এর ভিতর আবার এত কারসাজি আছে। তারপর মাচার উপর বেশ মোটাসোটা

শূয়োরছানা বা কুকুর এমন ভাবে বেঁধে রাখা হয় যে মাচার উপর না-চড়ে তাকে ধরবার উপায় নেই।

বাঘমশায় হেলতে-দুলতে পথ দিয়ে আসেন, আর দেখতে পান সামনেই ফলার প্রস্তুত! ব্যস, অমনি হালুম বলে দে লাফ, আর হুড়মুড় করে মাচা ভেঙে একেবারে বল্লমের উপর পড়া! ফলার রইল মাথায় আর বল্লম বিঁধল পেটে, আর চ্যাচানির চোটে আকাশ গেল ফেটে! তারপর যতই হাত-পা ছোঁড়ে, আরও বল্লম গায়ে বিঁধতে থাকে, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সব শেষ!

একে তো বিশ্রী রাস্তা, দেয়ালের মতো খাড়া পাহাড়, তাতে আবার বৃষ্টি পড়েছে, গোদের উপর যেন বিষ ফোঁড়! আমি কাজে চলে গেছি, লোকদের বুঝিয়ে বলেছি একটা নদীতে পৌঁছে তাঁবু লাগাবে। তিনটের সময় কাজ শেষ করে ফিরছি। ভীষণ জঙ্গল, মানুষের সমাগম নেই, খালি দলে-দলে হাতি ফেরে। সেইজন্য একটু লম্বালম্বা পা ফেলে চলছি, পাছে রাত হয়ে যায়।

লোকদের যেখানে ক্যাম্প করতে বলেছিলাম, তার দু-আড়াই মাইল আগেই তাঁবু পেলাম। আমাদের একটা হাতি পিছলে পড়ে চোট খেয়েছে, তাকে নিয়ে আর তারা বেশি দূর এগোতে পারেনি। কাজেই আর কি করা যায়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখন ইচ্ছা না হলেও সেখানেই থাকতে হবে। তাঁবুটা একটা ছোট নদীর ধারে রাস্তা থেকে কুড়ি-পঁচিশ হাত দূর। নদীর উপর একটা বাঁশের সাঁকো আছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে সকলে শুয়েছি। এপ্রিল মাস, বেজায় গরম বলে তাঁবুর দরজা আর বন্ধ করিনি। দুজন খালাসী—ডম্বর আর শোধন—নদীর ধারে বালির উপরে রান্না করে, খেয়ে, সেখানেই শুয়ে আছে।



প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমারও একটু-একটু তন্দ্রা আসছে, এমন সময় শুনলাম গঙ্গারাম দোভাষীকে বলছে, "দোভাষী ভাই, ওটা কী, ঐ যে পোলের উপর দিয়ে আসছে ?"

আমি কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম, বাঁশের পোলের উপর দিয়ে একটা বেশ বড় আর ভারি জানোয়ার আসছে, পোলটা তার ভারে ক্যাঁচ-ম্যাচ করছে। পাশেই বন্দুক আর টোটা ছিল, হাতে নিয়ে চুপি-চুপি তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম। পোলটার মাঝামাঝি এক জায়গায় গাছের ফাঁক দিয়ে একটু চাঁদের আলো পড়েছিল। সেই জায়গাটুকুতে জানোয়ারটা

আসবামাত্র দেখলাম—প্রকাণ্ড বাঘ! তখুনি আবার সেটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। তখন আমি বন্দুকে ছিটা ভরে গুড়ুম-গুড়ুম দুটো আওয়াজ করলাম, আর বাঘটা দুই লাফে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। গুলি মারবার সাহস হল না, কারণ অন্ধকারে ঠিক জায়গায় না লাগবারই কথা, অনর্থক তাকে জখম করে বিপদ ডেকে আনা কেন?

বন্দুকের আওয়াজে সকলেরই ঘুম ভেঙে গেছে। শোধন তো উঠেই একদৌড়ে তাঁবুর মধ্যে। ডম্বর কিন্তু কিছুতেই এল না। হাতির মাহুত ডেকে বলল, "ভাগ্, ডম্বরা, ভাগ্, শের·আয়া!' ডম্বরের ভ্রূক্ষেপ নেই। তখন দু-তিনজন ছুটে গিয়ে তাকে ঠেলতে লাগল। সে জেগেই ছিল, ঠেলা খেয়ে চটে লাল!

"কি‌ঁউ দিক করতা? শের আয়া তো কেয়া হুয়া? খায়গা তো হামকো খায়গা, তুম লোগকা কেয়া হ্যায়? হাম নেহি যায়েঙ্গে।"

সত্যি-সত্যি সমস্ত রাত সে ঐ বালির উপর কাটাল, পোলটা তার কাছ থেকে মাত্র পনরো-ষোলো হাত দূরে ছিল।

ডম্বরের সত্যিই খুব সাহস ছিল। একদিন তো চলেছি, সঙ্গে লুশাইবুড়ো আর শ্যামলাল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তখনো হাতি আর অন্য লোকজনদের দেখা নেই। মেজাজটাও তাই একটু বিগড়ে ছিল। একটা মস্ত সম্বর হরিণকে গুলি করেছিলাম, সেটাও দু-তিনবার ডিগবাজি খেয়ে উঠে পালিয়ে গেল, চারদিকে খালি রক্ত আর রক্ত! বেজায় ঘন বেতবন, তার মধ্যে দৌড়ানো যায় না, হরিণটা প্রাণের দায়ে বেতবন অগ্রাহ্য করে তার কাঁটা সব ছিঁড়ে-ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। পাকোয়া নদীতে জলের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম সে সাঁতরে পার হচ্ছে। আমরা যখন জলের কিনারায় পৌঁছলাম, অন্য পারে হরিণের পিছনটা শুধু এক মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম। তাও আবার বন্দুক তুলতে-না-তুলতে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

প্রায় তিনটে বাজে, ঐখানেই বসে রইলাম। লুশাইবুড়ো ক্রমাগত বলছিল নদী পার হতে পারলে হরিণটাকে পাওয়া যেত। কিন্তু নদী পার হবার উপায় নেই, অনেক জল। নিরাশ হয়ে ফিরে এসে, যেখানে প্রথমে হরিণটাকে দেখেছিলাম সেখানে বসে পড়লাম, হাতি-টাতি এলে এখানেই তাঁবু ফেলব।

চার-পাঁচজন কুলি এসে পৌঁছল।

"হাতি আর অন্য লোকরা কত দূরে?"

"বহুৎ দূর!"

আমাদের তো চক্ষুস্থির! এ যে সন্ধ্যা হয়ে এল। তখন হাতির গলার ঘণ্টা শুনতে পেলাম। অন্ধকার হল, তিন-চারজন খালাসী আমার বিছানা নিয়ে এসে হাজির হল।

"আর হাতি?"

"হুজুর, চোখে দেখা যায় না, হাতি আর বেতের মধ্যে চলতে পারছে না।"

ডাকলাম, হাতির মাহুত বললে, "হুজুর, চলনে নহি শক্তা।"

নিরুপায় হয়ে যে যেখানে ছিল সেইখানেই শুয়ে রইল, কারো খাওয়া-দাওয়া নেই, আগুন জ্বেলে সব রাত কাটাল। অথচ খোরাক কাছেই মজুত আছে, কিন্তু আসবে কী করে?

ভোর না হতেই হাতি আর বাকি লোকজন এসে উপস্থিত হল। দেখা গেল সবাই এসেছে, খালি ডম্বর নেই। টিণ্ডেলকে তাড়া করলাম, "হতভাগা, তোর লোক গেল কোথায়?"

সে বললে, "হুজুর, আমার খেয়াল ছিল বুঝি বা আগে-আগে আপনার সঙ্গে চলে এসেছে।"

বড়ই ভাবনা হল। তৎক্ষণাৎ দুজন খালাসী, দুজন লুশাই কুলি আর

টিণ্ডেলকে ফিরিয়ে পাঠালাম। বললাম যেন আগের দিনের আড্ডা পর্যন্ত দেখে আসে, আমরা তো মাত্র তিন-চার মাইল পথ এসেছি ।

লোকজন, হাতি, কারো খাওয়া হয়নি, সবাই ক্লান্ত। আমরা মাইল দুই চলে তাঁবু ফেলবার যোগাড় করতে লাগলাম । বন পরিষ্কার করে, তাঁবু ধরে টানাটানি করছে, এমন সময় টিণ্ডেল আর তার সঙ্গের লোকরা ডম্বরকে নিয়ে এসে হাজির হল ।

"আরে হতভাগা ! কোথায় ছিলি ?"

সে বললে সে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, মাথাও ব্যথা করছিল, তাই পথের ধারে বসে একটু দম নিচ্ছিল, কিন্তু ঘুম এসে গেল। যখন ঘুম ভাঙল তখন একেবারে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কী আর করা, পথ থেকে সরে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে শুয়েছিল, সকালে উঠে নিজেই চলে আসছিল, পথে টিণ্ডেলের সঙ্গে দেখা ।

সকলে জিগগেস করল, "হতভাগা, ভয় করল না ?"

"আরে ভাই, শো গয়া বিলকুল, ক্যায়সে ডর লাগেগা ?"

যাক, ঐ জঙ্গলে ভীষণ সব জানোয়ার, ভগবান ওকে রক্ষা করেছেন।

● ১১ ● (১৯০৮—১৯০৯ ত্রিপুরা রাজ্য। লুশাই হিল্‌স্) পরের বছর আবার ত্রিপুরা রাজ্যে ফিরে গেলাম, সঙ্গে আট-দশজন সার্ভেয়ার, জরীপের কাজ করতে হবে।

আগের বছর বহু চেষ্টা করেও লংতরাই যাবার বন্দোবস্ত করে উঠতে পারিনি। এবার আমার একজন সার্ভেয়ার লংতরাই গিয়েছিল। সঙ্গে খালি কয়েকজন হাজারীবাগের খালাসী নিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল।

ও-দেশের কোনো লোকই যেতে রাজী হয়নি। এদের কিন্তু কোনো অনিষ্ট হয়নি। তারা একটা ফুকীগ্রামে তাঁবু ফেলেছিল, লংতরাই সে-গ্রামের পশ্চিমে। সার্ভেয়ারটি মুসলমান, সন্ধ্যাবেলা পশ্চিমমুখী হয়ে নমাজ পড়ছে। ফুকীরা অবাক হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখল, তারপর বলল, "দেখেছ? এরাও লংতরাই মানে। দেখছ না ঐ বাবুও তার পুজো করছে।"

ত্রিপুরার মহারাজার রাজ্যে ভারি-ভারি সব বন আছে। কোন অতীতকালে এসব জায়গায় মানুষের বসতি ছিল। বনের ভিতর বড়-বড় পুকুর পাওয়া যায়, উত্তর দক্ষিণে লম্বা, মনে হয় হিন্দুর পুকুর। কোনো-কোনো জায়গায় খেতে জল নিয়ে যাবার খাল আছে, তাকে নহর বলে। কিন্তু তাতে জল নেই, সে সব খেতও এখন নেই। এখন শুধু দশ-বারো ফুট উঁচু শরবন, আর নল, আর বেত, আর ঘোর জঙ্গল। কতকাল হল এসব গ্রাম লোপ পেয়েছে তার ঠিকানা নেই, ও-দেশের লোকরাও বোধহয় সঠিক বলতে পারে না। আজকাল আবার একটু-একটু আবাদ আরম্ভ হয়েছে, দু-চার-ছয় ঘর লোক মিলে জায়গায়-জায়গায় নতুন গ্রামের পত্তন করেছে।

এদের বড় কষ্ট। বর্ষাকালে সব জ্বরে মরে তার উপর হাতি শূয়োর এসে ধান খেয়ে যায়। তৈরি ফসল, দিনের বেলা তারা ধান কাটে, আবার রাত জেগে পাহারা দেয়, নইলে হরিণ আর শূয়োর সব খেয়ে যাবে, কিছু রাখবে না।

এদের মধ্যে একজন মুসলমান আমাকে অনেক আদর-যত্ন করে বলল, "হুজুর, দু-একটা শূয়োর মারতে পারলে বড় উপকার হয়।"

তার কথায় আমি শূয়োর মারবার জন্য অনেক রাত পর্যন্ত ধানখেতে বন্দুক হাতে বসে রইলাম, কিন্তু সেদিন আর শূয়োর এল না। লাভের

মধ্যে আমি সেখানকার বিষম হিমে একেবারে ভিজে গেলাম। তখন আমি বিরক্ত হয়ে তাঁবুতে এসে সবে একটু ঘুমিয়েছি, অমনি একজন লোক "হুজুর, হুজুর" বলে ছুটে এল। "চল্লিশ-পঞ্চাশটা শূয়োর এসে খেতে নেমেছে, আসুন।" কিন্তু আর কে যায়?

একদিন ও দেশের কয়েকজন ভদ্রলোক মিলে আমাকে শিকারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। হাতিতে চড়ে পাঁচ-ছয় মাইল যেতে হবে। সঙ্গে লোকজন বিস্তর চলেছে, তাদের ঘাড়ে এই বড়-বড় জাল। সেই জাল দিয়ে বনের একটা দিক ঘেরা হবে। দুটি-দুটি জালের মাঝখানে পনরো-কুড়ি ফুট করে ফাঁকা থাকবে, আর সেই সব ফাঁকের মধ্যে বন্দুক হাতে শিকারীরা দাঁড়াবে। বনের এক পাশে রাস্তা আর মাঠ, অন্য পাশে নদী; এক মাথায় তো শিকারী আর জালই রয়েছে, অন্য মাথায় গিয়ে সঙ্গের লোকজনরা সারি বেঁধে, শোরগোল করে ঢাকঢোল পিটিয়ে, কেরাসিনের টিন বাজিয়ে জঙ্গল ভেঙে আসতে থাকবে। বনের ভিতর জানোয়ার যত সব আছে, তারা তখন বেগতিক বুঝে ঐ সব জালের ফাঁক দিয়ে পালাবার জন্য ছুটে আসে। সেই সময় শিকারীরা তাদের মেরে থাকে।

আমরা চার-পাঁচজন বন্দুকওয়ালা, আর একজন বুড়ো শিকারী—অনেক বাঘ শিকারের পাণ্ডা সে। কে কোথায় দাঁড়াবে, সে-ই সব ঠিক করে দিল।

আমরা দাঁড়িয়েছি, দু-চারজনকে আমাদের আশে-পাশে গাছে চড়িয়ে দিয়ে বাকি লোকজন সব অন্যদিকে চলে গিয়েছে। যারা গাছে চড়েছে তাদের উপর কড়া হুকুম কোন দিক দিয়ে জানোয়ার পালায় তার খেয়াল রাখবে। বুড়ো শিকারী বলতে লাগল, "বড় শিয়াল—মানে বাঘ—বেরোবার খুবই সম্ভাবনা। এই জঙ্গলটুকুকে বাঘের আড্ডা বললেই চলে।"

শুনেই তো বন্দুকধারীরা গাছে চড়বার পথ দেখতে লাগলেন, দুজন

তো বাঁদরের মতো উঠেই গেলেন, আর দুজন সুবিধা না পেয়ে একটু-একটু খোলা জায়গায় গিয়ে একসঙ্গে দাঁড়ালেন।

আমি মাটিতেই বসে রইলাম, মোটা মানুষ, গাছে ওঠা চলবে না। একটু পরে বুড়ো এসে আমাকে মাটিতে দেখে কী যেন চিন্তা করল, তারপর জিগগেস করল, "কর্তা বুঝি গাছে উঠবেন না?"

আমি বললাম, "না।"

তাই শুনে সে বললে, "তবে আমি কর্তার কাছেই দাঁড়াব।"

যে জায়গায় বসেছিলাম, বুড়োর সে জায়গা পছন্দ হল না, সে আমাকে একটা বাঁশঝাড়ের পিছনে দাঁড় করিয়ে দিল।

বুড়ো বলল, "যদি হরিণ আসে সামনে থাকতেই মারবেন, কিন্তু যদি বড় শেয়াল বেরোয় তাহলে আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেলে তবে মারবেন, পাঁজরার দিকে।"

দুজনে বসে আছি। ঢাক, ঢোল আর টিনের একটু-একটু আওয়াজ কানে আসছে, বনের ভিতর জানোয়ার নড়বার-চড়বার আওয়াজও একটু-একটু শুনতে পাচ্ছি। শুনেই তো আমি একেবারে বন্দুক তুলে তৈরি। রাম! রাম! বেরোল কিনা একটা শেয়াল! আমার এমন রাগ হল।

এতক্ষণে লোকজনের চিৎকারও একটু-একটু শুনতে পাচ্ছিলাম। আবার বনের ভিতরে জানোয়ার নড়বার শব্দ, শুকনো পাতার উপর পায়ের আওয়াজ। এবার আওয়াজ হচ্ছিল সেই যে দুজন ভদ্রলোক এক জায়গায় দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের সামনে। একটু আওয়াজ হয়েই তখুনি আবার চুপচাপ হয়ে গেল।

বুড়ো আমাকে হুঁশিয়ার করে দিল জানোয়ার যাই হোক, ওদিক থেকে আমাদের দিকে আসছে। এতক্ষণে লোকজনের গোলমালও বেশ কাছেই এসেছে। ঐ! আবার জানোয়ারের গড়র-গড়র শব্দ। একবার শব্দ

হওয়া মাত্র আমি বন্দুকের দুই ঘোড়া তুলে রেডি! পরক্ষণেই হুড়মুড় করে সব ভেঙে-চুরে পাঁচটা হাতি বেরিয়ে এল, পোষা হাতি!

আমরা প্রাণপণে হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে, বাঁশ দিয়ে ঠেঙিয়ে হাতি-গুলোকে ফেরাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু হতভাগারা কি তা গ্রাহ্য করে? একে তো হাতি, তায় আবার পোষা। হাঁউ-মাউ-কাঁউ তারা ঢের শুনেছে, ঠেঙাকে তারা হিসেবেই আনে না। জাল-টাল সমস্ত ছিঁড়ে তারা বেরিয়ে গেল। ও-দেশে হাতিগুলোকে বনে ছেড়ে দেয়, তারা ইচ্ছামতো চরে খায়। একদিন পর, কখনো বা দুদিন পর মাহুতরা এসে দেখে যায়, নুন খাইয়ে যায়।

সেদিন আর যে আমাদের শিকার জুটল না তা বলবার আগেই নিশ্চয় সবাই বুঝে নিয়েছ।

এই হাতি বেরোবার আগে অন্য এক টুকরো জঙ্গল ঘেরা হয়েছিল। সেখানেও আমরা বন্দুকধারী সব জালের ফাঁকে-ফাঁকে দাঁড়িয়েছিলাম, কেউ একটা গাছ, কেউ বা একটা ঝোপ মাত্র আশ্রয় করে। ক্রমে ঢাক ঢোলের আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। আমি আগে কখনো এই রকম শিকার করিনি, সেইজন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে রয়েছি, না জানি কখন কী বেরোয়!

যেন একটা খড়খড় শব্দ কানে পৌঁছল, বন্দুক তুলে খুব নিবিষ্ট মনে জঙ্গল পরীক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। হঠাৎ ভর্‌র্ শব্দ করে তিন-চারটে বনমোরগ আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। আবার সব নিস্তব্ধ, খালি ঢাক ঢোলের আওয়াজ। আবার ভর্‌র্ শব্দ করে এক জোড়া মধুরা (কালো ফেজেণ্ট) উড়ল, হাতে লম্বা লাঠি থাকলে মারতে পারতাম। অন্য শিকারীদের মাথার উপর দিয়েও এমনি মোরগ, মধুরা উড়ে গেছে। আর আমরা সবাই বড় শিকারের আশায় বসে আছি।



এতক্ষণে লোকজনদের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ শুকনো পাতার উপর জানোয়ার চলবার শব্দ হল, তারপরই সড়াৎ করে আট-দশ ফুট সামনে ঝোপের মধ্যে একটা জানোয়ার লাফিয়ে পড়ল। আমার তো মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। না জানি কী বেরোল! তারপরেই তাকিয়ে দেখি একটা শেয়াল! আমাকে দেখেই আবার সে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল।

দু-তিন মিনিট পরে মনে হল একটা ছোট ঝোপ একটু নড়ে উঠল, আবার দু-তিন মিনিট সাড়া-শব্দ নেই। তারপর ধীরে-ধীরে লতাপাতা ফাঁক করে দুটো হরিণ বেরোল। একটা এক গুলিতেই শুয়ে পড়ল, অন্যটা বন্দুক ঘুরোবার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঐ একটিমাত্র হরিণ ছাড়া সেদিন আর অন্য শিকার জুটল না। শিকারীরা, জঙ্গল-ভাঙনেওয়ালারা বড়ই দুঃখিত, এখানে নাকি সর্বদা বড়-বড় শিকার মেলে!

● ১২ ● (১৯০৯-১৯১০) এবারও আমি ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট আর কাছাড়ে কাজ করতে গিয়েছিলাম। এই দু বছরে একটা বিষয়ে খুব অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সে হল জোঁকের। জোঁক যদি দেখতে চাও, তাহলে কাছাড়ের বনে একবারটি যাও। অনেক দেশে, অনেক জায়গায় ঘুরেছি, এমন জোঁক আর কোথাও দেখিনি। সে জোঁকই বা কত রকমের, কত রঙ-বেরঙের! ছোট, বড়, মাঝারি। এক-একটা দু-ইঞ্চি আড়াই-ইঞ্চি লম্বাও আছে, সে যখন রক্ত খেয়ে পটলের মতো মোটা হয়, তখন তাকে দেখলে ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। কত রঙেরই বা জোঁকগুলো—মেটে, কটা, কালো, ফ্যাকাশে, সবুজ, ছাই। এক-একটার গায়ে আবার ডোরা-ডোরা, জলের ভিতর চোখে পড়লে হঠাৎ মনে হয় যেন প্রকাণ্ড শুঁয়ো পোকা!

দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়লে তো জোঁকের জ্বালায় ঘাসের উপর বা জঙ্গলের ভিতর চলবার যো নেই! আধ মাইল পার হতে না হতেই দুটি পা একেবারে জোঁকে বোঝাই হয়ে যায়, পনরো-কুড়িটা করে এক সঙ্গে এসে ধরে! যাদের খালি পা, তাদের অনেক সময়ই দা দিয়ে চেঁছে জোঁক ছাড়াতে হয়। এতেও যদি অব্যাহতি পাওয়া যেত তাহলে আর দুঃখ ছিল না। অনেক জায়গায় নিচে তো জোঁক রয়েছেই, তার উপর আবার গাছ থেকেও টুপটাপ করে মাথায় পড়ে।

সার্ভেয়ার খালাসী পাঠিয়েছে ডাক আনবার জন্য। চিঠিপত্র আনবে আর সেই সঙ্গে চাল-ডালও কিছু কিনে আনবে। ইতিমধ্যে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ফিরবার সময় খালাসীরা একটা জলার উপর দিয়ে পোল পার হয়ে আসছিল। দুখানা আড়াআড়ি বাঁশ, তার উপর লম্বালম্বি তিনখানা বাঁশ পাতা, এই হল পোল এবং এরই উপর দিয়ে পার হচ্ছে। এমন সময় নিচের দিকে চেয়ে দেখে মাছ! কই মাছ আর ল্যাটা মাছ! ইঞ্চি তিনেক বৃষ্টির জল জমেছে তারই মধ্যে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

সে মাছের লোভ কি আর সামলানো যায় ? খালাসী মাছ ধরবার জন্য লাফিয়ে জলে নামল। আর সে যাবে কোথায় ! বেচারা আর উঠবার পথ পায় না এমনি জোঁকে ধরেছে তাকে ! অনেক কষ্টে উপরে উঠে পা দুখানির দিকে চেয়ে তার চোখ দুটো কপালে উঠে গেল ! পা দুটো যেন জোঁক দিয়েই তৈরি। ভাগ্যিস আরেকজন লোক সঙ্গে ছিল, সে দা দিয়ে চেঁছে জোঁক ছাড়াল, নইলে সেদিন মাছ খাওয়া ভালো করেই হয়েছিল আর কি !

আমার তো বাঘ-ভাল্লুকের অত ভয় করে না, জোঁককে যত করে। ভয় করবে না ? এদের হাত এড়াবার জন্য কত ফন্দীই না করি, কিন্তু এড়াবার যো আছে ? কখন যে ধরে তাও বোঝবার উপায় নেই, বোঝবার আগেই সে যত খুশি রক্ত খেয়ে পেট ঢাক করে বসে আছে ! মোজা, তার উপর বুট, তার উপর একেবারে পায়ের কব্জি অবধি ইজের, তার উপর কব্জি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পট্টি জড়ানো, তবু তাকে ফাঁকি দেবার যো নেই। এতগুলো জিনিসের ভিতর দিয়েও বেমালুম ঢুকে যায় ! এমন জানোয়ারকে ভয় করব না তো কাকে করব ?

গ্রাম থেকে দেড়-দুদিনের পথ দূরে, ঘোর বনে সফদর-হুসেন সার্ভেয়ার কাজ করে, তার সঙ্গে ন-দশজন লোক। খালাসী বেচারীরা বনে থাকে, নুন লঙ্কা ভাত ছাড়া বড় একটা জোটে না। তাও দুদিনের পথ থেকে পনরোদিনের মতো এক সঙ্গে সব এনে রাখতে হয়। মাঝে-মাঝে নুনও ফুরিয়ে যায়, তখন শুধু ভাত খায়।

আজ বড় ভারি শিকার জুটেছে। কাজ শেষ করে সার্ভেয়ার তাঁবুতে ফিরে আসছে, আর চোখের সামনেই শিকার, প্রকাণ্ড হরিণ ! সেটাকে মারতে পর্যন্ত হবে না, ইতিপূর্বেই বাঘ সেটাকে মেরে নিয়ে খেতে বসেছে।

অনেকক্ষণ আগে যে মেরেছে তাও না, বড় জোর ঘণ্টা দেড়েক হবে।

সকলে মিলে চিৎকার করে বাঘটাকে তাড়াল। তারপর তারা মহা আনন্দে হরিণটাকে বয়ে নিয়ে চলল। বাঘ সামান্যই খেয়েছিল, সেদিকের খানিকটা মাংস কেটে ফেলে দেওয়া হল। কিন্তু অত বড় হরিণ কি সহজে বয়ে নেওয়া যায়? তায় আবার অনেকখানি পাহাড় চড়তে হবে, এদিকে সারাদিন খেটে সকলেই কাহিল হয়ে পড়েছে।

তখন তারা বুদ্ধি খাটিয়ে উপস্থিত কাজ চালাবার মতো শুধু একটা রাঙ কেটে নিল, বাকি হরিণটা একটা গাছের উপর, মাটি থেকে দশ-বারো ফুট উঁচুতে, দুটো ডালের মাঝখানে টাঙিয়ে রেখে গেল।

সে রাত্রে তাদের আহারটি বেশ ভালো রকমই হয়েছিল, পরদিন সকালেও ঐ মাংসতেই চলেছিল। সকালে কাজে যাবার সময়ে সার্ভেয়ার বলল, "দুদিনের চাল বেঁধে নিয়ে চল, কাজ করতে-করতে অনেক দূর যেতে হবে, ফিরবার সুবিধা হবে না।"

খালাসীদের মহা ফুর্তি! তারা শুধু চাল আর নুন লঙ্কা সঙ্গে নিল, মাংস তো পথেই টাঙানো আছে, তাই দিয়ে বেশ জমকালো রকমের ভোজ হবে।

জিনিসপত্র ঘাড়ে করে হাসতে-হাসতে তারা গাছতলায় এল। কিন্তু হায়, হায়! মাংস তো নেই, একটুও নেই! আছে শুধু গাছের গায়ে বাঘের নখের আঁচড়! বাঘের মতো জন্তু, সে নিজের হাতের শিকার অত সহজে ছেড়ে দেবে, তা কখনো হতে পারে? নিশ্চয় চুপি-চুপি তাদের পিছন-পিছন এসে সব দেখেছিল। তারপর সুবিধা বুঝে, লাফ দিয়ে, থাবা মেরে হরিণ নামিয়ে নিয়ে গেছে। মাটিতে যে রক্ত পড়েছিল, তাও চেটে-চেটে খেয়ে যেতে ভোলেনি। এদিকে এ বেচারাদের যে কষ্ট সেই কষ্ট! আবার সেই নুন লঙ্কা দিয়ে ভাত খেতে হল।

আরেকবার দুজন সার্ভেয়ার কাছাড়ের বনে কাজ করতে গিয়েছিল। একই নালার ধারে তিন-চার মাইল উপরে নিচে তাদের ডেরা। ঘোর জঙ্গল, বুনো হাতির রাস্তা ছাড়া পথ নেই। চোদ্দ-পনরো মাইল থেকে চাল-ডাল ইত্যাদি এনে খেতে হয়। প্রত্যেকের সঙ্গে দশ-বারোজন করে হাজারীবাগের খালাসী ছিল। কাজকর্মও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, চার-পাঁচদিনের বেশি কাজ বাকি নেই। তারপর তারা অন্য জায়গায় যাবে।

গোপাল সিং আর অমর সিং দুজনেই রাজপুত। গোপাল সিং দিনের কাজ শেষ করে তাঁবুতে এসে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসেছে। তার চাকরটাও তার সামনে বসে খাচ্ছে, মাঝখানে হাত দু-তিন জায়গা। দু-গ্রাস ভাতও মুখে দেয়নি, আর অমনি 'হাল্লুম' বলে এই বড় বাঘ দুজনের মাঝখানে লাফিয়ে পড়েছে! বাঘ দেখেই তো তারা বন্দুকের গুলির মতো দুদিকে ছিটকিয়ে পড়ল, তারপর বাপ রে বাপ, খাওয়া-দাওয়া কোথায় গেল, জিনিসপত্র ফেলে দে পিট্টান!

হাতির রাস্তা ধরে তারা প্রাণপণে ছুটতে লাগল। দু-তিন মাইল চলে দেখতে পেল অমর সিং তার কাজ শেষ করে তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছে। অমর সিং ওদের দেখে মনে করল বুঝি কাজ শেষ হয়ে গেছে। তারপর যখন শুনল যে তারা বাঘের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন অমর সিং গোপাল সিংকে বুঝিয়ে বলল, "দেখ, কাজ থেকে পালিয়ে গেলে বড় বদনাম হবে। জঙ্গলের কাজ, জানোয়ার তো হামেশাই পাওয়া যায়। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে, চল, কাল থেকে আমরা দুজনে মিলে তোমার কাজ করি। দু-তিনদিনেই শেষ হয়ে যাবে, তখন এক সঙ্গে চলে যাব। আমাদের দুজনের ডেরা এক জায়গায় থাকলে আমরা কুড়ি-বাইশজন লোক হব, তাহলে আর কোনো জানোয়ার আসবে না।"

এই প্রস্তাবে গোপাল সিং রাজী হয়ে, অমর সিং-এর সঙ্গে তার তাঁবুতে

গেল। সেখানেও ভাত তৈরি, দুই দলে মিলে তাই ভাগ করে খেতে বসল। একজন খালাসীর খাওয়া শেষ হয়েছে, সে বেচারা ডেরার পাশে নালার জলে থালাখানা ধুতে গেছে। অমনি বাঘ এসে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে! কারো মনে হয়নি যে সে ব্যাটা এই তিন-চার মাইল পথ চলে তাদের পিছন-পিছন এখানে এসে হাজির হবে। বাঘে ধরবামাত্র লোকটা চেঁচিয়ে উঠল আর সঙ্গে-সঙ্গে অপর সকলেও এমনি চিৎকার জুড়ে দিল যে আর কী বলব!

অমর সিং-এর টিণ্ডেল অর্থাৎ সর্দার খালাসী নান্দা ছিল বড় বাহাদুর লোক। এর আগেও ব্রহ্মদেশে দু-একবার বাঘের সঙ্গে তার হাতাহাতি হয়েছে। সে তখনই ধুনি থেকে একটা জ্বলন্ত বাঁশ তুলে নিয়ে, ছুটে গিয়ে, ধাঁই করে বাঘের মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিল। তার ফলে বাঘও সেই লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ নান্দাকে ধরে বসল।

নান্দা কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। তার বাঁ হাতটা বাঘের মুখে রইল আর ডান হাতের সেই বাঁশ দিয়ে সে বাঘের নাকমুখ বেশ করে থেঁতলিয়ে দিতে লাগল। বাঘ তখন বেগতিক বুঝে নান্দাকে ছেড়ে দিয়ে নদীর ওপারে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তাই দেখে নান্দাও সেই লোকটাকে তুলে উপরে নিয়ে এল।

বাঘ কিন্তু সেখান থেকে যায়নি, এপারে বসে রাগে গরগর করছে। সকলে ভয়ে তাঁবুর ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিল, আর প্রাণপণে তাঁবুর দরজার সামনের ধুনিটা উস্কে দিতে লাগল। কিন্তু বাঘ কি তাতে ভয় পায়? তার মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সে অত সহজে ছাড়বে কেন? নালা ডিঙিয়ে এসে তাঁবুর চারদিকে ঘুরতে লাগল। এক-একবার ভীষণ রাগে তাঁবুতে থাবা মারতে লাগল, আর সে কি ভীষণ গর্জন!

এদিকে তাঁবুর ভিতরে সকলে প্রাণপণ চ্যাচাচ্ছে আর থালা, ঘটি,



বাটি, কেরাসিনের টিন, যা কিছু ছিল তাই নিয়ে খুব করে পিটছে। এমনি করে অনেক রাতও হল আর বাঘও যেন চুপ করে গেল। এদিকে ধুনিটাও একটু নিবু-নিবু হয়ে এল। বাঘের সাড়া-শব্দ নেই, হয়তো চলে গিয়ে থাকবে, এই মনে করে একজন খালাসী সাহসে বুক বেঁধে, ধুনিটাকে উস্কিয়ে দেবার জন্য বাইরে এল।

আর যাবে কোথায়? হতভাগা বাঘ ধুনির পিছনেই লুকিয়ে বসেছিল, লাফিয়ে এসে তার ঘাড়ে পড়ল!

এখন এ বেচারাকে কে ছাড়াবে? আর কে ছাড়াবে? নান্দার হাত দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে, কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, আবার ধুনি থেকে একটা জলন্ত কাঠ নিয়ে কষে বাঘের মাথায় এক ঘা!

বাঘ নান্দাকে বেশ চিনেছিল, সেইজন্য এক ঘা খেয়েই আর দ্বিতীয়

ঘায়ের জন্য অপেক্ষা করল না, তার বোধহয় মনে হল এবার লেজটি গুটিয়ে সরে পড়াই ভালো।

তখন সে লোকটাকে তাঁবুতে এনে, সকলে মিলে চেঁচিয়ে আর থালা-ঘটি পিটে রাত কাটাল। সকালে উঠে জিনিসপত্র সেখানেই ফেলে, শুধু নক্সাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে চম্পট দিল।

দুদিন পরে সেই আড্ডায় গিয়ে দেখা গেল যে বাঘটা রাগের চোটে তাঁবুটাকে কামড়িয়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছে। এক বস্তা চাল আর একটা তেপায়া ছিল, সেগুলোকেও চিবিয়ে আর কিছু রাখেনি।

প্রথম যে লোকটাকে বাঘে ধরেছিল, সে তিনদিন পরে মারা গেল। নান্দা আর অন্য লোকটা তিন মাস হাসপাতালে ভুগে ভালো হয়ে গেল।

বনের ভিতর জরীপের কাজ করতে হলে, সামনে আর পিছনে দুজন লোক নিশান নিয়ে দাঁড়ায়, আর ঐ নিশান দেখে-দেখে ৬৬ ফুট লম্বা জরীপের চেন দিয়ে মেপে যেতে হয়। অনেক সময় কিন্তু নিশানও দেখা যায় না, তখন একখানা ছোট আয়না হাতে নিয়ে চমকাতে হয়। তার ঝিকমিক তিন-চার জরীপ দূর থেকে দেখা যায়। আয়না চমকাবার সময় সামনের লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করতে থাকে, তাতে ঠিক তার সোজাসুজি জরীপ দিয়ে মাপবার সুবিধা হয়।

ফুটকিয়া নতুন লোক, সামনের চমকের কাজ তার হাতে। চমক দিয়েছে ঠিকই কিন্তু আওয়াজ আর দেয় না। ব্যাপার কী ? সে পথে বাঘের ভয় আছে, গ্রামের লোকেরা আগেই আমাদের সাবধান করে দিয়েছিল। কাজেই আমার মনে একটু সন্দেহ হল, আমি লম্বা-লম্বা পা ফেলে দেখতে চললাম।

একটু দুর গিয়েই দেখি কাদার উপর ফুটকিয়ার পায়ের দাগ আর তার পাশেই প্রকাণ্ড বাঘের পাঞ্জা। বাঘটা এইমাত্র গিয়েছে, তখনো

চারদিক থেকে জল গড়িয়ে এসে পাঞ্জার দাগে জমা হচ্ছে! আমি খুব জোরে চিৎকার করে হাঁক দিলাম, "ফুটকিয়া!" হাত কুড়ি-বাইশ সামনে থেকে ভাঙা গলায় আওয়াজ হল: "হুজুর!" আর তার সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হল কী একটা জানোয়ার জঙ্গলে গা ঢাকা দিল। দৌড়ে ফুটকিয়ার কাছে গেলাম। বেচারা রাস্তার মাঝখানে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে কথাটি নেই।

"কিরে, কি হয়েছে?"

বললে, "একটা কিছু আমার পিছনে-পিছনে আসছিল।"

"কোথায় গেল?"

"এখানেই তো ছিল, হুজুর ডাকলেন আর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।"

যেখানটায় ছিল বলে দেখিয়ে দিল সে জায়গাটা ফুটকিয়ার কাছ থেকে সাত-আট হাত দূরে হবে।

"কেমন জানোয়ার ছিল রে?"

"তানি মটুকে তো থা —" বলে হাত দিয়ে মাটি থেকে ফুট দুই উঁচু দেখাল। "লাল আউর কালা ভি থা। এত্না বাড়া শির থা, আউর দুম হিলাতা থা।"

"আরে, শের থা রে?"

"নহি হুজুর! শের হোতা তো হামকো খা ডাল্‌তা নহি?"

ভালো! যে প্রকাণ্ড পায়ের দাগ, আমার আর মিনিট খানেক দেরি হলেই খা ডাল্‌তা কিনা বুঝতে পারত। আসল কথা ফুটকিয়া কখনো বাঘ দেখেনি।

গরমের দিনের রোদ হাতির সহ্য হয় না, সেইজন্য ভোরে জিনিসপত্র নিয়ে লোকজন চলে গেছে, আমি সার্ভেয়ারের সঙ্গে কাজে গিয়েছি। বেলা

বারোটার পর কাজ বন্ধ করে ঘোড়ায় চড়ে তাঁবুতে চললাম। বারো মাইল যেতে হবে, পথে আবার পাহাড়ের চড়াই আছে। পাঁচ-ছয় মাইল মাত্র গিয়েছি, দেখলাম রাস্তার পাশে কয়েকটা বোঝা পড়ে আছে, সেগুলি দেখতে ঠিক আমাদের মালপত্রেরই মতো। আরও একটু চলে দেখি একটা গাছের ছায়ায় আরও মালপত্র আর সঙ্গে একটা খালাসী বসে রয়েছে।

"আরে, কেয়া হ্যায় রে?"

"হুজুর, একটা হাতি ভেগেছে, তাই আমি জিনিসপত্র আগলাবার জন্য বসে আছি, টিণ্ডেল আর লোকজনরা হাতির পিছন-পিছন দৌড়েছে।"

"হাথি কেঁউ ভাগা?"

"হুজুর, হাম্‌লোগ যাতা রহা, পিছেসে ফটফটিয়া আয়া, আউর হাথি চিল্লাকর ভাগা! আসবাব ইধার-উধার ফেঁক দিয়া। মাহুত পিছু-পিছু দৌড়কর গিয়া আউর টিণ্ডেল ভি গিয়া।"

"হাথি পর কৌন থা?"

"হুজুর, টরকাটা থা। মাহুত বাত কর্‌তে-কর্‌তে পয়দল আতা থা।"

এই ফটফটিয়া অর্থাৎ মোটর-সাইকেল বড় বিষম জিনিস। হাতি বেচারা আসামের জঙ্গলে নিশ্চিন্ত মনে পথ চলেছে আর যদি বিনা নোটিশে পিছন থেকে ঐ বিদঘুটে আওয়াজ করতে-করতে একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব এসে পড়ে, তাহলে কার না প্রাণ আঁতকে ওঠে?

চা বাগানের সাহেবদের ফটফটিয়া আছে। এদের জ্বালায় কতবার যে নাকাল হতে হয়েছে সে আর কি বলব! রাস্তার মোড় ঘুরেছি অমনি ফটফট আওয়াজ করে এসে হাজির! ঘোড়াটা লাট্টুর মতো ঘুরে যেদিকে তার মন গেল দে দৌড়! সে কাঁটাই হোক, আর কাদাই হোক, আর যাই হোক! দুর্দশা দেখে কেউ একটু সহানুভূতিও প্রকাশ করে না, সবাই হেসে কুটোপাটি!

আমার সঙ্গের হাতি দুটোর মধ্যে একটা কানা ছিল, তাকে নিয়েই যত গণ্ডগোল হত। বেচারা এক চোখে কিছুই দেখতে পায় না, অন্য চোখটাও প্রায় অকর্মণ্য—ছানি পড়েছে, কাজেই পালানোই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় ঠাউরিয়ে ছিল।

এ বছর কাজ শেষ করে আমরা শিলং চলে গেলাম। আমাদের আপিস ব্যাঙ্গালোর থেকে শিলং-এ উঠে এল। এখন আমাদের আসামেই কাজ করতে হবে।

● ১৩ ● (১৯১০-১৯১২ আসাম। খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়)

এবার খাসিয়া পাহাড়ে কাজ করতে গেলাম। রাস্তার কষ্ট আমার আর গেল না। বর্মা, ত্রিপুরা, লুশাই হিল্‌স্ সব জায়গায় রাস্তার কষ্ট ভোগ করেছি, আবার এখানেও সেই রাস্তার কষ্ট! দু-বছর খাসিয়া পাহাড়ে কাজ করেছিলাম আর দুবছরই হাড়ভাঙা খাড়া রাস্তা, আর বাঁশ আর লতার পোল নিয়ে সার্কাস করার মতো কসরত করতে হয়েছে।

খাসিয়া পাহাড়ের গড়নটা একটু অদ্ভুত। যেন একটা প্রকাণ্ড বড় টেবিলের উপরটার একদিক উঁচু করে তুলে ধরা হয়েছে, আর উপরের কাঠটা করাত দিয়ে তিনকোনা ফালি-ফালি করে চেরা হয়েছে। খাসিয়া পাহাড় একটি অধিত্যকা, টেব্‌ল্-ল্যাণ্ড। মাঝে-মাঝে নদী-নালা সব প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড খাদ কেটে বয়ে গেছে। অধিত্যকার উপরটা বেশ, বেশি চড়াই-উতরাই নেই, যেদিকে খুশি যাতায়াত করা যায়, কিন্তু ঐ খাদগুলো পার হওয়া প্রাণান্তকর ব্যাপার। উপরের অংশে জঙ্গল নেই বললেই হয়, অনেক জায়গাতেই পাহাড়ের উপর শুধু ঘাস, কোথাও বা পাথর, আর মাঝে-মাঝে গাছ।

চেরাপুঞ্জিতে ছিলাম। একজন সার্ভেয়ারের কাজ দেখতে যেতে হবে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একজন খালাসী এসেছে। তাকে জিগগেস করলাম, "বাবুর ডেরা কত দূর ?"

"দশ-বারো মাইল হবে।"

"রাস্তা কেমন ?"

"পাকডাণ্ডি রাস্তা হুজুর, বহুৎ খারাব।"

ঘোড়াও যাবে না, ধরে-ধরে উঠতে হয়।

সকালে সার্ভেয়ারের ক্যাম্পে যাব, আগের দিন বিকেলে দেখতে গেলাম রাস্তা কেমন। বাপ! ও রাস্তায় যাওয়া আমার কর্ম নয়। কিছু দূর ধরে-ধরে বেশ চলে যাওয়া যায়। তারপর পঞ্চাশ-ষাট ফুট একেবারে খাড়া পাথর। সে জায়গায় দুখানা বাঁশ পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে, মাঝে-মাঝে আবার লতা দিয়ে পাথরের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যেন পড়ে না যায়। ঐ মই দিয়ে ওঠা-নামা আমার কর্ম নয়!

খালাসীকে জিগগেস করলাম, "এমন কটা আছে ?"

সে বললে যে চার-পাঁচ জায়গায় এমনি করে বাঁশ বা বড় গাছের ডালের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করতে হবে। শুনেই তো আমি ফিরে এলাম। ঐ প্রকাণ্ড খাদের তিনদিক ঘুরে সার্ভেয়ারের তাঁবুতে পৌঁছতে আমার চারদিন লাগল। খাসিয়া পুরুষ-মেয়েরা কিন্তু পিঠে বোঝা নিয়ে অক্লেশে এই সব পথ দিয়ে যাতায়াত করে। এই রকম গোটা কয়েক খাদ আমার কাজের এলাকার মধ্যে ছিল। প্রাণের দায়ে সবকটাই তিন-চার দিনের রাস্তা ঘুরে যাওয়া-আসা করতে হত।

কিনসী নদীতে পোল পার হওয়াও এক ব্যাপার, বিশেষত এক পশলা বৃষ্টি হবার পর। নদী সেখানে প্রায় একশো গজ চওড়া, সাধারণত তাতে কোমর জল। তার উপর পোল। দু-দুখানা করে বাঁশ আড়াআড়ি

(ক্রশ করে) পাতা কুড়ি-পঁচিশ ফুট দুরে-দুরে, আর তার উপরে দুখানা করে বাঁশ লম্বালম্বি পাতা, ভালো করে জড়িয়ে বাঁধাও নয়। আড়াআড়ি বাঁশের এক দিকে মোটা এক-গাছি লতা বেঁধে দিয়েছে, সেইটাই হল ধরবার রেলিং !

এই তো পোল, এরই উপর দিয়ে পার হতে হবে ! বুটসুদ্ধ সে যে কি ব্যাপার তা বুঝতেই পার। রেলিংটা যদি শক্ত বাঁশের হত তবুও একটু ভর দিয়ে নিজেকে সামলিয়ে নেওয়া যেত, এই ল্যাকপ্যাকে লতায় সে উপায়ও নেই। পোলের উপর উঠে চার-পাঁচ পা যেতে না যেতেই সমস্ত পোলটা দুলতে থাকে আর পাতা বাঁশ দুটো ক্যাঁচন্যাচ করতে আরম্ভ করে ! এই বুঝি ভেঙে জলে পড়লাম। আর বৃষ্টি পড়লে তো পাথরে পাঁচ কিল! নদীর জল পাগলা কুকুরের মতো দৌড়তে থাকে আর সমস্ত পোলটা থরথর করে কাঁপতে থাকে।

বড় সাহেব কাজ পরিদর্শনে এসেছিলেন। তাঁকে কিনসী নদী পার হতে হবে। নদীর ধারে এসে জিগগেস করলেন, "পার হব কী করে ?"

"ঐ পোলের উপর দিয়ে।" বলেই আমি গিয়ে পোলের উপর উঠলাম। সাহেব একটুক্ষণ পোলের রকমসকম দেখলেন, তারপর ঝপ-ঝপ করে জলে নামলেন। বললেন ঐ সব বাঁদুরে কায়দার আর তাঁর বয়স নেই ! সমস্তদিন বেচারাকে ভিজে কাপড়ে থাকতে হয়েছিল।

মনে পড়ল শান স্টেটে একবার এমনি এক পোল পার হতে গিয়ে আমাদের অফিসার মিস্টার ফে—র বড় দুর্দশা হয়েছিল। রামশরণ হল পাড়ওয়ালী ব্রাহ্মণ, বেঁটে মানুষ, কিন্তু খুব মজবুত আর বাঁদরের মতো পাহাড়ে চড়ে। মিস্টার ফে—এসেছেন তার কাজ একজামিন করতে। সাহেব হলেন লম্বা-চওড়া মোটাসোটা মানুষ, ওজন প্রায় আড়াই, পৌনে-তিন মণ হবে, বয়সও হয়েছে ঢের।

সকালে উঠে খচ্চর বোঝাই করে জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিয়ে সাহেব কাজে বের হলেন। কিছু দূর গিয়েই নদী পার হবার পালা। প্রায় এক-শো পঁচিশ গজ চওড়া নদী, ঢের জল তাতে, আর ঐরকম একটি পোল।

পোল দেখে তো সাহেবের চক্ষুস্থির !

"রামশরণ, পার হব কী করে ?"

"কেন সায়েব ঐ তো পোল রয়েছে ?"

"আরে, ওতে কি ভার সইবে ?"

"আলবৎ ! বহুত মজবুত হ্যায়, হুজুর !" বলে রামশরণ পোলের উপর গিয়ে উঠল, আর কিছু দূর গিয়ে, লাফিয়ে, নেচে কুঁদে, সাহেবকে দেখিয়ে দিল যে পোলটা সত্যি-সত্যিই মজবুত। রামশরণ পার হয়ে গেল। সাহেব দাঁড়িয়ে পরিণাম দেখলেন, তারপর তিনিও পোলের উপরে উঠলেন, আর পা টিপে-টিপে এগোতে লাগলেন। প্রায় মাঝামাঝি পৌঁছেছেন তখন পোলটা দুলতে আরম্ভ করল। সাহেব একটু থতমত খেয়ে লতার রেলিং চেপে ধরলেন। ঐ তো রেলিং, সে অত ভার সইবে কেন ? পোলও আরও দুলতে আরম্ভ করল, সাহেব নিজেকে সামলাতে গিয়ে বেশ একটু জোরে পা ফেলেছেন আর মড়-মড়-মড়াৎ—সাহেব একেবারে গলা-জলে !

লোকজন ছুটে গিয়ে তাঁকে তুলল। উঠেই তিনি সার্ভেয়ারের বাপান্ত করলেন। বেচারাকে শান স্টেটের ঐ দারুণ শীতে সমস্তদিন ভিজে কাপড়ে থাকতে হল।

বাঘ, নেকড়ে, বা শেয়াল মারবার জন্য অনেক রকম ফাঁদ দেখেছি যা জঙ্গলের লোকরা ব্যবহার করে। বর্মাই বল, আসামই বল, আর বাঙলা-দেশই বল, সব জায়গাতেই এই সব ফাঁদের একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।

জানোয়ারের চলতি রাস্তার (গেম্ ট্র্যাক-এর) ধারে, পাহাড়ের খু

চালু জায়গায়, গভীর গর্ত খুঁড়ে, তার মধ্যে ভীষণ ধারাল সব বল্লম পুঁতে রাখে। তার উপর বাঁশের কঞ্চি বা বাঁখারির চাল তৈরি করে, মাটি, ঘাস, লতাপাতা দিয়ে এমন করে ঢেকে রেখে দেয় যে কিছু বোঝাই যায় না। তারপর ঐ মাচার উপর বেশ মোটাসোটা একটা কুকুর-ছানা বা শূয়োরছানা বেঁধে রেখে দেয়। বাঘ আপন মনে হেলে-দুলে ঐ পথে চলতে গিয়ে দেখতে পায় সামনেই খাবার তৈরি! হাল্লুম! আর যাবে কোথায়, বল্লম বিঁধে প্রাণ হারায়!

আবার ঠিক ঐ রকম করে রাস্তার মাঝে, মাটিতে গর্ত খুঁড়ে, ঢাকা দিয়ে, টোপ বেঁধে রেখে দেয়। মাচার নিচে বল্লমের বদলে থাকে কাদা। এর মধ্যে পড়লে বাঘ প্রাণে মরে না বটে কিন্তু কাদায় পড়ে নড়বার যো থাকে না, চেঁচিয়ে দেশ মাথায় করে।

তারপর বেড়ার মধ্যে ফুটো করে তাতে পাকা বেতের ফাঁস ঝুলিয়ে রাখা হয়। ফাঁসটা একটা মজবুত বাঁশের ডগায় বেঁধে, জোর করে বাঁশটা নিচু করে আটকিয়ে রাখা হয়। বেড়ার ফুটোর সামনেই মোরগ বা অন্য কিছু টোপ কায়দা করে দড়ি দিয়ে ফাঁসের সঙ্গে জড়ানো থাকে। বাঘ বা শেয়াল খাবার লোভে, ফুটো দিয়ে ঢুকে যেমনি মোরগ ধরে টান দেয়, অমনি কল খুলে যায়, সঙ্গে-সঙ্গে জানোয়ারটারও হাতে, পায়ে বা গলায় ফাঁস লেগে সে শূন্যে ঝুলতে থাকে। তারপরে যা তামশা!

আবার মাটিতে মজবুত খুঁটি পুঁতে খোঁয়াড় তৈরি করা হয়। তার মধ্যে একটা ছোট কুঠুরিতে কুকুর বা ছাগল বেঁধে রাখে। খোঁয়াড়ের দরজা কল এঁটে খুলে রাখা হয়। বাঘ ভিতরে ঢুকে যেই টোপটি খেতে যায় অমনি হড়াৎ করে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর মারো আর ধরো, যেমন ইচ্ছা।

বাঘ চলবার রাস্তা বা তার মারা শিকারের উপর তীর বা বন্দুক পেতে

রাখে। বাঘ এসে শিকার ধরে টানলেই, তীর বা বন্দুকের গুলিতে মারা যায়। তীরটা অবশ্য বিষাক্ত।

মজবুত কাঠের মাচা তৈরি করে তার উপর ভারি-ভারি পাথর বা কাঠ চাপিয়ে রাখে। মাচার একটা দিক বেশ শক্ত করে মাটিতে আটকিয়ে দেয়। অন্য দিকটা তুলে ধরে দড়ি দিয়ে নিচের টোপের সঙ্গে কৌশল করে বেঁধে রাখে। বাঘ বা শেয়াল টোপ ধরে টানবামাত্র কল খুলে যায় আর ঐ প্রকাণ্ড বোঝা তার ঘাড়ে পড়ে। এই ফাঁকে শেয়াল বা ছোট বাঘ চাপা পড়ে।

এরই আবার একটা রকমারি খাসিয়া পাহাড়ে পেয়েছিলাম। সেটাতে মাচা তৈরি করে ওজন চাপানো নয়, প্রকাণ্ড একটা পাথর চমৎকার ব্যালান্স করে রাখা, আর তার উপরে টোপ। লাফিয়ে ছাড়া ঐ টোপ ধরা যায় না, আর লাফালেই পাথর উলটিয়ে গিয়ে জানোয়ারটা চাপা পড়ে প্রাণ হারায়। এই রকম একটা বাঘের ফাঁদে পড়ে আমার রাজপুত সার্ভেয়ার আরেকটু হলেই প্রাণ হারিয়েছিল।

অমর সিং পাহাড়ের উপর কাজ করছিল। যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে ভালো দেখতে পাচ্ছিল না। তার পাঁচ-সাত ফুট নিচে একটা বেশ বড় পাথর ছিল। মনে করল হয়তো বা পাথরটার তলায় গেলে ভালো দেখতে পাবে। লোকজনদের বললে, "যন্ত্রপাতি নিয়ে তোমরা ঘুরে ঐ পাথরটার নিচে নেমে যাও। আমি সোজা নামছি।"

খালাসীরা ঘুরে নামতে আরম্ভ করল আর অমর সিং সোজা ঐ পাথরটার উপর লাফিয়ে পড়ল। ওটা ছিল বাঘ মারার ফাঁদ। লাফিয়ে পড়বামাত্র পাথরটা উলটিয়ে গিয়ে তাকে চাপা দিল। তার অদৃষ্ট ভালো, ভগবানের কৃপায় এক পাশে পড়েছিল, শুধু একটা পা চাপা পড়েছিল, তার ফলে চলৎশক্তি রহিত হয়ে দশ-বারোদিন বিছানায় পড়েছিল।

গৌহাটি-শিলং রাস্তার মাঝামাঝি নংপো। নংপো থেকে একটু দূরেই সরকারী রিজার্ভ ফরেস্ট। ঐ জঙ্গলে সার্ভেয়ার নারায়ণ সিং কাজ করছিল। দুটো পাগলা হাতি, যাকে বলে 'মস্ত্', ঐ জঙ্গলে ছিল। যদিও আজ পর্যন্ত হাতি ওদের চোখে পড়েনি, তবুও ওরা খুব সাবধানে কাজ করত। একদিন কাজে বেরিয়েছে। পিছন থেকে চমকওয়ালা চমক দিলেই কাজ আরম্ভ করবে, সেইজন্য দাঁড়িয়ে আছে।

সার্ভেয়ার আর তার সঙ্গের লোকরা ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে, "আরে চমকাও রে, চমকাও।" কিন্তু চমক আর দেয় না। বিরক্ত হয়ে দুজন খালাসী দেখতে গেল লোকটা কী করছে, চমক দেয় না কেন। তারা নিচে নেমে দেখে লোকটা সেখানে নেই। চেঁচিয়ে বাবুকে ডাকল। সার্ভেয়ারও দৌড়ে গেল। একটু দূরেই তার দাখানা পড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখল রক্ত আর মগজ! আরও একটু দূরে দেখতে পেল একটা বাঁশঝাড়েব মধ্যে খালাসীর চূর্ণ করা দেহটা বিঁধে রয়েছে। সব জায়গায় হাতির পায়ের দাগ।

সকালের কুয়াশাতে তারা হাতির রাস্তায়-রাস্তায় কাজ করছিল। কোথায় যে পাশেই হতভাগা হাতি চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল সেটা কুয়াশার জন্য দেখতে পায়নি। আর সকলে চলে যাবার পর যখন চমকওয়ালা একলা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তখন হতভাগা হাতি নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে তাকে ধরেছিল আর সঙ্গে-সঙ্গেই আছাড় মেরে হাড় ভেঙে দেহটাকে ঐ বাঁশঝাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

পরে ঐ হাতিটাকে আসামের কমিশনার সাহেব মেরেছিলেন।

এ-বছর আমার কাজ ছিল খাসিয়া আর গারো পাহাড়ের সীমানার কাছে। সেখানে একটা জায়গা ছিল একেবারে গ্রামশূন্য। ঐ জায়গাটাতে মেল' শিকার ছিল। দুজন সার্ভেয়ারের কাজ দেখতে গিয়েছিলাম, তাদের

খালাসীরা একমাস ধরে শুধু নুন লঙ্কা আর ভাত খাচ্ছে। আমাকে দেখে মুখ ভার করে অবস্থাটা জানাল। বিকেলে বন্দুক হাতে বেরোলাম আর আধ-ঘণ্টার মধ্যে দুটো হরিণ মারলাম, একটা প্রকাণ্ড সম্বর আর একটা বড় বার্কিং ডিয়ার। সম্বরটাকে আট-দশজন লোকও তুলে আনতে পারেনি। চামড়া ছাড়িয়ে, মাংস কেটে টুকরো-টুকরো করে আনতে হয়েছিল। লোকও ঢের ছিল, দুজন সার্ভেয়ার আর আমার খালাসীরা ছাড়াও চার-পাঁচজন খাসিয়া কুলি। মাংস ভাগ-বাটরা করে দেওয়া হল, প্রত্যেকেই অনেক মাংস পেল আর সকলেই মহা খুশি!

রাত্রে খালাসীরা মিলে অনেক রাত পর্যন্ত হল্লা করল। ভোরে শুনি আবার হল্লা। আমি উঠে হাত-মুখ ধুয়ে, কাপড়-চোপড় পরে চা খেতে বসেছি, কাজে বেরোতে হবে। আমার টিণ্ডেল হাঁড়িপানা মুখ করে এসে নালিশ করল, "হুজুর, আমার মাংস চুরি করে খেয়ে ফেলেছে।"

"কে খেয়েছে?"

"পাহারাওয়ালারা।"

"কাদের পাহারা ছিল?"

দুজন খালাসীর নাম করল। তাদের একজন আবার ওর নিজের শালা। তাদের দুজনকে ডেকে আনলাম।

"কি ব্যাপার? তোমরা মাংস খেয়ে ফেলেছ?"

"হ্যাঁ হুজুর, মেলা মাংস খেয়েছি।"

"তোমাদের হিস্যার মাংস ফেলে ওরটা খেলে কেন?"

তখন হাত জোড় করে টিণ্ডেলের শালা বলল, "হুজুর, ওটা ওর হিস্যার মাংস নয়। ওটা চুরির মাংস।"

"চুরির মাংস কেমন?"

"হুজুর, কাল দুটো হরিণ মেরেছিলেন আর সকলকে বেঁটে নিতে

বলেছিলেন। এদিকে টিণ্ডেল ছোট হরিণটার একটা পিছনের ঠ্যাং লুকিয়ে রেখে বাকি মাংস ভাগ করে দিয়েছিল, নিজেকে সুদ্ধ হিসেব করে। রাত্রে সবাই শুলে ঐ ঠ্যাংটা বের করে, লম্বা-লম্বা ফালি করে কেটে আগুনের উপর টাঙিয়ে দিয়েছিল আর আমাকে পাহারায় বসিয়ে রেখেছিল, শুকোলে যেন তুলে রাখি, ঐ মাংস সে দেশে নিয়ে যাবে। এটা কেন ভাগ করা হয়নি জিগগেস করাতে আমাকে ধমকে বললে, 'চারসের-সাড়ে-চারসের মাংস পেয়েছিস, আবার কী চাস? চুপ করে থাক, আর যা বলছি তাই কর।' আমরা কিন্তু ঐ মাংস আগুনে পুড়িয়ে, নুন দিয়ে খেয়ে ফেলেছি।"

"আরে হতভাগা, রাঙটা তো সাত-আটসের মাংস হবে, দুজনে খেলি কী করে?"

"নহি হুজুর, বহুৎ আদমী মিলকর খায়া।"

"টিণ্ডেল কো নহি দিয়া?"

মাথা নিচু করে উত্তর দিল, "নহি, হুজুর।"

আমার এমন হাসি পেয়েছিল যে কী বলব। টিণ্ডেলকে বললাম, "ওদের হিস্যা ওরা খেয়ে নিয়েছে তাতে নালিশ করবার কিছু নেই! আর তোমার হিস্যা তোমার শালা খেয়েছে, তাতে তোমার বলবার কী আছে? শালারা তো অমন খেয়েই থাকে!"

● ১৪ ● (১৯১২-১৯১৩ আসাম। কামরূপ) গৌহাটির পরপারে ফুরুয়া পাহাড়। পাহাড়ের পশ্চিমদিকে বেশ বড় গ্রাম, গ্রামের নামও ফুরুয়া। সেই গ্রামের কিনারায় সার্ভেয়ারের তাঁবু। আমি তার কাজ

দেখতে গিয়েছি। নৌকোতে গিয়েছি, উজান বেয়ে যেতে বেশ দেরি হয়ে গেছে। তাঁবু খাটাতে প্রায় সন্ধ্যা।

একজন লোককে জিগগেস করলাম, "এখানে শিকার পাওয়া যায় ?"

সে বললে, "হ্যাঁ। ঐ পাহাড়ের নিচে-নিচে রাস্তা ধরে গেলে, সকাল সন্ধ্যায় পাওয়া যায়, মুর্গি ইত্যাদি।"

একজন খালাসীকে বললাম, "টোটার ব্যাগটা নিয়ে আমার সঙ্গে চল্।"

বন্দুক ঘাড়ে ফেলে তো দুজনে বেরোলাম। ধীরে-ধীরে চলেছি, প্রায় একমাইল-দেড়মাইল রাস্তা গিয়েছি, কোথাও কিছু নেই। দু-চারটে বনমোরগ দেখেছিলাম, কিন্তু সাধ্য কি যে কাছে যাই। ঐ গ্রামে দু-চারটে বন্দুক আছে, সেগুলোকে গ্রামের লোকরা ফটফট চালায়, কাজেই শিকার সব হুঁসিয়ার হয়ে গেছে, দেড়শো-দুশো গজ দূর থেকেই পালিয়ে যায়।

পরিশ্রমই সার হল, নিরাশ মনে তাঁবুতে ফিরে আসছি এমন সময় চোখে পড়ল ত্রিশ-চল্লিশ গজ সামনে একটা শুকনো নালার উপর, নালার চকচকে শাদা বালির উপর দিয়ে একটা কালো জানোয়ার চলে গেল। নালাটা পাহাড় থেকে নেমেছে আর রাস্তা কেটে ধানখেতে পড়েছে। জানোয়ারটা যখন রাস্তা পার হয় তখন আমার চোখে পড়েছে। ওখানে বাঘ-শূয়োরও আছে, গ্রামের লোকরা সাবধান করে দিয়েছিল। বন্দুকে ছিটা ভরা ছিল, খালাসীটাকে কানে-কানে বললাম, "গুলিওয়ালা টোটা দে।"

"আনিনি হুজুর।"

"কেন আনিসনি ?"

"টিণ্ডেল বলল সাহেব চিড়িয়া মারবেন, গুলির দরকার নেই !"

হতভাগা ! পকেটে একটা গুলিওয়ালা আর একটা বাকৃশটওয়ালা



কার্তুজ ছিল, সে দুটো বন্দুকে পুরে নিলাম, আর ধীরে-ধীরে নিঃশব্দে চললাম। পায়ে রোপ-সোলের জুতো ছিল কোনো রকম আওয়াজ হচ্ছিল না। নালায় পৌঁছে খুব সাবধানে দেখতে লাগলাম কী ওটা। দেখি তিন-চার হাত সামনেই মাটি খুঁড়ছে প্রকাণ্ড এক শূয়োর, আমার দিকে তার পিছন।

একবার ভাবলাম—যাক, মারব না, মাত্র ঐ একটি তো গুলি, যদি এক গুলিতে না মরে! তারপরই মনে হল দুর ছাই, ঐ তো তিন-চার হাত সামনে রয়েছে, মরবে না আবার কি! যেমন মনে হওয়া আর অমনি বন্দুক তুলে গুড়ুম করে ছেড়ে দিলাম।

শূয়োরটা একেবারে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল। আট-দশ সেকেণ্ড পড়ে থেকে, উঠতে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু আবার উলটে পড়ে গেল। আবার একটুক্ষণ ছটফট করে, আবার উঠতে চেষ্টা করল। বার তিনেক উঠে-পড়ে, আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। খালাসীটা পালাবার চেষ্টায় ছিল, তাকে ধমক দিলাম—"পালালে তোকেই গুলি করব।"

শূয়োরটার যা চেহারা, বাপ! তার গর্দানের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে,

কটাস-কটাস করে দাঁত ঘষছে, এই বুঝি আমার দিকে তেড়ে আসে। মাত্র একটি বাকৃশট সম্বল আমার, বন্দুক ঘাড়ে তুলে প্রস্তুত তো হয়েই আছি, চার্জ করলে, যখন বন্দুকের নাকে পৌঁছবে, তখন ঘোড়া টিপব।

শূয়োরটা কিন্তু চার্জ করল না। পাঁচ-ছয় সেকেণ্ড ঐ ভাবে কটাস-কটাস করে দাঁত ঘষে বিকট একটা হুঙ্কার দিয়ে পাশের শরবনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। আমিও খালাসীটার হাত ধরে পিছু হেঁটে নালার ওপারে গিয়ে উঠলাম। উঠে তাকে বললাম, "আব্ ভাগো।"

লোকটা কিন্তু ভাগলো না, আমার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁবুতে ফিরে এল।

তাঁবুতে ফিরে টিণ্ডেলকে তাড়া দিলাম গুলিওয়ালা টোটা দেয়নি কেন? আরও বললাম, "সকালে দুজন লোক গিয়ে ঐখানটায় খুঁজে দেখ। ওটা নিশ্চয় মরেছে।"

সকালে উঠে আমি কাজে গেলাম, বিকেলে ফিরে এসে জিগগেস করলাম, "কেয়া রে? মিলা?"

"নহি হুজুর, কাঁহা ভাগ গিয়া।"

পরদিন সকালে আমরা আবার ঐ রাস্তায় যাচ্ছিলাম, সেই শুকনো নালার ধারে শরবন, নালা থেকে আট-দশ ফুট দূরেই ঢের শকুন।

"কেয়া হ্যায় রে? "

"আরে হুজুর ওহি শূয়ার তো থা লেকিন সব খা গিয়া।"

অনুসন্ধান করা হল, লোক দুটো কেন বলেছিল যে নেই, চলে গেছে। ধমক খেয়ে একজন স্বীকার করল যে তারা ভয়ে ওদিক মাড়ায়নি।

ফুরুয়ায় বড় বাঘের উৎপাত। গ্রাম থেকে তিন-চারটে গরু ধরে নিয়ে গেছে। সার্ভেয়ার শামসের সিং বলল, "হুজুর, বন্দুক দাও!"

আমি বললাম, "আমি তো তিন রাত কাটালাম, কই বাঘ বেরোল না, তার ডাকও শুনলাম না।"

সে বলল ইতিপূর্বে তারা প্রায় রোজই বাঘের ডাক শুনেছে।

আমি গৌহাটি ফিরে এলাম। সেইদিনই আমার চাপরাশি রামাবতার আর দুজন খালাসীকে শামসের সিং-এর তাঁবুতে পাঠালাম, তার টাকার দরকার। পরদিন সকালে তারা ফিরে এল আর সার্ভেয়ারের লম্বা এক চিঠি নিয়ে এল। রাত্রে বাঘের ভয়ে তারা ঘুমোতে পারেনি শিগগির বন্দুক পাঠিয়ে দাও নইলে খালাসীরা ভয়ে কাজে বেরোবে না ইত্যাদি।

রামাবতারকে ডেকে জিগগেস করলাম, "বুড়ো, ব্যাপার কি?"

সারারাত নাকি কেউ ঘুমোয়নি। তাঁবুর সামনে বসে বাঘ গর্জন করেছে।

"যেখানে আপনার তাঁবু ছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে চার পায়ে মাটি খুঁড়েছে আর গর্জন করেছে। আমরা কত চিৎকার করেছি, গ্রাহ্যই করেনি।"

যাই হোক, একটা বন্দুক পাঠিয়ে দেওয়া হল।

বনে-জঙ্গলে ছোট-বড় কত রকমের জানোয়ার, আর তাদের অস্ত্রই বা কত রকমের। শিং, নখ, দাঁত, ক্ষুর—এক-একজনের এক-একটা চলে! এক-একজনের আবার মুখ ও পা দুই-ই চলে। যেমন, বাঘের দাঁত ও নখ, মহিষের শিং ও ক্ষুর, শূয়োরের দাঁত ও ক্ষুর। বনে-জঙ্গলে কত রকমের জানোয়ারই দেখেছি, কিন্তু শূয়োরের মতো এমন অদ্ভুত মেজাজের জীব আর দেখলাম না। বাঘ বল, ভাল্লুক বল, হাতি, মহিষ, গণ্ডার সকলেই চলে অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে, পাছে কেউ জানতে পারে। দশ-বিশ ফুট দূর দিয়ে বাঘ-ভাল্লুক নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, কিছু জানবার, কিছু বোঝবার যো নেই। হাতিটা পর্যন্ত এক-এক সময়ে প্রায় ঘাড়ের উপর এসে না পড়লে আর বুঝতে পারা যায় না যে হাতি আসছে।

এই রকম সন্তর্পণে চলা বুনো জানোয়ার মাত্রেরই স্বভাব, শুধু শূয়োর বাদে। শূয়োর যখন চলে সে যেন নোটিশ দিতে-দিতে আসে, "সাবধান, আমি আসছি!" এদিক-ওদিক তাকানো নেই, টিপে-টিপে পা ফেলা নেই, খালি ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ফোঁস-ফোঁস, পা দুলিয়ে বুক ফুলিয়ে চলা, আর ঝোপ-জঙ্গল ঘেঁটেঘুঁটে তোলপাড় করা। আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারি ঐ আসছেন বরাহ-অবতার। এমন একরোখা গোঁয়ার জন্তু বুঝি আর নেই, তাই লোকে বলে শূয়োরের গোঁ।

যেমন মেজাজ, তেমনি তেজ আর তেমনিই তার শক্তি। পালাবার পথ থাকলে প্রায় সব জন্তুই আগে সেইটে খোঁজে। কিন্তু শূয়োরের সে-সব জ্ঞান নেই। তোমাকে দেখে যদি দৈবাৎ তার পছন্দ না হয়, সে খামখা পঁচিশ হাত জঙ্গল পার হয়ে তোমাকে তাড়া করে আসবে। তার উপর তুমি যদি আগে থেকে খোঁচাখুঁচি করতে যাও, তাহলে তো আর কথাই নেই। খোঁচা খেয়ে হজম করবে এমন জন্তুই সে নয়! তাকে মেরে কেটে রক্তাক্ত করে ফেল, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই। তুমি একাই হও, আর পঁচিশজন লোকই সঙ্গে আনো, সে তার তোয়াক্কা রাখে না। গায়ে আঁচড় পড়লে, তার মাথায় যেন খুন চাপে। যতক্ষণ তার শরীরে প্রাণ থাকে ও নড়বার-চড়বার শক্তি থাকে, ততক্ষণ তার ঐ সর্বনেশে গোঁ সে ছাড়ে না। রাগ আছে, সাহস আছে, তার উপর শারীরিক ক্ষমতা আছে আর হাতিয়ারেরও অভাব নেই, এমন জন্তুকে কে না ভয় করে? আমাদের দেশে বলে: 'বাঘ-শিকারীর ভাত রেঁধো। শূয়োর-শিকারীর রেঁধো না।' সে যে ফিরে আসবে তার কোনো নিশ্চয়তাই নেই।

ছোট-বড়, রঙ-বেরঙের কত রকম শূয়োর। কোনোটা শাদা, কোনোটা কালো, কোনোটার কাদার মতো রঙ। কারো পিঠে লম্বা-লম্বা লোম, রাগলে, সেই লোম ফুলে ওঠে। কারো ঘাড়ে খাড়া-খাড়া চুল, আবার

কারো বা সর্বাঙ্গ চুলে ঢাকা। কারো দুটি দাঁত, কারো চারটি, আবার কারো বা নাকের পাশে চামড়া ফুঁড়ে দাঁত বেরিয়েছে। এক-একটার মুখ ভরা আলুর মতো বড় গোল-গোল আঁচিল। কেউ থাকে দু-চার-ছয়জন মিলে, আর কোনোটা বড়-বড় দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু মেজাজ প্রায় সকলেরই একরকম, একটু উনিশ-বিশ মাত্র।

শূয়োর শিকারেরও নানান কায়দা। কোথাও হয়তো ঘোড়ায় চড়ে বল্লম দিয়ে শিকার করে, কোথাও বা জাল দিয়ে ঘিরে ফেলে, তাড়া করে সেই জালে ফেলে বর্শা দিয়ে মারে, আর যাদের সে সাহস নেই, তারা দূর থেকে বন্দুক চালায়।

একদিন ভোরে কাজে বেরিয়েছি, সঙ্গে আট-দশজন লোক। চারদিকে লম্বা-লম্বা নলখাগড়ার বন, মাঝে-মাঝে দু-একটা খেতও আছে। হঠাৎ দেখি একটা সর্ষে-খেতের মাঝখানে কালো-কালো কী দেখা যাচ্ছে। প্রথমটা মনে করলাম হয়তো বাছুর হবে, কিন্তু একটু এগিয়ে দেখি প্রকাণ্ড দুই শূয়োর! প্রথমে আমাদের সঙ্গের কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে তাড়া করতে গিয়েছিল, কিন্তু বড় শূয়োরটা ঘোঁৎ করে ফিরে দাঁড়াতেই সে লেজ গুটিয়ে কেঁউ-কেঁউ শব্দ করতে-করতে দে দৌড়! হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না। ভাবলাম সকলে চেঁচামেচি করে ওদের তাড়ানো যাক। তাতে কিন্তু হিতে বিপরীত হল, শূয়োরটা এমনি তাড়া করে এল যে আমরা যে-যেদিকে পারলাম দৌড়িয়ে একেবারে জঙ্গলের বাইরে।

আরেকদিন কিন্তু আমাদেরই জয়লাভ হয়েছিল। সেদিন কাজ থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, তাঁবু দূরে, তাই তাড়াতাড়ি ফিরছিলাম। পথের মধ্যে একেবারে আট-দশটা শূয়োরের সামনে পড়ে গেলাম। আমরাও যেমন চমকে উঠলাম, শূয়োরগুলোও থমকে দাঁড়াল, আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ! পালের গোদা পিছনে ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি সঙ্গীদের ঠেলে,

দু-চারটাকে উল্টে ফেলে দিয়ে একেবারে সামনে এসে হাজির! আর তাঁর যা চেহারা! ঘাড়ের লোম খাড়া, দুই চোখ লাল, আর প্রকাণ্ড দুই দাঁত বের করে সে এমন এক বিকট ভেংচি দিল যে আমি বেগতিক বুঝে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বন্দুক তুললাম। শূয়োরটাও তাড়া করল, সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলি তার কপালে!

বরাহ এক গুলিতেই চিতপটাং। সঙ্গের লোকরা তাকে তাঁবুতে এনে মহা ভোজের যোগাড় করল, আমার লাভ হল শুধু তার বড়-বড় দাঁত দুটি!

আরেকবার একজন মুসলমান সার্ভেয়ারের কাজ দেখতে গিয়েছি। সে বড় ভালো লোক। আমাকে অনুরোধ করল, "হুজুর, শুনেছি আপনি সকলকেই শিকার মেরে খাওয়ান, আমার কাছে তো কখনো মারেননি।"

জিগগেস করলাম, "এখানে শিকার আছে?"

"হাঁ হুজুর। গ্রামের লোকরা ধান কাটছে, তারা বলে যে রোজ রাত্রে হরিণ, মোষ, শূয়োর ইত্যাদি ধান খেতে আসে।"

আমি বললাম, "আচ্ছা, সন্ধ্যার পর যাব। যদি তোমাদের কপালে থাকে তো শিকার মিলবে।"

একদিন রাত দশটা-এগারোটা অবধি বসে থেকে-থেকে ফিরে এলাম, শিকার পেলাম না। সমস্তদিন পাহাড়-জঙ্গল ঘেঁটে তারপর রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত ধানখেতে বসে থাকা নেহাত আমোদের কথা নয়। কাজেই পরদিন আর যাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সেই যে বলেছিলাম 'তোমাদের কপালে থাকে তো মিলবে'—কাজেই যেতে হল। খালাসীদের জন্যই বেশি ভাবনা। বেচারারা সমস্তদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, আর খায় শুধু ভাত নুন লঙ্কা, কদাচিৎ একটু ডাল, কুমড়ো বা কচু ফেলে।

সন্ধ্যার পর দুজন খালাসী সঙ্গে করে বেরোলাম, তাঁবুতে বলে গেলাম যে বন্দুকের আওয়াজ পেলেই লোক পাঠাবে।

প্রায় সমস্ত ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে, শুধু তাঁবু থেকে সিকি-মাইল দূরে এক টুকরো বাকি আছে, তারও চার পাশের ধান কাটা হয়ে গেছে। জঙ্গলের কিনারায়-কিনারায় চললাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। চারদিক দেখে নেবার পর, ঐ ধানটুকুর পাশে একটু ঘাস ছিল, দু-ফুট আড়াই-ফুট উঁচু, তার মধ্যে গুড়ি মেরে বসে রইলাম। জ্যোৎস্না উঠেছে, জঙ্গলের দিকে মুখ করে বসে আছি, কিন্তু কিছুই বেরোয় না।

রাত নটা সাড়ে-নটা বাজল, মনে করলাম এখন তাঁবুতে ফিরে যাই, এমন সময় জানোয়ারের পায়ের শব্দ কানে এল। আমার পিছনদিকে একটা বিল ছিল, তাতে উঁচু শরবন। সেইদিক থেকে আওয়াজ আসছে, একটার বেশি জানোয়ারের। চুপ করে বসে আছি, নড়িও না, যেন কানে কোনো আওয়াজই পৌঁছয়নি।

জানোয়ারগুলো বেশ চালাক। দশ-বারো পা আসে, আবার ছুটে পালিয়ে যায়, আবার দশ-বারো কদম এগোয় আবার পিছন ফিরে দৌড়োয়। আমরা যেন কিছুই শুনিনি, যেমন হামাগুড়ি দিয়ে বসে ছিলাম তেমনি রইলাম। তিন-চারবার ঐরকম করে বোধহয় জানোয়ারদের বিশ্বাস হল এখানে লোকজন কেউ নেই, আর একেবারে সোজা পাশ কাটিয়ে এসে আমাদের সামনে হাজির—শূয়োর! সকলের আগে একটা প্রকাণ্ড, তার পিছনে দুটো পাশাপাশি, তারও পিছনে কি আছে না আছে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমাদের উপর চোখ পড়তেই শূয়োরগুলো নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগল। কোনটাকে মারি? সামনের বড়টাকে? ওটা দূরে, এদুটো কাছে। পাঁচ-ছয় হাত মাত্র ব্যবধান।

কাছের দুটোকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়লাম। একটা তো নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল, দু-একবার হাত-পা ছুঁড়ে ঠাণ্ডা। অন্যটা কঁ্যা-কঁ্যা শব্দ করতে-করতে তিন ঠ্যাঙে দৌড়। অন্যগুলো যে কোনদিকে উড়ে গেল লক্ষ্য

করতে পারলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে একটাকেও আর দেখতে পেলাম না।

বন্দুকের আওয়াজ শুনেই তো খালাসীরা হল্লা করে তাঁবু থেকে দৌড়ে এল। এসে দেখে শূয়োর। তখন একজন চিৎকার করে অন্যদের খবর দিল কি শিকার মিলেছে। বেচারা সার্ভেয়ার তো শুনেই তোবা-তোবা বলে তাঁবুর দরজা বন্ধ করে দিল। আর খালাসীরা মহানন্দে ভোজের আয়োজন করতে লাগল।

একবার সার্ভেয়ারের তাঁবু অনেক দূরে, গ্রামের লোক বলল একদিনে পৌঁছনো যাবে না। মাঝে আর গ্রাম নেই, কাজেই বাধ্য হয়ে ভোরে বেরিয়েছি, যেমন করেই হোক সন্ধ্যার আগে পৌঁছতে হবে।

সমস্তদিন চলতে-চলতে লোকজন সব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বেলা চারটে প্রায়, তখনো দু'মাইল রাস্তা বাকি। দোভাষী আমি আর একজন খালাসী একটা নালার কিনারায় বসেছি, অন্য খালাসী আর খাসিয়া কুলিরা পিছনে পড়েছে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছি। হঠাৎ আমার পিছনের জঙ্গলে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ। নিঃশব্দে উঠে, আমার বন্দুকটি হাতে নিয়ে, দোভাষী দেখতে চলল কি জানোয়ার। শূয়োর সন্দেহ নেই, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ তার প্রমাণ। এক মিনিটের মধ্যেই গুড়ুম শব্দ আর সঙ্গে-সঙ্গে শূয়োরের হুঙ্কার। ছুটে দেখতে গেলাম কি ব্যাপার। গিয়ে দেখি গুলি লেগে শূয়োরের কোমর ভেঙে গেছে, বেচারা চলৎশক্তিরহিত! তবুও তার হুঙ্কার কি! আর দোভাষীকে মারবার জন্য চেষ্টাই বা কত! ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে উঠেছে, লাল চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে, কটাস-কটাস করে দাঁত পিষছে, আর শুধু সামনের পা দুখানা দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করছে দোভাষীর দিকে এগোতে। পিছু হটবার নামও নেই! আরেক গুলিতে তার সব যন্ত্রণার অবসান করে দেওয়া হল।

একদিন একটা মজা হয়েছিল। সমস্ত দিন সার্ভেয়ারের কাজ দেখেছি,



বড়ই পরিশ্রান্ত। কাজ শেষ করে, ঘোড়ায় চড়ে তাঁবুতে চলেছি, আট-নয় মাইল পথ যেতে হবে। রাস্তা ভালো, জ্যোৎস্না রাত, ভাবনা নেই। দুজন মাত্র লোক আমার সঙ্গে, আমার সহিস অলক আর একজন খালাসী।

আমরা তো লম্বা পা ফেলে চলেছি, নদী পার হতে হবে, সন্ধ্যার আগে নদীর ধারে পৌঁছবার ইচ্ছা। প্রায় মাঝ-পথে একটা বড় বিল আছে। বিলের কাছে এসে দেখি মেলা হাঁস। বড়ই লোভ হল। লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নামলাম। অন্য লোকটিকে ঘোড়া ধরতে বলে, আমি আর অলক হামাগুড়ি দিয়ে চললাম, মতলব সোলা গাছের (যা দিয়ে টুপি তৈরি হয়) আড়ালে-আড়ালে চলে একেবারে বিলের কিনারায় পৌঁছব। তারপর মাত্র কুড়ি-ত্রিশ গজ বাকি থাকবে, দুমদাম দুটো কার্তুজ চালালে দু-চারটে হাঁস নিশ্চয় পাব।

প্রায় কিনারায় পৌঁছে গেছি, সবেমাত্র মনে-মনে ভাবছি এইবার উঠে দেখি কোনদিকে বন্দুক চালাব। আর অমনি সোলাগাছের আড়াল থেকে

'ক্রা-আ-আ' বলে একটা সারস ডেকে উঠল। চার-পাঁচটা সারস ডাঙায় চরছিল, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে বিলের সমস্ত পাখি ভ-র-র শব্দে উড়ে গেল। ঐ সারসটাও সঙ্গে-সঙ্গে উড়ল।

এমন রাগ হল হতভাগার উপর যে কি বলব। সারসটা যখন আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, গুড়ুম করে তার বুকে দুই নম্বর ছিটা ছেড়ে দিলাম। অমনি ঘুরপাক খেয়ে সারসটা জলে পড়ল। সমস্ত পাখিটা জলে ডুবে গেল, শুধু তার মাথাটা আর গলার খানিকটা উপরে রইল।

অলক তাড়াতাড়ি গামছা পরে ওটাকে ধরে আনবার জন্য জলে নামল। আমি তাকে অনেকবার বললাম, "লাঠি নিয়ে যা, ওটা জ্যান্ত, কামড়াবে।" কিন্তু সে কিছুই গ্রাহ্য করল না। বলল, "নাহি হুজুর, গলেমে পকড় লেঙ্গে।"

সেখানে তিন-চার ফুট জল হবে। অলক পাখিটার কাছে গিয়ে হাত বাড়াল তার গলাটা ধরবার জন্য, আর সারসটা তার প্রকাণ্ড ঠোঁট হাঁ করে এল তাকে কামড়াতে। অলক অমনি এক পা পিছনে হটে গেল। আবার পাখিটার অন্য পাশ দিয়ে হাত বাড়াল। পাখিটা মুখ ঘুরিয়ে আবার ঐ প্রকাণ্ড হাঁ অলকের দিকে ফেরাল। কিছুতেই আর ধরতে পারে না। শেষটা নিরুপায় হয়ে সে ডুব দিয়ে সারসের পা ধরল। কিন্তু পা ধরে যেমন সে দাঁড়িয়েছে আর অমনি সারসটা তার প্রকাণ্ড দুই ডানা মেলে অলকের মুখে মাথায় ডানা দিয়ে তিন-চারটে ঝাপটা মারল, অলকও "বাপরে বাপ" বলে তাকে ছেড়ে দিল। অমনি সারসটা বিদ্যুৎবেগে আকাশে উড়ে গেল।

আমি এতক্ষণ অলকের কাণ্ড দেখে হেসে আকুল হচ্ছিলাম, মারবার অবসর হল না। ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রায় সিকি-মাইল পথ বেচারা উড়ে গেল, তারপর হঠাৎ ডিগবাজী খেয়ে নল-খাগড়ার বনের মধ্যে পড়ে গেল, বোধ

হল যেন মরে পড়ল! ঐ ছিল তার শেষ চেষ্টা, ঐ জঙ্গলের ভিতর তাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব।

এদিকে সকলে মিলে অলককে কি রকম জ্বালাতন করেছিল, বুঝতেই পারছ।

● ১৫ ● (১৯১৩-১৯১৫। আসাম) আসামের নওগাঁ জেলার দক্ষিণ দিকে অনেক শরবন, তার মাঝে-মাঝে বিল, আর টুকরো-টুকরো জঙ্গল, ছোট-খাট দু-চারটে পাহাড়ও আছে। এসব জায়গায় আগে গ্রাম ছিল, লোকের বসতি ছিল, কালাজ্বর আর নাগাদের ভয়ে এখন উজাড় হয়ে গেছে, আর যত জানোয়ারের বাসভূমি হয়েছে। হরিণ, মহিষ, মিথন, শূয়োর, বাঘ, ভাল্লুক আর কোনো-কোনো জায়গায় হাতিও দেখতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত শিকারের প্রশস্ত জায়গা, অনেক সাহেবসুবো এখানে শিকারের জন্য এসে থাকেন।

জরীপওয়ালার শিকার খেলবার সময় নেই। কিন্তু পাহাড়ে, জঙ্গলে নালায়-নালায় ঘুরে জরীপ করতে হয়, কাজেই তাদের চোখে শিকার পড়ে ঢের। হয়তো বা মাথা ঘুলিয়ে যায়, নয়তো মারবার অবসর পায় না, কখনো বা সাহসে কুলোয় না, আবার কখনো বা নিরস্ত্র অবস্থা, একেবারে লি হাত। সব রকম অবস্থাতেই পড়েছি। ঘটনার পর ভেবে দেখেছি যে ঐ অবস্থাটাই ঐ বিশেষ ঘটনার উপযুক্ত ছিল। অন্য অবস্থা বা ব্যবস্থা হলে হয়তো বিশেষ বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা ছিল।

দু-একটা ঘটনা শুনলে বুঝতে পারবে ব্যাপারটা কেমন হয়।

আমার সঙ্গে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ছিলেন। নতুন কাজ

শিখছেন, আমি তাঁর কাজ দেখতে গিয়েছি। খালাসীরা ছুটি নিয়েছে, কাল হোলি, কাজে যাবে না।

ভদ্রলোক বললেন, "চলুন শিকারে।"

"বহুৎ আচ্ছা।"

ভোরে দুজনে হাতি চড়ে বেরোলাম। তিনটে হাতি, একটাতে আমি, একটাতে তিনি আর একজন গ্রামের শিকারী, আরেকটা হাতি দরকার মতো জঙ্গল ভাঙবে, জানোয়ারের পথ আগলাবে। তিনদিকে পাহাড়, একদিকে ধানখেত, তার মাঝখানে ঘাস, খাগড়া, বিল ইত্যাদি। একটা নোনা মাটির জায়গাও তার মধ্যে আছে।

আমরা ধীরে-ধীরে জঙ্গলের কিনারা ধরে চলেছি। একটা প্রকাণ্ড শূয়োর সামনে পড়েছিল কিন্তু তার উপর গুলি চালানো হয়নি, হরিণের লোভ আমাদের। কিন্তু আর কোনো জানোয়ারই চোখে পড়ছিল না। সকলেই আশ্চর্য হয়েছি, বিশেষ করে শিকারী, কারণ এটা শিকারের পক্ষে আদর্শ জায়গা। জানোয়ারের পায়ের দাগও আছে ঢের, শূয়োর, হরিণ, মিথন। আজ কিন্তু ঐ শূয়োরটা ছাড়া আর কোনো জানোয়ারই দেখতে পেলাম না।

ক্রমে সূর্য দেখা দিল। আর কেন? এবার ফিরি। হঠাৎ শিকারী হাত দিয়ে সামনে ইশারা করল। দু-চারটে ঘাস একটু-একটু নড়ছে, যেন কোনো জানোয়ার পাশ কাটিয়ে সরে পড়ছে। পাছে ওটা জঙ্গলে ঢুকে পড়ে সেই ভয়ে আমরা প্রথমেই তাড়াতাড়ি জঙ্গলের দিকটা ঘিরে ফেললাম। এক পাশে সেই ভদ্রলোক, এক পাশে আমি, আর মাঝখানে অন্য হাতিটা, তিনটে হাতির মাঝে-মাঝে আট-দশ ফুট ব্যবধানও নেই।

ঘাস নড়াটা তখন অন্যমুখী হয়ে, এক টুকরো আট-দশ ফুট লম্বা-লম্বা ঘাসের জঙ্গল ছিল, তার মধ্যে ঢুকে থেমে গেল। এর পিছনেই ছোট-ছোট

ঘাস। আমরাও মনে-মনে ভাবলাম, ভালোই হল, এদিকে আমরা, ওদিকে ছোট ঘাস, বেরোলেই চোখে পড়বে আর মারব।

আমাদের হাতি লম্বা ঘাসের জায়গাটার মধ্যে প্রায় ঢুকে পড়েছে হঠাৎ মাঝের হাতিটা ফ্যাঁশ করে নাকে শব্দ করে একেবারে ঘুরে দাঁড়াল—এই ভাগে আর কি! তার ঘাড়ে পাকা মাহুত, কানে অঙ্কুশ লাগিয়ে জবরদস্তি তাকে আটকিয়ে ধরেছে। আমাদের হাতি দুটোও চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

মাঝের হাতির মাহুত হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—"বাঘুয়া! এত্তা বড়া দুম!" সঙ্গে-সঙ্গে তার হাতি চিৎকার করে, মলমূত্র ত্যাগ করে, একাকার! চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে, বন্দুক ঘুরোতে-না-ঘুরোতে, বাঘটা হামা দিয়ে ঐ হাতির পেটের তলা দিয়ে গলে বেরিয়ে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য!

হাতি বেচারারা লাটিমের মতো তিন-চারবার ঘুরপাক খেল, সামলাতে না-সামলাতে শিকার ধোঁয়ার মতো কোথায় মিলিয়ে গেল!

একবার মাত্র একটা হলদেপানা জীব আমাদের চোখে পড়ল কি না-পড়ল। ঐ হাতিটার মাহুত আর শিকারী ছাড়া কেউ ভালো করে দেখতেও পেল না।

একেই বলেছিলাম—হয়তো মারবার অবসরই মিলল না। ঐ বাঘটা বেরোবার পর বুঝলাম এতক্ষণ কেন অন্য কোনো জানোয়ারের গন্ধ পাইনি। শূয়োরটাকে যে দেখেছিলাম, তার কথা আলাদা, সে বাঘ-টাঘ গ্রাহ্য করে না। সকলেই তার সঙ্গে হিসেব করে চলে। কথায় বলে সঙ্গী ছাড়া যে শূয়োর চলে, সে মত্ত হাতির চেয়েও ভীষণ।

আরেকদিন ঐ ভদ্রলোকেরই কাজ দেখতে গিয়েছি। মাস শেষ হয়েছে, সারা মাসের রিপোর্ট তৈরি করতে হবে, সেজন্য দুদিন সেখানে থাকতে

হবে। ভদ্রলোক বললেন, "কাল রবিবার, এক-আধটা হরিণ মারতে পারলে খালাসী বেচারারা খেতে পেত।"

বললাম, "আচ্ছা, চল, যাব।"

ভদ্রলোক একজন শিকারী যোগাড় করলেন। ভোরে উঠে আমরা শিকারে চলেছি, সঙ্গে তিনটে হাতি। এক হাতিতে আমি, একটাতে শিকারীর সঙ্গে উনি। ভদ্রলোক একটু বেখাপ্পাভাবে বসেছেন, দুপা-ই তাঁর একদিকে, হাতির মাথা পড়েছে তাঁর এক পাশে। ডেকে বললাম, "অমন করে বস না, শিকারের সুবিধা হবে না। খালি একদিক দেখতে পাবে, অন্যদিক দিয়ে জানোয়ার বেরোলে তোমার পিছনে পড়বে, ঘুরে মারতে-মারতে সে চলে যাবে। আর যদি কোনো কারণে হাতি ভড়কে গিয়ে হঠাৎ দৌড় দেয়, তাহলে উল্টে পড়ে যাবে।"

তিনি তো হেসে খুন—"নহি জী, কভি নহি গিরেঙ্গে।"

হাওদা-টাওদা নেই। আমি মাহুতের ঠিক পিছনে, দুদিকে দুই পা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ার মতো বসেছি। তিনি বললেন অমন করে বসা বড় কষ্টকর।

শিকারী আমাদের সামনে একটা গাছ দেখিয়ে মাহুতকে বলল, "এখানটাতে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢোক।" আর সঙ্গে-সঙ্গে ধপ করে একটা ভারি জিনিস পড়ার শব্দ! আমার পিছনের হাতিটাও খুব ছটফট করতে লাগল।

মুখ ফিরিয়ে দেখি ভদ্রলোক ঘাসের মধ্যে চিতপাত! হাতির মুখ তাঁবুর দিকে, মাহুত তার কানে অঙ্কুশ লাগিয়ে ধরে রেখেছে, হাতি তো পালাতে পারলে বাঁচে!

"কেয়া হুয়া রে?"

মাহুত বলল, "হুজুর, শিকারী বোলা ডাইনে যাও, আউর ছোটা এব

সোই (গোসাপ) নিকল কর্ হাথিকা সামনেসে ভাগা ! হাথিভি মোড় কর্ খাড়া হুয়া, সাহাব ভি উলট্ কর্ গির্ গয়ে ! বড়ি মুশকিলসে রোকা হুঁ হাথিকো ।”

ভালো ! যা সাবধান করে দিয়েছিলাম, তাই হল !

শিকারের জায়গায় তো ঢুকলাম। বড়-বড় ঘাস, মাঝে-মাঝে আমলকি গাছ আর চারদিকে জঙ্গল। শিকারীর নির্দেশমতো ভদ্রলোক শিকারীর সঙ্গে একদিকে গেলেন, আমি অন্যদিকে গেলাম। পঞ্চাশ গজও যাইনি আর পিছনে গুড়ুম-গুড়ুম বন্দুকের আওয়াজ। মাহুত তৎক্ষণাৎ হাতি ফিরিয়ে ঐদিকে ছুটল। সামনেই ভদ্রলোক একটা আমলকি গাছের পাশে, হাতির পিঠে হাঁ করে বসে আছেন !

“আরে, কী মারলে ? শিকার কই ?”

মাহুত বলল, “হুজুর, বড়ি জবর সামর (সম্বর) থা, মাথে পর ইয়া বড়া ঝাড় ! গোলি নহি লাগা হোগা, ভাগ গিয়া ।”

রক্তের দাগ খুঁজবার জন্য আমিও নামলাম, শিকারীও নামল। বলল, “ঐখানে দাঁড়িয়ে আমলকি খাচ্ছিল আর সাহেব ঐখান থেকে গুলি করেছেন ।”

মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ ফুট দূরে, গুলি লাগেনি হতে পারে কি ? দেখতে গেলাম কী ব্যাপার ! গিয়ে দেখি আমলকীগাছের নিচে গোটা দু-চার ছোট-ছোট গাছ, সেগুলির বড়-বড় পাতায় অসংখ্য ফুটো, ছিটার দাগ !

“ওকি, এ কী করেছ ? ছররা মেরেছ নাকি ?”

তিনি তো বন্দুক খুলে একেবারে হাঁ ! নতুন শিকারী, তাড়াহুড়োতে পাঁচ নম্বর ছররা মেরে বসেছেন।

বলা বাহুল্য সেদিন আর শিকার মিলল না।

একেই বলেছিলাম—কখনো বা মাথা ঘুলিয়ে যায়।

যেখানে এই সব কাণ্ড হচ্ছিল, তার একটু পুবেই শিবসাগর জেলার সীমানা। এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বর্গ মাইল জায়গা বাঘের ভয়ে উজাড় হয়ে গিয়েছিল। মানুষ খেকো বাঘ। দশ-বারোটা গ্রামের লোক ঘরদোর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আমাদের লোক যখন সে জায়গা জরীপ করতে গিয়েছিল তখনো ঐ এলাকা উজাড়! মানুষখেকো বাঘের ভয়ে মিকিররা কেউ ওর ভিতরে যেতে চায় না। একটা বাঘ কয়েক মাস আগে মারা পড়েছে বটে, কিন্তু মিকিররা বলে যে বাঘ দুটো ছিল, একটা মারা পড়েছে বটে কিন্তু একটা তো এখনো আছে, গেলেই ধরে খাবে।

আমার একজন গুর্খা সার্ভেয়ারকে ঐ জায়গাগুলো জরীপ করতে পাঠিয়েছিলাম, তার সঙ্গে বন্দুক। পাহারা দেবার জন্য আরেকজন গুর্খাকেও সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল।

জায়গাটুকু জরীপ হওয়া মাত্র আমি সার্ভেয়ারের কাজ দেখতে গেলাম। অনেক বুঝিয়ে, বাইরের অন্য গ্রাম থেকে দশ-বারোজন কুলি সঙ্গে নিয়ে গেলাম।

দুদিন ঐ জঙ্গলে ছিলাম, কিন্তু পরিত্যক্ত গ্রাম আর খেত আর জঙ্গল ছাড়া কিছু দেখিনি। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পর মশাল জ্বেলে, এক গ্রামে পৌঁছলাম। ঐ গ্রামের লোকেরাও জঙ্গল থেকে পালিয়ে গেছে, এই এলাকার বাইরে নওগাঁ জেলায় নতুন গ্রামের পত্তন করেছে। গ্রামের প্রধানের একমাত্র ছেলেকে ঐ মানুষখেকো বাঘ খেয়েছিল। প্রধান পুত্রশোকে মরিয়া হয়ে, ছেলের মৃতদেহের উপর একটা বাঘকে মেরে ফেলেছিল। এই সব কাহিনী যখন শুনছিলাম তখন প্রাণের ভিতর যে কেমন করছিল, বলতে পারি না।

শুনলাম বাঘের ভয়ে তো লোকজন সকলেই নিজের-নিজের ঘরদোর, খেত, ফসল, সমস্ত ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তৈরি ফসল ফেলে

এসেছে বলে অনেকেই বড় কাতর হয়েছিল। প্রধানের তুলোর খেত ছিল ঐ পাহাড়ে। একেবারে তৈরি ফসল, তুলে আনলেই হল।

ফেলে এসে তাদের মন বড় ব্যস্ত ছিল, বিশেষত প্রধানের ছেলের। একদিন সকালে সে বলল, "দেখে আসি খেত সব কেমন আছে।"

প্রধান বারণ করল, গ্রামের লোকরাও মানা করল কিন্তু সে কারো কথা শুনল না। বন্দুক ঘাড়ে করে চলে গেল। বলে গেল, "এক নজর দেখেই ফিরে আসব।"

গেল বটে, কিন্তু আর ফিরে এল না। তিন-চার ঘণ্টা অপেক্ষা করে প্রধান তো একেবারে পাগলের মতো হয়ে উঠল। অনেক মিনতি করে দু-চারজন লোক সংগ্রহ করে দেখতে গেল কি ব্যাপার। খেতের পাশে গিয়েই দেখতে পেল বন্দুকটা পড়ে আছে। একটু এগিয়ে দেখল তার মাথার পাগড়ি আর রক্ত। আরেকটু সামনেই কি যেন একটা পড়ে আছে, লতাপাতা দিয়ে ঢাকা, আর মাছি ভনভন করছে।

দেখেই তো সঙ্গীরা পালিয়ে গেল। প্রধান কত কাকুতি-মিনতি করল, কেউ তার কথায় কান দিল না। তখন সে একাই দু-পা এগিয়ে দেখল সত্যিসত্যিই তার ছেলের দেহটা পড়ে আছে, ঘাড়ে কামড়ের দাগ, খানিকটা খেয়ে ফেলেছে।

সে গ্রামে ফিরে এল। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে প্রত্যেকটি লোককে কত সাধ্যসাধনা করল, "চল আমার সঙ্গে, বাঘটাকে মারব।" কিন্তু কেউ রাজী হল না। তখন সে চার-পাঁচটা বন্দুক চেয়ে নিয়ে একাই আবার ঐ তুলোর খেতে চলে গেল। সকলে কত বারণ করল, ভয় দেখাল, কিছুই শুনল না। একমাত্র ছেলেকে বাঘে নিয়েছে, তার আর বেঁচে লাভ কি? এ বাঘ সে মারবেই।

তুলোর খেতে পৌঁছে, মৃতদেহের উপর সরু-সরু দড়ি দিয়ে বেঁধে,

চারপাশে চারটে গুলিভরা বন্দুক পেতে রাখল। বাঘ এসে দেহটা ধরে টানবামাত্র ঐ চারটে বন্দুক একসঙ্গে ছুটে যাবে। তাতেও যদি কোনো কারণে বাঘ না-মরে, সেইজন্য নিজে একটা বন্দুক ভরে নিয়ে, কাছে একটা ছোট গাছে উঠে বসে রইল।

বেলা চারটে বাজতে-না-বাজতে বাঘ এসে হাজির। তার ভয়ে দেশসুদ্ধ লোক পালিয়েছে, সুতরাং তার আর ভয়-ভাবনা কিছুই নেই। সোজা একেবারে মৃতদেহের কাছে। বোধহয় সে জায়গায় কিছু দেখে তার কোনোরকম সন্দেহ হয়েছিল, সেইজন্য দু-চারবার জোরে হাঁক দিল, তারপর দেহটা ধরে টান দিল। চারটে বন্দুক একসঙ্গে গর্জে উঠল, সঙ্গে-সঙ্গে প্রধানের বন্দুকটাও ছুটল। বাঘটা একবার মাত্র লাফিয়ে উঠে, মাটিতে পড়ে, দু-চারবার ঘড়ঘড় শব্দ করে একেবারে চুপচাপ।

প্রধান আবার বন্দুক ভরে নিয়ে গাছ থেকে নেমে দেখল সব শেষ হয়েছে। তখন সে দৌড়ে গিয়ে সকলকে খবর দিল। লোকজন গিয়ে বাঘটাকে বয়ে আনল। পাহাড়ের উপর দেবতার পুজো দিল। ঐ পাহাড়ে কিন্তু আর তারা ফিরে যায়নি, তাদের বিশ্বাস একটা বাঘ মরেছে, কিন্তু আরেকটা তো আছে, গেলেই ধরে খাবে।

ঐ এলাকায় কাজ করবার সময় আমি একটা বড় বোড়া সাপ মেরেছিলাম। যমুনা নদীর ধার দিয়ে রাস্তা, আমি বেরিয়েছি কাজে। সঙ্গে ঘোড়ার সহিস ও আরেকজন খালাসী। পথে শিকার পাওয়া যায়—হরিণ, বনমোরগ, হরিয়াল, বুনো পায়রা ইত্যাদি। পথের ধারে একটা বটগাছে ফল পেকেছে, আর তাতে ঢের পাখি। বন্দুক হাতে ধীরে-ধীরে আমি গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। গাছে অনেক হরিয়াল। লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়লাম, দুটো হরিয়াল পড়ল। একটা আমার পায়ের কাছেই পড়ল,

আরেকটা ঐ বটগাছের একটা প্রকাণ্ড ডাল পড়েছিল, তার পিছনে পড়ল।

সঙ্গের খালাসীটাকে বললাম, "ওটাকে খুঁজে আন্।" ডালটা প্রায় তিন-সাড়ে-তিন ফুট উঁচু। খালাসী সেটাকে ডিঙিয়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই "বাপ রে বাপ" বলে আবার লাফিয়ে ডালটা পার হয়ে এসে দে দৌড়! আমি তাকে ধরে জিগগেস করলাম, "কেয়া হ্যায় রে?"

"বড়া জবর সর্‌প্ হ্যায় হুজুর।"

আমার তো বিশ্বাসই হয় না। বললাম, "কেয়া সর্‌প্! তোমকো খা ডালেগা?"

"হুজুর, এতনা মোটা হ্যায়," বলে নিজের উরু দেখাল। আমি খুব সাবধানে ডালটার উপর চড়লাম, আর তার চেয়েও বেশি সন্তর্পণে ওধারে নামলাম। খালাসী বলতে লাগল, "গাছের গোড়ায় দেখুন হুজুর।"

চেয়ে দেখি প্রকাণ্ড একটা বোড়া সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। তার মাথা আর লেজ দেখা যায় না, কুণ্ডলীপাকানো ঢিবিটা প্রায় আমার কোমর সমান উঁচু। বন্দুকে পাঁচনম্বর আর আটনম্বর ছিটা ভরা ছিল। পাঁচ-ছয় ফুট দূর থেকে সাপের শরীরের সব চেয়ে মোটা অংশটা লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়লাম। আর অমনি, বাপ! কুণ্ডলীর সব উলট-পালট হতে লাগল, আর তার মাঝখান থেকে প্রকাণ্ড মাথা বিকট হাঁ করে বেরোল।

আমি এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম। গুড়ুম করে অন্য নাল ছেড়ে দিলাম, আর সাপটার মাথার উপরের অংশটা উড়ে গেল। আটনম্বর ছিটা, পাঁচ-ছয় ফুট দূর থেকে মেরেছিলাম, কয়েক মিনিটের মধ্যে সব ঠাণ্ডা।

ততক্ষণে অন্য খালাসীরাও এসে জুটেছে। বললাম, "ওটাকে টেনে বাইরে আন্।"

কেউ ছোঁবে না, সাপ, বাবা! অগত্যা আমিই লেজ ধরে টেনে সাপটাকে রাস্তার উপর আনলাম। কাছে গ্রাম ছিল, গ্রামের লোকরাও ছুটোছুটি করে এসে হাজির হল। তারা তো মহা খুশি! বলাবলি করতে লাগল: "এইটে আমার একটা বাছুর খেয়েছে!" "আমার দুটো ছাগল খেয়েছে!"

গাঁওবুড়ো (প্রধান) বললে, "হুজুর, আরও একটা আছে। সেটাকেও যদি মেরে দিতে পারতে, বড় ভালো হত।"

আমি বললাম, "দেখিয়ে দাও, মেরে দিচ্ছি।"

তখন তো আর সেটা সেখানে উপস্থিত নেই, আমিও আর অপেক্ষা করতে পারি না, কাজেই তাকে আর মারা হল না।

যেটা মেরেছিলাম সেটা সাড়ে-এগারো ফুটের উপর লম্বা ছিল।

আরেকবার মিকির হিল্‌স্‌-এ আরেকজন সার্ভেয়ারের কাজ দেখতে গিয়ে বেশ তামাশা হয়েছিল। সার্ভেয়ারের তাঁবু প্রায় আট মাইল দূরে। তাকে খবর দিয়েছি যে সকালে সাতটা-সাড়ে-সাতটার মধ্যে, মাঝ-রাস্তায় একটা উঁচু পাহাড় ছিল, তার চুড়োয় যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, আমি তার কাজ দেখব। ভোরে উঠে বেরিয়েছি, সাতটা-সাড়ে-সাতটার মধ্যে চার মাইল পাহাড় চড়তে হবে। দেড় মাইল আন্দাজ গিয়েছি আর সামনেই রাস্তার পাশে বাঁশঝাড়ের নিচে বেজায় হুটোপুটি! লোকজন থমকে দাঁড়াল, কোথায় পালাই, ওটা না জানি কী! আমি ঘোড়া থেকে নেমে বন্দুক হাতে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হলাম। পাঁচ-সাত কদম গিয়েছি আর সমস্ত বাঁশঝাড নাড়া দিয়ে, জঙ্গল তোলপাড় করে, লাফিয়ে উঠল সাত-আটটা প্রকাণ্ড হনুমান, এক-একটা প্রায় একজন দশ-বারো বছরের ছেলের সমান উঁচু। কি রকম চটে গিয়েছিলাম তা বুঝতেই পারছ। মনে

করেছিলাম বুঝি বা হাতি! গ্রামের লোক সাবধান করে দিয়েছিল ঐ রাস্তায় একটা পাগলা মক্‌না (দন্তহীন পুরুষ) হাতি আছে, আমরা যেন বিশেষ হুঁশিয়ার হয়ে যাতায়াত করি।

সমস্তদিন পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে সার্ভেয়ারের কাজ দেখে, বেলা চারটের সময় তার তাঁবুতে পৌঁছলাম। এবার ফিরবার পালা।

আট মাইল রাস্তা। পাহাড়ের চড়াই-উতরাই আছে, রাস্তাও খারাপ, তার উপর আবার পাগলা হাতিও আছে। লম্বা-লম্বা পা ফেলে চললাম, সন্ধ্যার আগে তাঁবুতে পৌঁছতে হবে। কি জানি অন্ধকার হলে আবার না কোনো বিপদ ঘটে।

বড় পাহাড়টা পার হয়ে নিচে নেমেছি, সেই জায়গায় যেখানে ভোরে হনুমান দেখেছিলাম। আগে-আগে একজন খালাসী—শ্যামলাল—বন্দুক ঘাড়ে। তার পিছনে আমি ঘোড়ার উপর। আমার পিছনে ঘোড়ার সহিস অলক, তার পিছনে আরও তিন-চারজন খালাসী। সূর্য ডোবে-ডোবে, সকলে মাটির দিকে মুখ করে তাড়াতাড়ি চলেছি। হঠাৎ শ্যামলাল "বাপরে!" বলে পিছন ফিরে দে দৌড়!

অলকের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সে তাকে ধরে ফেলল। আমিও ঘোড়া থেকে নেমে, তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিলাম। সে বেচারা থরথর করে কাঁপছে।

"ছাড়, হুজুর! ভাগো, জবর হাঁথি!"

"কোথায় রে হাতি?"

"ঐ বাঁশঝাড়ের নিচে!"

বন্দুকে ছিটে ভরে পা টিপে-টিপে এগোলাম, মাত্র তিন-চার পা, আর কিছুই দেখা যায় না। আমার পনরো-কুড়ি ফুট সামনে একটা ঝোপ ছিল, সেটা যেন একটু নড়ল, অমনি আমি ঐ ঝোপটার পাশের মাটি লক্ষ্য করে,

বন্দুকের আওয়াজ করলাম। বন্দুকের আওয়াজ হওয়া মাত্র, বিকট চিৎকার করে, প্রকাণ্ড এক মক্‌না হাতি একেবারে রাস্তার উপর এসে হাজির হল। রাস্তার উপর এসেই আমাদের দিকে মুখ ফেরাল, আর সঙ্গে-সঙ্গে আমিও পরপর দুবার বন্দুকের আওয়াজ করলাম—ছর্‌রা, মাটি লক্ষ্য করে। হাতিটাও অমনি লাটিমের মতো ঘুরে, রাস্তায়-রাস্তায় দে দৌড়! আমিও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্দুক ভরে নিয়ে, হাতির পিছনের পায়ের কাছে, মাটি লক্ষ্য করে আবার দুবার বন্দুকের আওয়াজ করলাম। আর যাবে কোথায়? কি কুকাজই হাতিটা তখন করে ফেলল! আমাদের রাস্তা দিয়ে চলাই তখন মুশকিল হল, এই হোঁচট খাই কিম্বা পা পিছলে পড়ে হাত-পা ভাঙি আর কি!

ঐ মিকির হিল্‌স্‌-এর পাহাড়ে মিকিরদের ছোট-ছোট গ্রাম আছে, দু-চারটে নাগা বস্তিও আছে, দু-একটা পাকডাণ্ডি রাস্তা আর ঘোর জঙ্গল, আর নানারকম জানোয়ার। ঐ জঙ্গলে দু-তিন জায়গায় আমি 'পুং' অর্থাৎ গন্ধকের উৎস দেখেছি। ঐ সব জায়গায় বেলা দুটোর সময়ও জানোয়ার দেখতে পাওয়া যায়।

এখানকার একটা 'পুং'-এর কাছেই আমার এক সার্ভেয়ারের ডেরা ছিল। তাকে বড় সন্তর্পণে যাতায়াত করতে হত, ভয়ে-ভয়ে রাত কাটাতে হত, সারারাত প্রকাণ্ড ধুনি জ্বেলে রাখতে হত। জানোয়াররা কিন্তু তবুও ঐ 'পুং'-এ আসত। একদিন রাত্রে বৃষ্টিতে ধুনি নিভে গিয়েছিল। হঠাৎ একজন খালাসীর ঘুম ভেঙে গেল, তাঁবুর বাইরে ধুনির আলো নেই দেখে সে ধুনিটা উস্কিয়ে দেবার জন্য বাইরে এল।

ওরে বাবারে! বড়-বড় দুটো হাতি ধুনির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁবুগুলোকে দেখছে! ধুনি নিভে গেছে। খালাসীর চিৎকারে আর সকলে জেগে চেঁচাতে আরম্ভ করল, তখন হাতি দুটো চলে গেল।

পরদিন আমি সার্ভেয়ারের তাঁবুতে গিয়ে হাতির পায়ের দাগ দেখেছিলাম। কেন যে তাঁবু মাড়িয়ে চ্যাপটা করেনি, সেটাই আশ্চর্যের বিষয় !

ঐখানে তাঁবু রেখে সার্ভেয়ারকে একবার তিন-চারদিনের জন্য অন্য জায়গায় কাজ করতে যেতে হয়েছিল। সে একটা তিরপল সঙ্গে নিয়ে গেল, আর জিনিসপত্র পাহারা দেবার জন্য দুজন খালাসীকে রেখে গেল। সঙ্গের মিকির কুলিরা বলল, ঐ জঙ্গলে মাত্র দুজন লোককে রেখে যাওয়া নিরাপদ নয়। তারা কুড়ি-বাইশ ফুট উঁচুতে একটা মাচা বেঁধে দিল, রাত্রে খালাসীরা ঐ মাচায় শোবে।

একদিন বেশ কেটে গেল। দ্বিতীয় দিন একজন খালাসী নালায় জল আনতে গিয়ে দেখল যেন একটা বার্কিংডিয়ার তাঁবুর দিকে আসছে। দ্বিতীয় খালাসী রান্নার যোগাড়ে ছিল, সে একবার তাকিয়েই দে দৌড় !

"ভাগ্ ! ভাগ্ ! শের আতা হ্যায় !"

দুজনে দৌড়ে গিয়ে মাচায় উঠল। এদের হুড়বড়িতে বাঘেরও চোখ পড়েছে ওদের উপর, সেও লাফিয়ে দেখতে এল ব্যাপার কি ! খাওয়া-দাওয়া চুলোয় গেল। তারা কত চিৎকার করল, বাঘ কি তা শোনে? ঐ তাঁবুর সামনে বসে রইল। সমস্ত দিনটাই পাহারা দিল। রাত্রেও ছিল কিনা সেটা তারা বলতে পারল না, অন্ধকার রাত ছিল, দেখতে পায়নি।

পরদিন সকালে দেখে—শর্মা তো হাজির আছেনই, আবার একটি সঙ্গীও এনে জুটিয়েছেন ! সেদিনও বেচারাদের উপবাস ! মাচার উপর বাঁশের চোঙায় জল ছিল, তাই রক্ষা। তৃতীয় দিন বিকেলবেলা সার্ভেয়ার ও তার লোকরা ফিরে এল, তাদের গলার আওয়াজ পেয়েই বাঘ দুটো চলে গেল।

মিকির হিল্‌স্-এ কাজ করবার সময় আমার প্রধান আড্ডা ছিল কল্যাণীতে। একবার এক সাহেব কল্যাণীর ফরেস্ট বাংলোতে চার

সপ্তাহ ছিলেন। তিনি শিকার করতে এসেছিলেন, বাঘ মারাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। গাছের উপর মাচায় বসে তিনি অনেক রাত কাটিয়েছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় একটা বাঘও মারতে পারেননি। অথচ সে এলাকায় বাঘ আছে, কতবার আমাদের সামনেই পড়েছে।

একদিন রবিবার, কাজে যাব না। ভোরে উঠেই বন্দুক হাতে বেরিয়েছি, বনমোরগ মারব। গ্রামের পাশেই ধানখেত, তার দু পাশে পাহাড় আর জঙ্গল, আর এক পাশে কল্যাণী নদী। জায়গায়-জায়গায় পাকা ধান সবে কাটতে আরম্ভ করেছে। আমি আর একজন খালাসী ধীরে-ধীরে জঙ্গলের কিনারায়-কিনারায়, আলের উপর দিয়ে চলেছি। একজন লোক রাত্রে খেত পাহারা দিয়ে গ্রামে ফিরছিল, সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ঐখানে মোরগ নেমেছে। আমরাও সেইদিকে চললাম। দু-একটা ধানের গোছা নড়ছে আর মাঝে-মাঝে দু-একটা মোরগের লালঝুঁটিও দেখা যাচ্ছে।

চলতে হচ্ছে অতি সাবধানে, মাটিতে চোখ রেখে। সরু আল, দেড়-ফুট দু-ফুট উঁচু, পড়ে যাবার ভয় আছে। এক জায়গায় আলের উপর আট-দশটা লম্বা-লম্বা খাগড়া। আমরা সেই খাগড়ার ঝোপটাকে আট-দশ ফুট তফাতে রেখে পাশ কাটিয়ে পার হয়েছি, আর থপ্ করে কাদায় বড় মাটির ঢেলা পড়বার মতো একটা আওয়াজ হল। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম বাঘ! চিতা বাঘ। সেও মোরগ খাবার জন্য খাগড়ার আড়ালে ওৎ পেতে বসেছিল। হঠাৎ আমরাও এসে পড়েছি আর সেও লাফ দিয়ে নিচে নামল। তারপর ভারিক্কি চালে জঙ্গলে চলে গেল, দৌড়ল না বা একটু ব্যস্ততাও দেখাল না। কিন্তু আমাদের যে সে দেখেছে ও অপছন্দ করেছে তার প্রমাণস্বরূপ তার ঘাড়ের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে উঠেছিল। হাতে বন্দুক ছিল, কিন্তু চালাবার ভরসা হল না, বন্দুকে মোরগ মারবার জন্য দু নম্বর ও পাঁচ নম্বর ছিটা ভরা ছিল।

পরে ঐ সাহেবের সঙ্গে গল্পচ্ছলে যখন আমি ঐ ঘটনাটা বললাম, সাহেব বললেন, "মারলে না কেন ? ছয়-সাত ফুট দূর থেকে দু নম্বর ছিটাই তো ছোট বাঘের পক্ষে যথেষ্ট।" দুঃখ করতে লাগলেন, "আমার যা কপাল ! তিন-চার সপ্তাহ চেষ্টা করেও একটা বাঘ দেখতে পেলাম না !

কল্যাণীতে থাকতে একদিন বাঁদরের এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখেছিলাম। নদীর কিনারায় আমার তাঁবু ছিল। নদীর ওপারে বন, সেখানে একপাল বাঁদর থাকত, চল্লিশ-পঞ্চাশটা কি আরও বেশি হবে। রাতদিন তাদের কিচির-মিচির শুনতাম, অনেক সময় বসে-বসে তাদের তামাশা দেখতাম। একদিন বিকেল বেলায় একেবারে হুলস্থুল ব্যাপার, যেন আবার রাম-রাবণের যুদ্ধ লেগেছে! আমার চাপরাশী এসে বললে, "হুজুর তামাশা দেখুন এসে।"

তাঁবু থেকে বেরিয়ে, নদীর ধারে এসে দেখলাম, ওপারে একটা বড় গাছের উপর সমস্ত বাঁদরগুলো জড়ো হয়েছে আর মহা হল্লা করছে। দূরবীণ লাগিয়ে দেখলাম সব চেয়ে উপরে একটা ডালে প্রকাণ্ড একটা বাঁদর বসে আছে, তার আশে-পাশে আরও তিন-চারটে বড়-বড় বাঁদর, প্রকাণ্ডটা পালের গোদা। তাদের একটু নিচেই, একটা ডালের উপর চার-পাঁচটা বাঁদর অন্য একটা বাঁদরকে জড়িয়ে ধরে আছে। আর সব বাঁদরগুলো দু-তিন ভাগ হয়ে এদিকে-ওদিকে বসেছে। আর কি কিচির-মিচির, কি হল্লা ! ভালো করে দেখে আমার মনে হল ওদের নালিশ ফরিয়াদ চলেছে, বিচারক হল পালের গোদা।

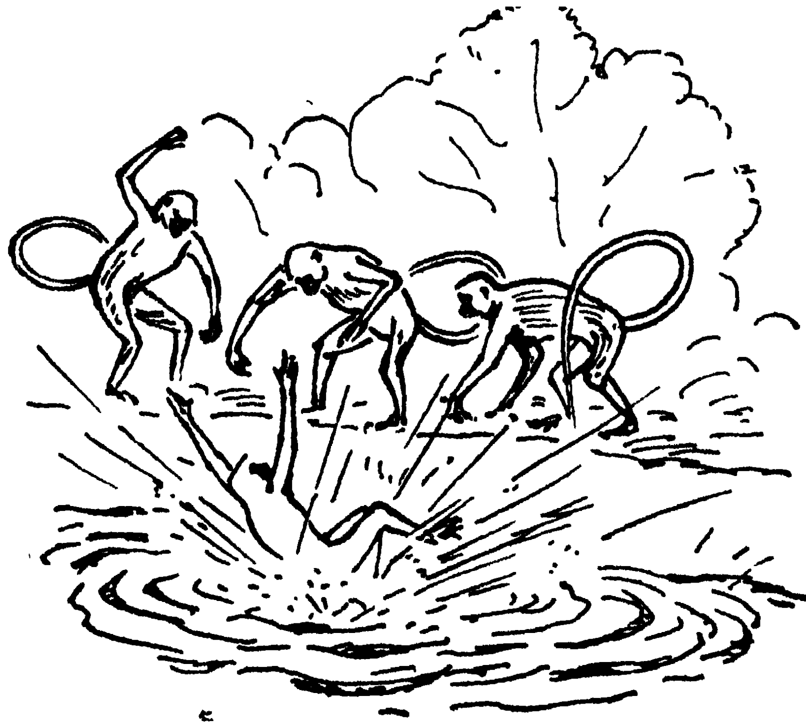
একবার একদল কিচির-মিচির করে, তারপর অন্য এক দল, তারপর পালের গোদা। কিছুক্ষণ ঐ রকম চলল, তারপর গোদামশাই খুব ধমক-চমক করলেন, আর চার-পাঁচটা বাঁদর মিলে ঐ বাঁদরটাকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দিল। কি চিৎকার আর কি আর্তনাদ তার! জলে

ফেলে দেওয়া মাত্র অন্য সবগুলো বাঁদর লাফালাফি করে গাছ থেকে নামল আর নদীর কিনারায় জলের ধারে এসে দাঁড়াল।

ঐ বেচারা যেমন ডাঙায় উঠতে যায়, অমনি তিন-চারটে বাঁদর মিলে ওকে ঠেলে দেয়, তবুও উঠতে চেষ্টা করলে, ধরে চুবিয়ে দেয়। বার কয়েক এমন করে বেচারা যেন শ্রান্ত হয়ে পড়ল। পাহাড়ী নদী, বেশ স্রোত, কতক্ষণ আর লড়বে ? শেষটা অবসন্ন হয়ে স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল, সাঁতরাবার আর শক্তি নেই। আর কি কাতরানি তার ! আমাদেরও দুঃখ হচ্ছিল কিন্তু বাঁদরগুলোর একটুও দয়া হল না। তার সঙ্গে-সঙ্গে নদীর কিনারায়-কিনারায় দৌড়ে যেতে লাগল, আর ও বেচারা কিনারার কাছে এলেই ধমক দিতে আর শাসাতে লাগল।

এক জায়গায় শিকার করতে গিয়ে বড্ড জব্দ হয়েছিলাম। সার্ভেয়ারের কাজ দেখতে গেছি। সামনে জমি, তাতে দু-চারটে ছোট নদী, আর ছোট-বড় বিল অসংখ্য। সব জুড়ে নলখাগড়ার বন, দশ-বারো ফুট উঁচু। বিলের ধারে 'খুঁটি' আছে, তাতে পঞ্চাশ-ষাটটা করে পোষা মহিষ আর সঙ্গে রাখাল। দু-চারটে গ্রামও আছে। বিলের ধারেই আমাদের তাঁবু পড়েছে।

বিকেলে যখন তাঁবুতে পৌঁছলাম তখনো বেশ আলো আছে। কাজ করবার সময় বিলে অনেক হাঁস দেখেছি, একটা হাঁস মেরেছি। তাঁবুতে পৌঁছে সার্ভেয়ারকে বললাম—নৌকো পেলে হাঁস মারতে পারি সার্ভেয়ার 'খুঁটি' থেকে নৌকা যোগাড় করে আনল। আমরা হাঁস মারতে চললাম। সার্ভেয়ারটি মুসলমান, হালাল না করলে খাবে না। তাঁবু থেকে একটু দূরে গিয়ে দেখলাম 'ভেলা' অর্থাৎ গগনবেড় বা পেলিক্যান। ছেলেবেলায় দেশে দল বেঁধে ভেলা উড়ে যেতে দেখেছি, শুনেছিলাম খেতে



বড় উপাদেয়। বড় লোভ হল। প্রকাণ্ড জীব, একটা মারলেই পাঁচ-সাত সের মাংস পাওয়া যাবে।

মাঝিকে বললাম, "ঐ দিকে চল। ভেলা মারব।" ওদের কাছে যেতে বলা যত সহজ, কাছে যাওয়া তত সহজ নয়। আমরা যতই এগোই, পাখিরাও আমাদের দিকে পিঠ করে ততই সরে-সরে যায়। অতি কষ্টে, অনেক কারসাজি করে, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ গজের মধ্যে পৌঁছলাম। আর কাছে যাওয়া যায় না, কোনো অবলম্বন নেই যার আড়ালে লুকিয়ে এগোব। বন্দুকে দু নম্বর ছিটা ভরে, লক্ষ্য স্থির করে, ঘোড়া টিপলাম। বন্দুকের আওয়াজ হবামাত্র সব পাখি আকাশে উড়ে গেল, একটাও পড়ল না। প্রায় সিকি মাইল উড়ে, ওরা আবার জলে বসল। এবার একটু সুবিধা হল, টুকরো-টুকরো নলখাগড়ার ঝোপ ছিল। তার আড়ালে নৌকো চালিয়ে, যখন আবার খোলা জায়গায় বেরোলাম, তখন পাখিগুলো মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে। বন্দুক তুলে আবার ছুঁড়লাম, আবার কোনো

ফল হল না। পাখিও উড়ল, আমিও অন্য নাল ছাড়লাম। তিন-চারটে পালক পড়ল, পাখিগুলো দিব্যি উড়ে গেল। দু নম্বর ছিটা ওদের পালক ভেদ করে শরীরে লাগতে পারল না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, দেড় ঘণ্টা ভেলার পিছনে নষ্ট করেছি, এখন কি আর খালি হাতে ফিরব নাকি? পথে দুটি ছোট হাঁস মেরে নিলাম।

তাঁবুতে ফিরে এলাম, কিন্তু মেজাজটা বড় খাপ্পা। এমন জব্দ আর কখনো হইনি, এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ভোরে যখন ঘুম ভাঙল, তখন চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। বিছানায় শুয়ে একটা ফরফর শোঁ-শোঁ শব্দ কানে আসছিল। জিগগেস করলাম, "কিয়া হ্যায় রে?"

"ভেলা হ্যায়, হুজুর।"

মাথার উপর দিয়ে শোঁ-শোঁ শব্দে শত-শত পাখি, হাঁস ভেলা ইত্যাদি, উড়ে যাচ্ছে। মারা অসম্ভব, কুয়াশায় ভালো দেখা যায় না কত উঁচুতে।

হাত-মুখ ধুয়ে চা খেতে বসেছি। একজন খালাসী এসে খবর দিল, "হুজুর, ভেলা।"

বাইরে এসে দেখি সিকি মাইল দূরে, শত-শত ভেলা সার বেঁধে চলেছে। ক্রমাগত জলে মাথা ডোবাচ্ছে আর তুলছে, শিকারে ব্যস্ত!

আমি আর সার্ভেয়ার আর একজন খালাসী নৌকোতে উঠলাম। আগের দিনের দুরবস্থার কথা মনে ছিল, আজ হুঁশিয়ার হয়ে বন্দুকের এক নলিতে গুলি অন্য নলিতে বাকৃশট্ ভরেছি। দেখব আজও উড়ে যায় কিনা।

ভেলাগুলো বড়ই ব্যস্ত, আমাদের লক্ষ্যই করছে না। আমরা খুব কাছে পৌঁছে গেছি। ত্রিশ-বত্রিশ গজ হবে, তখন তাদের খেয়াল হয়েছে, অমনি আট-দশটা এক সঙ্গে ডানা মেলেছে, উড়ে যাবার ইচ্ছা। আমিও এর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, দু-একটা হয়তো জল থেকে দু-চার ফুট উঠেছে, বেশির ভাগই তখনো জলের উপর, ডানা খোলা

অবস্থায়। তাদের মাঝখানটা লক্ষ্য করে গুলিভরা কার্তুজ ছেড়ে দিলাম। কয়েকটা পাখি এলিয়ে পড়ল, আর বাকিগুলো শোঁ-শোঁ করে উড়ে গেল। দশ-পনরো ফুট না উঠতে বাকৃশট্ ছাড়লাম, আরো কটা ঝুপঝাপ করে জলে পড়ল। যে কটা জ্যান্ত ছিল, সার্ভেয়ার তাদের হালাল করল।

ভেলা তো শিকার করলাম। তাঁবুতে ফিরে সবাইকে ভাগ করেও দিলাম। দু-তিনটে আপিশের বাবুদের জন্য পাঠিয়ে দিলাম। সকলেরই মহা আনন্দ, আজ খুব ভোজ হবে।

সন্ধ্যার সময় কাজ থেকে ফিরে, স্নান করে, খেতে বসলাম। আমার লোকও মাংস রান্না করেছে। কিন্তু মাংস খেতে গিয়ে একেবারে অবাক। এতো মাংস নয়, ঠিক যেন জুতোর চামড়া! আর গন্ধ কি, বাপ! খায় কার সাধ্য!

খালাসীরাও কেউ খেতে পারেনি।

"কেন রে?"

"বহুৎ বদ্‌বো, হুজুর, আউর সিজা নহি।"

সকলের মুখেই এক কথা, মাংস একেবারে অখাদ্য।

হাজারীবাগের ভুঁইয়া, সাঁওতাল, তারাও খেতে পারল না, সে যে কেমন মাংস বোঝাই যাচ্ছে।

কাল রবিবার, কাজে যাব না। সকলেই শ্রান্ত-ক্লান্ত, বিশ্রাম করবে আর কাপড়-চোপড় ধোবে, জঙ্গলে তো আর ধোপা নেই। সন্ধ্যার সময় মাহুত এসে বলল, "হুজুর, গাঁয়ের এই লোক বলছে ঐ পাহাড়ে অনেক ভাল্লুক আছে।"

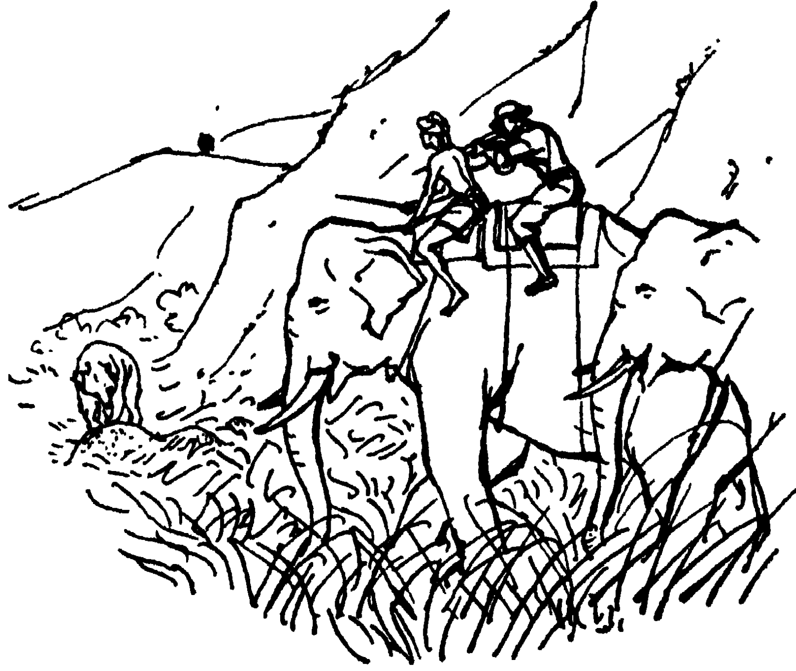
গ্রামের লোকটিও বলল, "খুব ভোরে গেলে ভাল্লুক আর বুনো মোষ দেখিয়ে দিতে পারি।"

পাহাড়টা তাঁবু থেকে মাইল দুই দূরে। দুদিন আগে সন্ধ্যাবেলা ঐ পথে ফেরবার সময় আমিও একটা ভাল্লুক দেখেছিলাম। মাহুতকে বললাম, "আচ্ছা, ভোরে সাড়ে-চারটের সময় বেরোব।"

অন্ধকার থাকতেই বেরোলাম। সঙ্গে দুটো হাতি, গ্রামের লোকটি আর দুজন খালাসী।

প্রথমেই ঐ ভাল্লুকের পাহাড়ে চললাম, সূর্য ওঠার আগে পাহাড়ের নিচে পৌঁছলাম। পাহাড়ের নিচে-নিচে হাতি চলতে লাগল, কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। হঠাৎ গ্রামের লোকটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল একটা উইয়ের ঢিপির গোড়ায় একটা কালো কিছু দেখা যাচ্ছে। হাতি আরেকটু কাছে গেলে দেখলাম একটা ভাল্লুক উইয়ের ঢিপি খুঁড়ছে। উইয়ের ডিম ভালুকের অতি প্রিয় খাদ্য। দশ-পনরো গজ দূরে হাতি, ভাল্লুকটার কিন্তু খেয়ালই নেই, এমনি আহারে মত্ত সে। হাতিটা আরও দু-চার কদম কাছে গেল, আর কাছে যাবার চেষ্টা করলে ভাল্লুকটা পালাবে। বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির করবার চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! নতুন-নতুন হাতি, সম্ভবত ভাল্লুকের গন্ধ পেয়েছে, বড় ছটফট করছে, এক সেকেণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়ায় না। অনেক কষ্টে মাহুত তাকে একটু শান্ত করল, আমিও তাড়াতাড়ি যথাসম্ভব লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টিপলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য! সঙ্গে-সঙ্গে হাতিটাও মাথা নাড়াল, তার ফলে গুলি ভাল্লুকের মাথায় না লেগে, পাঁচ-ছয় ইঞ্চি সামনে উইয়ের ঢিপিতে লাগল। কিছু বালি ছিটকে ভাল্লুকের মুখে পড়ল। 'এত আস্পর্ধা কার'—দেখবার জন্য সে মুখ তুলল, আর হাতি দেখেই 'ঘোঁৎ' শব্দ করে পালাবার ব্যবস্থা করল।

ভাল্লুকের পাঁজর লক্ষ্য করে অন্য নলি ছেড়ে দিলাম। 'হুস' শব্দ করে ভাল্লুকটা ছিটকে লম্বা-লম্বা ঘাসের মধ্যে পড়ল, আর সমস্ত ঘাস তোলপাড় করতে লাগল।



মাহুত বলতে লাগল, "হুজুর, ফের মারো।"

"না, দরকার নেই, পড়েছে।"

ঘাস নড়া থেমে গেল, মরে গেছে। এতক্ষণে হাতি সেই জায়গায় পৌঁছুল, ভাল্লুকের নামগন্ধও নেই। ঘাসের উপর গড়াবার, ছটফট করবার চিহ্ন আছে বটে কিন্তু জানোয়ার নেই। সে হামাগুড়ি দিয়ে ভীষণ কাঁটার ঝোপের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের এক গর্তের মধ্যে ঢুকেছে, মনে হল এইটেই তার আস্তনা—'লেয়ার'।

হামাগুড়ি দেওয়া ছাড়া ওর ভিতরে ঢোকা অসম্ভব। ভাল্লুকের পিছনে ঐ কাঁটা আর গর্তের ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে প্রবৃত্তিও হল না, আমার সাহসেও কুলোল না। ভাল্লুকের চামড়াও আর আমার জুটল না।

আমার হেডকোয়ার্টার কয়েকদিন যমুনামুখে ছিল। ভাল্লুকের ভীষণ কাণ্ড সেখানে দেখেছিলাম। যমুনামুখের একজন ফরেস্ট গার্ড সন্ধ্যার সময় হরিণের সন্ধানে নদীর অপর পারে সরষে খেতে গিয়েছিল। সকালে

সন্ধ্যায় হরিণ সরষের কচি পাতা খেতে আসে। ধীরে-ধীরে জঙ্গলের ধারে-ধারে চলেছে, চোখ চারদিকে ঘুরছে, কোথাও হরিণ বের হয়েছে কিনা। খেতের পাশেই জঙ্গলের ধারে একটা পুরোনো উইয়ের ঢিপি, ঐ ঢিপিটার পাশ দিয়ে যাবার সময় ভাল্লুকের পায়ের দাগ চোখে পড়ল, আর ছোট জানোয়ারের কুঁই-কুঁই ডাকও তার কানে গেল। চারদিক দেখে বুঝতে পারল যে ঐ ঢিপিটার মধ্যে ভাল্লুকের ছানা আছে। সে চুপচাপ চলে এল।

তাদের আপিসে এসে অন্য একজন ফরেস্ট গার্ডকে ভাল্লুকের ছানার কথা বলল, আর দুজনে পরামর্শ করল যে ভোরে তারা কোদাল খোন্তা নিয়ে, হাতিয়ারবন্ধ হয়ে যাবে আর উইঢিপি খুঁড়ে ভাল্লুকের ছানা বের করে আনবে। আপিসের উপরওয়ালাদের আর সে সব কথা জানাল না।

ভোরে উঠে তারা চলে গেল। সেই জায়গায় পৌঁছে একজন হাতের বন্দুক পাশে রেখে, গর্তের মুখ একটু খুঁড়ে নিয়ে, উপুড় হয়ে গর্তের মুখে কান রেখে, ভাল্লুকের ছানা গর্তের ভিতর আছে কিনা শুনতে লাগল। অন্য গার্ডটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখছিল। সে একটা কিছু দেখবার জন্য একটু দূরে সরে গেল, এমন সময় ভীষণ গর্জন করে পিছন থেকে এসে ভাল্লুকী প্রথম গার্ডের পিছন কামড়ে ধরল। লোকটি উল্টে পড়ে গেল আর হাত দিয়ে নিজের মুখটা রক্ষা করবার চেষ্টা করতে লাগল। ভাল্লুকী চিবিয়ে তার হাতখানা একেবারে গুঁড়ো করে দিল। ইতিমধ্যে অন্য গার্ডটি ছুটে এসে হাজির হয়েছে। সে বন্দুক তুলে নিয়ে এক গুলিতেই ভাল্লুকীটাকে মেরে ফেলল। প্রথম গার্ড অজ্ঞান, এ বেচারা দৌড়ে গিয়ে আপিসে খবর দিল আর সকলে মিলে খাটিয়ায় তুলে তাকে নিয়ে এল। তখুনি তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

বহু যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও তার প্রাণরক্ষা হল না।

গোলাঘাট আর বড়পথারের মাঝামাঝি গরমপানিতে গন্ধক-জলের একটা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। অনেক লোক এই গরম জলে স্নান করতে আসে। এর জলে নাকি রোগ নিবারণী শক্তি আছে, বিশেষত চর্মরোগ। সরকারী জঙ্গল বিভাগের একটা বাংলোও সেখানে আছে। ঐ বাংলোয় আমি কয়েকদিন ক্যাম্প করেছিলাম।

একজন সার্ভেয়ারের কাজ দেখতে যাব, আট মাইল দূরে তার ক্যাম্প। ভোরেই ঘোড়ায় চড়ে বের হয়েছি, সঙ্গে আমার সহিস আর একজন লোক। বড়পথারের রাস্তায় চলেছি, ঐ রাস্তায় এক জায়গায় বাঘের ভয়, বাংলোর চৌকিদার দু-একবার আমাকে সে কথা বলেছে আর সাবধান করে দিয়েছে যেন অন্ধকারে হুঁশিয়ার হয়ে চলাফেরা করি। বেশ তাড়াতাড়ি চলেছি। ডাকবাংলো থেকে চার-পাঁচ মাইল পথ গিয়েছি। খুব কুয়াশা। ঘোড়ার পিঠে বসে মনে হতে লাগল—এই জায়গায় না বলেছিল বাঘের ভয়? পরমুহূর্তেই রাস্তার একটা মোড় ঘুরেছি আর কথা নেই বার্তা নেই জঙ্গল থেকে লাফিয়ে থপ করে রাস্তায় পড়ল—বাঘ! একেবারে মুখোমুখী। আমরা তো থমকে দাঁড়ালাম, ভয়ে ঘোড়াটা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল; বাঘটাও 'হুপ' বলে এক লাফ দিয়ে ঝপাং করে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়ল। কে যে বেশি ভয় পেল তা বুঝতে পারলাম না!

এই গরমপানিতে একটা মজার ঘটনা হয়েছিল। কাজকর্ম শেষ হয়েছে, সকল সার্ভেয়ারদের উপর হুকুম হয়েছে: 'গরমপানিতে এসে জড়ো হও, কাল ভোরে আমরা গোলাঘাট যাব।' গোলাঘাটে আমাদের আপিস ছিল।

সন্ধ্যার সময় ইন্দ্রসিং সার্ভেয়ার এসে নালিশ করল, "হুজুর, বক্তাওয়ার সিং-এর সর্বনাশ হয়েছে। কাল রাত্রে তার ৮৭৲ টাকা চুরি গেছে।"

"কি করে চুরি গেল ?"

"হুজুর, টাকা তার তাঁবুর ভিতরে বাক্সে ছিল। ভুলে বালিশের নিচে চাবি ফেলে এসেছিল। কাজ শেষ করে তাঁবুতে ফেরেনি, আমার তাঁবুতে শুয়েছিল। বেলা আড়াইটে-তিনটে নাগাদ তার টিণ্ডেল আর একজন লোক 'পেট ব্যথা করছে' বলে তাঁবুতে চলে যায়। আজ সকালে যখন আমরা বক্তাওয়াসিং-এর তাঁবুতে এলাম, সে আগে চাবি খুঁজেছে, তারপর বালিশের নিচে থেকে চাবি নিয়ে বাক্স খুলে দেখে একটিও টাকা নেই।"

"লোকজন যারা তাঁবুতে ছিল তাদের জিগগেস করনি ?"

"হ্যাঁ হুজুর, আমার সামনেই টিণ্ডেলকে জিগগেস করা হয়েছিল। সে তো চটে গেল—সে কিছু জানে না, তাকে কেন জিগগেস করা হচ্ছে। বাবুর রোটিওয়ালাও (রাঁধুনি) তো তাঁবুতে ছিল।"

বাবুর রোটিওয়ালা বলল যে সে 'লকড়ি' খুঁজতে গিয়েছিল, তখন ঐ টিণ্ডেল আর অন্য খালাসীটা তাঁবুতে ছিল—প্রায় আধঘণ্টা। সব খালাসীদের ডেকে পাঠালাম। অনেক জেরা করলাম। তাদের কথাবার্তার ভাব-ভঙ্গী দেখে, রকম-সকম দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে ঐ টিণ্ডেল বেটাই চোর। কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করে না।

একটুক্ষণ চিন্তা করে আমার চাপরাশী রামাবতারকে ডেকে পাঠালাম, বললাম, "তোমাকে ভোরে গোলাঘাট যেতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নামে চিঠি দিচ্ছি, পুলিশ নিয়ে আসবে। আর ইন্দ্রসিং আর বক্তাওয়ারসিং বাবুদের যত খালাসী আছে সকলকে আটক করতে হবে। যে পর্যন্ত না এই চুরির টাকার একটা কিনারা হয় ততদিন এদের আটক রাখতে হবে। রাস্তায় বাঘের ভয় আছে, মশালের বন্দোবস্ত কর আর তোমার সঙ্গে যাবার জন্য দুজন লোক ঠিক কর।"

তারপর তাড়াতাড়ি দুটো চিঠি লিখে আমার টেবিলের উপর রেখে

দিয়ে বললান, "এই চিঠি নিয়ে যাবে, একখানা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আর একখানা আমাদের বড়সাহেবের। তুমি যাবার সময় এই চিঠি নিয়ে যাবে।"

রাত্রে শুতে যাব এমন সময় চার-পাঁচজন টিণ্ডেল এসে অনেক মিনতি করল, "হুজুর চুরি যেই করুক, একজন করেছে। সকল খালাসীকে আটক করলে বড় জুলুম হবে। ওদের বড় ক্ষতি হবে।"

আমি বললাম, "আমি সেটা জানি না। এ হতেই পারে না যে অতগুলো টাকা চুরি গেল আর কেউ কিছু জানে না। নিশ্চয়ই জানে। সকলে এক জোট হয়ে কিছু বলছে না, এখান থেকে বেরিয়ে গেলে ভাগাভাগি করে নেবে। কাজেই পুলিশ এসে একটা ব্যবস্থা করুক।"

"হুজুর, পুলিশের হাতে দিলে এদের নিজের কামানো পয়সাও সব চলে যাবে।"

"যাক, সব বেটাই চোর এরা, চোরের উপর আমার কোনো সহানুভূতি নেই। তোমাদের যদি অত দরদ হয়ে থাকে তাহলে তোমরা চাঁদা তুলে, বা পঞ্চায়েত করে চোরের কাছ থেকে বাবুর টাকা আদায় করে দাও।" এই বলে আমি তাদের হাঁকিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

গরমপানি থেকে গোলাঘাট চোদ্দ মাইল রাস্তা, তাতে আবার গরমের দিন, কাজেই ভোরে চারটে নাগাদ সকলকে উঠতে হবে। চারটের আগেই গোলমাল আর চেঁচামেচিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি এক জায়গায় চার-পাঁচজন সার্ভেয়ার, হাতির মাহুত, আর অনেক খালাসী জড়ো হয়ে গোলমাল করছে। ডেকে জিগগেস করলাম, "কি হয়েছে?"

ইন্দ্রসিং আর এক বুড়ো সার্ভেয়ার ছুটে এসে বলল, "হুজুর, বক্তাওয়ারসিং-এর টাকা পাওয়া গিয়েছে।"

"কি করে পাওয়া গেল ?"

"দেওয়ানজীর (ঐ বুড়ো সার্ভেয়ারকে সকলে দেওয়ানজী বলে ডাকত) চাকর তাঁর বিছানা বাঁধবার জন্য খাটিয়া ধরে ঠেলেছিল, পাশে হাতিভীম গদি ছিল, তাতে খাটিয়ার ধাক্কা লেগেছিল আর অমনি ঝনাৎ করে গদীর উপর থেকে কয়েকটা টাকা নিচে পড়ে গিয়েছে। আওয়াজ শুনে দেওয়ানজী দেখতে গেলেন কি ব্যাপার। গিয়ে দেখলেন কয়েকটা টাকা মাটিতে পড়ে আছে, আর গদির উপর সারে-সারে অনেক টাকা সাজানো আছে। গুণে ৮৭৲ টাকা সব পাওয়া গেল।"

আমি চাপরাশীকে ডেকে বললাম, "তোমাকে আর গোলাঘাট যেতে হবে না। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেল।"

চিঠিটা ছিঁড়তে গিয়ে দেখি তাতে কিছুই লেখা নেই শুধু হিজিবিজি আঁকা

●১৬● (১৯১৫। আসাম : ডিমাপুর, নাম্বর) বাইশ-তেইশ বছর জরীপের কাজে নানা প্রদেশে গিয়েছি, নানা জায়গায় ঘুরেছি, কত বন-জঙ্গল দেখেছি, কিন্তু আসামের নাম্বরের মতো জঙ্গল কোথাও দেখিনি। জঙ্গল যে এমন বিদঘুটে হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না। অনেক জায়গাই বিশ্রী জঙ্গল আছে কিন্তু তার আগাগোড়া সমস্তটাই এক ধরনের নয়। কোথাও বা অল্প-বিস্তর বেত, কোথাও বা বড়-বড় গাছের বন, আবার কোথাও বা একটু-আধটু খোলা-খালা, কিন্তু নাম্বরে সব অন্য রকম —খালি বেত, আর বেত, আর বেত। যে জায়গায় বড়-বড় গাছ আছে, সেখানেও গাছের নিচে বেত, আর সকল গাছ জড়িয়ে উঠেছে বেত—ষাট-

সত্তর ফুট লম্বা বেতও আছে। এক-এক জায়গায় এমন ঘন বেতও পেয়েছি যে সে বেত কেটে পথ করা যায় না, সুড়ঙ্গ তৈরি করতে হয়, তবে এগোনো যায়।

মনে আছে এক জায়গায় একজন সার্ভেয়ারের কাজ দেখতে গিয়েছিলাম, সঙ্গে দশ-বারোজন খালাসী ছিল। তারা সারাদিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করে মাত্র কয়েক ফুট চওড়া আর ত্রিশ-বত্রিশ জরীপ লম্বা একটি সুড়ঙ্গ-পথ কাটতে সমর্থ হয়েছিল। শেষে হার মেনে চলে আসতে হয়।

একে তো ঐ রকম জঙ্গল, তার উপর আবার জানোয়ারে কিলবিল করছে। বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ, শূয়োর, হাতি—কোনোটাই বাদ যায় না। আর জোঁক? তার কথা না বললেও চলে—এখনো গায়ে কাঁটা দেয় ঐ জোঁকের কথা মনে পড়লে।

সার্ভেয়ার ইন্দ্রসিং-এর কাজ দেখতে গিয়েছি। পথে একটা হরিণ মেরেছি। একটা নদীর ধারে আমার তাঁবু পড়েছে। সন্ধার সময় সার্ভেয়ার এল। রাত্রে সে জায়গায়ই সে থাকবে, সকালে উঠে তার কাজ দেখতে-দেখতে সার্ভেয়ার রণজিৎ সিং-এর ডেরায় যাব। তাদের দুজনের তাঁবু এক জায়গায়। ঘোর জঙ্গল, তাতে আবার অসংখ্য জানোয়ার, সেই জন্য সুবিধা হলেই দুজন সার্ভেয়ার এক জায়গায় তাঁবু খাটায়, তবুও তো বাইশজন লোক রাত্রে এক সঙ্গে থাকবে।

সকালে উঠেই সার্ভেয়ারের লোকেরা নালিশ করল, "হুজুর, আমরা শিকারের ভাগ পাইনি।"

আমি বললাম, "আচ্ছা, আজ যদি শিকার মেলে, সেটা তোমাদের হবে। আমার লোকের কোনো দাবী থাকবে না তার উপর।"

লোকজনদের সোজা পথে রণজিৎ সিং-এর তাঁবুতে পাঠিয়ে দিলাম। বলে দিলাম সন্ধ্যার আগেই যেন দু-তিনজন লোককে লণ্ঠন সঙ্গে দিয়ে,

নদীর রাস্তায় পাঠিয়ে দেয়, অনেক কাজ—আমাদের হয়তো দেরি হতে পারে।

বেশ চওড়া নদী, কিন্তু তাতে জল অতি সামান্য, বালিই বেশি। জলের স্রোত মাত্র ত্রিশ-বত্রিশ গজ চওড়া, বালির মধ্যে এঁকেবেঁকে চলেছে, কখনো বা এপার, কখনো বা ওপার ঘেঁষে। নদীটা প্রায় আড়াইশো গজ চওড়া হবে। জায়গায়-জায়গায় ছোট-ছোট দ্বীপ আছে, তাতে শুধু শরবন। নদীর কিনারাতেও কোথাও-কোথাও ত্রিশ-চল্লিশ গজ চওড়া শরবন।

জঙ্গল কেটে লাইন তৈরি করে চলেছি, দেরি হচ্ছে, লোকজন হয়রান হয়ে পড়েছে। বারোটা-সাড়ে-বারোটার সময় একটা ছোট নালার ধারে বসেছি, কিছু জলোযোগ করব, লোকজনও জল খাবে, 'খৈনী' খাবে। আমার খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে, এমন সময় এক খালাসী এসে বললে, "হুজুর, হরিণ।"

খাওয়া ফেলে তাড়াতাড়ি বন্দুক হাতে ছুটলাম। একটা হরিণ ঝোপের মধ্যে ঘুমোচ্ছিল, আমাদের গোলমালে উঠে পালাচ্ছে। সেটাকে মেরে সার্ভেয়ারের লোকেদের বললাম, "এটা তোমাদের। বয়ে নিয়ে চল, কিন্তু খবরদার যেন গাফিলি না হয়, আমার লোকের ভাগ নেই এতে।"

মহা খুশি হয়ে দুজন খালাসী সেটাকে ঘাড়ে করে চলল।

চারটের সময় আমরা একটা শুকনো নালায় পৌঁছুলাম, তখন সার্ভেয়ার বলল, "হুজুর, আজ এইখানে কাজ বন্ধ না করলে, তাঁবুতে পৌঁছতে পারব না। এই নালা ধরে নদীতে যেতে হবে—প্রায় এক মাইল রাস্তা, তারপর নদী-নদী যেতে হবে দু-আড়াই মাইল রাস্তা।"

কাজ বন্ধ করে চললাম। বিশ্রী পথ—সার্ভেয়ারের কাটা লাইন, তাড়াতাড়ি চলা অসম্ভব। বড় নদীতে যখন পৌঁছলাম তখন সূর্য অস্ত গেছে, যদিও চারদিকে পরিষ্কার আলো, পাহাড়ের মাথায়-মাথায় একটু-

একটু রোদের ছিটেফোঁটা ঝিকমিক করছে। বেশ চওড়া নদী, জলের স্রোত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ চওড়া—এক হাঁটু গভীর আর পরিষ্কার জল।

নদীতে পোঁছেই লোকজন একেবারে বালির উপর বসে পড়ল। বললে, "হুজুর থক্ গিয়া, পানি পিয়েঙ্গে।"

আমরাও একটা পাথরের উপর বসলাম, পাঁচ-সাত মিনিট বিশ্রাম করলাম ; লোকজনেরা হাত-মুখ ধুয়ে জল খেল। আমি ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছি, "সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এই অন্ধকার হল বলে, জল্দি চল।"

সার্ভেয়ার বলল, "আর ভয় নেই। চওড়া নদী, এখুনি লোক এসে পড়বে লণ্ঠন নিয়ে। ওদের চারটের সময় বেরোতে বলে দিয়েছি।"

লোকজন উঠে দাঁড়াল আর চার-পাঁচজন মিলে 'হু-উ-উ' বলে জোরে চিৎকার করল—তাঁবু থেকে যাদের আসবার কথা, তারা কত দূর এল দেখবার জন্য। চিৎকারও করা আর পাশের আট-দশ ফুট উঁচু শরবন থেকে পাঁচ-সাতটা বুনো হাতি ফ্যাঁস-ফ্যাঁস শব্দ করে বের হয়ে এল, আর দৌড়ে জল পার হয়ে অন্য পারের জঙ্গলে ঢুকল।

অত বড়-বড় পাঁচ-সাতটা জানোয়ার পনেরো-কুড়ি গজ মাত্র দূরে ঐ খাগড়াটুকুর মধ্যে ছিল, কিন্তু আমারা বুঝতে পারিনি। লোকজন হঠাৎ অতগুলো হাতি দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল, তাদের সামলে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গেল। উপরে ঝলমল করছে আকাশ ভরা তারা, আর নিচে ঝকঝক করছে বালি, তার উপর দিয়ে আমরা চলেছি আর একটু পর-পরই জল পার হচ্ছি।

পথ আর ফুরোয় না। সার্ভেয়ার বলল সব সুদ্ধ ষোলো-সতেরোবার জল পার হতে হবে। লণ্ঠন নিয়ে লোক আসবার কোনো লক্ষণই নেই। আরও দু-চার বার 'হু-উ-উ' বলে চিৎকার করা হয়েছে, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যাইনি। সকলে চটে লাল, সার্ভেয়ারের টিণ্ডেল বলতে লাগল,

"আচ্ছা, বেটাদের হরিণ খাওয়াব এখন ! তাঁবুতে বসে-আরাম করছে। অতবার করে বলে দিয়েছি চারটের সময় লণ্ঠন নিয়ে আসবি তার নামও নেই।"

এক-একবার জল পার হই আর লোকেরা বলাবলি করে, "আউর আট দফে, আউর সাত দফে" ইত্যাদি। বালিতে পা আর চলে না, বালির উপর জায়গায়-জায়গায় পাথর, গাছের ডাল বা শেকড় পড়ে রয়েছে কাজেই চোখ নিচের দিকে রেখেই চলতে হয়, নয়তো হোঁচট্‌ খাবার আশঙ্কা। সাতটা বাজতে চলল, সকলেই পরিশ্রান্ত।

"আরে ফের আওয়াজ দেও।"

"হু-উ-উ।"

এইবার উত্তর এল কিন্তু বহুদূর থেকে। সঙ্গের লোকেরা তাদের বাপান্ত করতে লাগল, "হতভাগারা তাঁবুতে বসে আওয়াজ দিচ্ছে!" এমন সময়ে আবার নদীর মোড় ঘুরলাম আর দূরে আলো চোখে পড়ল। লোকেরা বলল, "ঐ আসছে।"

আমি ভালো করে দেখে বললাম, "ওটা লণ্ঠনের আলো নয়, ধুনির আলো বলে মনে হচ্ছে।"

তখন তো সকলে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল, "হতভাগারা আগুন পোয়াচ্ছে!"

ক্রমে সেটার আরও কাছে পৌঁছলাম, বেশ বুঝতে পারলাম যে একটা গাছ কিম্বা বাঁশ ঝাড়ের গোড়া জ্বলছে আর দুটো লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমে আরও কাছে গেলাম, আর একবার জল পার হলেই তাদের কাছে পৌঁছব।

আগে-আগে দুজন খালাসী হরিণ ঘাড়ে করে চলেছে, তাদের পিছনে আমি আর সার্ভেয়ার পাশাপাশি, আমাদের পিছনে বন্দুকওয়ালা, তার

পিছনে অন্য লোকরা। আমাদের ডান দিকে জল, বাঁদিকে তিন-সাড়ে-তিন ফুট আন্দাজ উঁচু বালির পাড়, তার উপর সাত-আট ফুট পরিষ্কার বালি, তারপর কষায় আর শরবন। ঐ বালির উপর একটা গাছের গোড়া বা পোড়াকাঠ পড়ে আছে। হরিণওয়ালা খালাসী দুজন যখন ঐ কাঠটার পাশ দিয়ে চলে গেল আমার মনে হল যেন কাঠটা একটু নড়ল।

'কাঠ নড়ল কি রকম?' এই প্রশ্ন মনে ওঠা মাত্র আমি জোরে হাঁকলাম—"হ্যাইও।"

আর চাই কি? 'ফ্যশ' বলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠে দাঁড়াল এই বড় এক বাঘ!

আমি আর ইন্দ্রসিং দাঁড়ালাম, হরিণওয়ালারাও "বাঘ! বাঘ!" বলে দাঁড়াল, কিন্তু হতভাগা বন্দুকওয়ালা "বাপরে! বাঘুয়া!" বলে তিন লাফে পিছনের লোকদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল! আমাদের হাতে লাঠি ছাড়া আর কিছু নেই, বাঘটা কিন্তু দুবার গলা শানিয়েই শরবনে ঢুকে পড়ল। হাতের ছড়ি দিয়ে ছুঁতে পারতাম এত কাছে ছিল।

একেই বলে 'রাখে হরি মারে কে?'

আগুনের সামনে যে লোক দুজন ছিল তারা এতক্ষণ চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাচ্ছিল। আমরা জল পার হয়ে ওপারে গেলাম। তখন ঐ খালাসী দুজন বলতে লাগল, "হুজুর, এই হতভাগাই তো দুঘণ্টার উপর আমাদের আগলে রেখেছে। না এগোতে পারি, না তাঁবুতে ফিরে যেতে পারি। আমরা বেগতিক দেখে লণ্ঠনের কেরাসিন ঢেলে এই বাঁশঝাড়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি। আর ঐ হতভাগা ঐখানে বসে পাহারা দিয়েছে, আগুনটা নিভলেই আমাদের ধরে খেত। আমরা যখন এখানে এসেছি, তখন ওটা এখানে জল খাচ্ছিল। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে। আমরা ভয়ে তাঁবুমুখো হয়েছিলাম আর দৌড়ে ওটা জল পার হয়ে সামনে পথ

আগলে দাঁড়িয়েছে। হুজুর এখন না এলে ঠিক আমাদের খেত, আগুন আর পনরো-কুড়ি মিনিট পরেই নিভে যেত।”

সত্যি কথা। আগুনটা তখন নিভু-নিভু হয়ে আসছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা তাঁবুতে পোঁছলাম।

এইজন্যই বলেছিলাম যে কোথাও বা শিকার মেলে—কিন্তু তখন একেবারে খালি হাত, নিরস্ত্র অবস্থা।

পরের দিন সকালবেলা আমরা ঐ রাস্তায় বাকি কাজটুকু শেষ করতে গিয়েছিলাম। যাবার সময় রাত্রের জানোয়ারটা কত বড় ছিল তা দেখতে পেলাম। যে জায়গায় জল খেয়েছিল আর যে জায়গায় হামা দিয়ে বসে ঐ লোক ছুটিকে পাহারা দিয়েছিল, দু জায়গাতেই পায়ের দাগ দেখলাম আঙুল সুদ্ধ আমার পাঞ্জার প্রায় সমান এক-একটা ! বেশ বড় বাঘ ছিল।

ছুদিন ঐ জায়গায় ছিলাম, তারপর ফিরবার পালা, পথ ঐ নদী-নদী, যে জায়গায় প্রথম দিন হাতি বের হয়েছিল সেই পর্যন্ত। তারপর সার্ভেয়ারের কাটা লাইন ধরে-ধরে রিজার্ভ ফরেস্ট-এর সীমানা পর্য্যন্ত; সীমানার উপর বারো ফুট চওড়া লাইন কাটা, ঐ লাইন ধরে নিচুগারদ হয়ে ডিমাপুর যাব। নিচুগারদ থেকে ডিমাপুর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা।

একটু ভোরে বের হয়েছি, যদি কোনো শিকার মেলে। আমার সঙ্গে ফুদ্‌না নামে এক খালাসী। সাঁওতাল, বেশ হুঁসিয়ার লোক আর জঙ্গলে তার দৃষ্টিশক্তি বেশ সাফ। অনেকবার দেখেছি ঝোপের মধ্যে হরিণ বা শূয়োর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমার চোখে পড়ল না, কিন্তু ফুদ্‌না ঠিক ধরেছে। সে তার দেশে—হাজরীবাগের জঙ্গলে, শিকার করে থাকে আর তার সাহসও যথেষ্ট আছে, অনেকবার তার প্রমাণও পেয়েছি।

নদী-নদী চলেছি, যে জায়গায় প্রথম দিন বাঘ দেখেছিলাম, সে

জায়গাটা পার হয়ে প্রায় এক-দু মাইল পথ চলে গেছি। একটু-একটু রোদ উঠেছে, চারদিক তাকিয়ে দেখি আবার পথ চলি। সামনে বালির উপর একটা শুকনো গাছের ডাল পড়ে আছে, হলদে রঙের শুকনো পাতা তার, চার-পাঁচ ফুট দূরেই জঙ্গল। দু-চারবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার ঐ শুকনো পাতা কটির দিকে চোখ গিয়েছে, ওরে বাবা, ওটা যে বাঘের বাচ্চা! আমাদের দিকে তার পিঠ, কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে।



আমরা দাঁড়ালাম, বন্দুকটা ফুদ্‌নার ঘাড়ে, পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে ফিসফিস করে বললাম, "বন্দুক।" ঐ যে ফিসফিস করে কথা বলেছি, ঐটি তার কানে গিয়েছে। বাচ্চাটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এক নজরে আমাদের দেখে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে লাফ দিয়ে জঙ্গলে পড়ল। "মারো, মারো" বলে ফুদ্‌না আমার হাতে বন্দুক দিল বটে, কিন্তু মারবার সময় আর মিলল না। বন্দুক হাতে করে ধীরে-ধীরে এগোলাম, এক-এক পা ফেলি আর পাতা পরীক্ষা করে দেখি কোথাও তার মা বসে আছে কিনা। কিছুই দেখতে পেলাম না।

জানোয়ার দেখলাম না বটে, কিন্তু পাঁচ-ছয় কদম সামনে গিয়েই পায়ের দাগ পেলাম। মা আর বাচ্চার, দুজনের পায়ের দাগ পাশাপাশি, জল খেয়ে উঠে এসেছে। বাচ্চাটা যখন ঐ জায়গায় শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল তখন তার মাও নিশ্চয়ই কাছেই কোথাও বসে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। গুলি চালালে আর রক্ষা ছিল না। বাচ্চার শোকে আমাদের আর পিছনের খালাসীদের সকলকে মূলোর মতো চিবিয়ে খেত। সৌভাগ্যের বিষয় হাতে বন্দুক ছিল না, হাতে বন্দুক থাকলে হয়তো বা বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতাম। বাচ্চাটা একটা কুকুরের সমান উঁচু ছিল।

সে জায়গা ছেড়ে চললাম। অন্য খালাসীরা এসে জুটেছিল, তাদের দশ-বারো মিনিট সেই জায়গায় অপেক্ষা করতে বলে আমরা এগিয়ে চললাম। ক্রমে নদী ছেড়ে সার্ভেয়ারের কাটা লাইন ধরে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। অনেক জানোয়ারের পাঞ্জা দেখতে পাচ্ছিলাম, হরিণ, শূয়োর জল খেয়ে গেছে, তাদের পায়ের দাগ আছে।

বন্দুক ঘাড়ে ধীরে-ধীরে চলতে লাগলাম, বেলা প্রায় সাড়ে-আটটা। শুনতে পেলাম একটু সামনে শুকনো পাতার উপর খুব খড়খড় শব্দ হচ্ছে। "কেয়া হ্যায় রে?"

ফুদনা বলল, "হুজুর, টেঙ্গা হোগা।"

টেঙ্গা এক ধরনের পাখি, শালিখের মতো বড়, খয়েরী রঙ, বুক আর মাথার উপরদিকটা শাদাপানা, কুড়ি-বাইশটা এক সঙ্গে থাকে, জঙ্গলে কোনো জানোয়ার দেখলে এরা সাধারণত বড়ই চেঁচামেচি করে সকলকে সাবধান করে দেয়। বললাম, "টেঙ্গা হ্যায় তো জমিন পর কেয়া করতা হ্যায়?"

"শুখা পাত্তি পর লোট্‌তা-পোট্‌তা।"

আমার মন ঐ কৈফিয়তে প্রবোধ মানল না, টেঙ্গা মাটির উপর অনন

লুটোপুটি খাবে কেন ? বন্দুক ভরে এগোলাম কিন্তু খুব সাবধানে, একেবারে যেন হাঁটি-হাঁটি পা-পা ! ক্রমে যে জায়গায় শব্দ হচ্ছিল সেই জায়গায় এলাম। আট-দশটা টেঙ্গা বসে আছে, কিন্তু গাছে, আর আমাদের দেখে কিচির-মিচির করতে লাগল।

ফুদ্‌না হেসে বলল, "ঐ দেখ হুজুর।"

বললাম, "তা বটে, কিন্তু কি দেখে তখন অমন করছিল ?"

কোথাও কিছু নেই, আরও পাঁচ-সাত কদম আগে গেলাম, 'ট্যাং' শব্দ করে একটা প্রকাণ্ড হরিণী আমাদের সামনে দিয়ে দৌড়ে লাইন পার হয়ে গেল টেঙ্গাগুলি আবার চেচামেচি করে উঠল।

ফুদ্‌না বলল, "ইসিকো দেখা থা হুজুর।"

আমার বিশ্বাস হল না, শুধু এই ? তবে মাটিতে হড়বড় কেন ? আর কিছু দূর এগোলাম, কিছুই নেই। বন্দুকটা বড় ভারি, প্রায় আট পাউণ্ড। কার্তুজ খুলে ব্যাগে রেখে, বন্দুকটা ফুদ্‌নার ঘাড়ে চাপালাম। লাঠি হাতে নিয়ে চলতে লাগলাম, কিন্তু তেমনি আস্তে-আস্তে পা টিপে। লাইনটা আঁকাবাঁকা, সামনেই মোড়, হঠাৎ মনে হল মোড়ের পাশে ঝোপের মধ্যে একটা কি নড়ল—চার-পাঁচ কদম দূরে হবে। দুজনেই দাঁড়িয়ে এক মনে দেখলাম, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না ; হয়তো কোনো ছোট পাখি ছিল, এক ডাল থেকে আরেক ডালে লাফিয়ে গেল।

আরও দু-চার পা চলে মোড়ের উপর এলাম, আর আকাশ-পাতাল ফাটিয়ে গর্জন করে, যেন একেবারে আমার পায়ের নিচে থেকে, প্রকাণ্ড বাঘ পিছনের দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, সঙ্গে-সঙ্গে উল্টে সাত-আট ফুট দূরে লাফিয়ে পড়ল—ঠিক যেন ডিগবাজি খেল। আবার সেই ভীষণ গর্জন—আবার একলাফ, আবার গর্জন আবার লাফ। তিন লাফে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ফুট চলে গেছে আর সেইখানে দাঁড়িয়ে কি ভীষণ গর্জন !

আমি তো প্রথম গর্জন আর লাফের পরেই পিছনে হাত বাড়িয়ে "বন্দুক, বন্দুক" বলে ডাকছি কিন্তু বন্দুক আর দেয় না।

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম বন্দুক দেবার শক্তি ফুদ্‌নার নেই। তার চোখ কপালে উঠেছে, হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, সে ঠকঠক করে কাঁপছে। এক পা পিছনে হটে গিয়ে তার হাত থেকে বন্দুক নিলাম, বললাম, "ছররা দে।" বেচারা এমন ঘাবড়ে গিয়েছে যে কার্তুজের ব্যাগটা আর খুলতে পারে না। আমিই তাড়াতাড়ি এক মুঠা কার্তুজ বের করে নিলাম।

তখনো বাঘের গর্জনে বন-জঙ্গল কাঁপছে, বন্দুকে ছিটা ভরে সেই বাঘের দিকে মুখ করে দুটো ফায়ার করলাম, বাঘটা আরও দুটো লাফ দিয়ে আবার গর্জে উঠল। আমি আরও দুবার বন্দুকের আওয়াজ করলাম। তখন মনে হল যেন বাঘটা দৌড়ে পালিয়ে গেল, গর্জন থেমে গেল আমি কিন্তু আরও দুবার ফায়ার করলাম।

লিখতে যত সময় লাগল তার সিকি ভাগের মধ্যে অত সব কাণ্ড হয়ে গেল। বাঘের গর্জন থেমে গেলে পর চারদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, ব্যাপার কি, বাঘটা ওখানে শুয়ে কি করছিল? ফুদ্‌না ততক্ষণে প্রকৃতিস্থ হয়েছে, তার চোখ পড়ল আগে—"হুজুর, ঐ দেখ।" তাকিয়ে দেখলাম, আমার চার-পাঁচ ফুট সামনে প্রকাণ্ড এক সম্বরের মৃতদেহ পড়ে আছে, আশে-পাশে আট-দশ ফুট জমি যেন একেবারে চষে ফেলেছে। সম্বরটার ঘাড় ভেঙে ফেলেছে, তার মুখ উপরদিকে আর সিং মাটিতে, গলায় চারটে ফুটো, আর তার থেকে রক্ত ঝরছে। পিছনের এক পায়ের হাড় ভাঙা, একখানা চোঙ্গা হাড় বেরিয়ে পড়েছে, সেটা একটা ছোট গাছের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে—ঠিক যেন ইচ্ছা করে বেঁধে রেখেছে। পিছনের রাঙের প্রায় দু সের মাংস উড়ে গেছে, সামনের একটা রাঙ থেকে প্রায়

তিন পোয়া মাংস নেই। এইবার বুঝতে পারলাম যে এই দুয়ের লড়াইয়ের হড়বড়ি আমরা শুনতে পেয়েছিলাম। বাঘটা প্রথম যখন লাফিয়ে উঠেছিল, তখন ইচ্ছা করলে হাতের লাঠি দিয়ে তাকে ছুঁতে পারতাম।

পাঁচ-সাতটা বন্দুকের আওয়াজ শুনে পিছনের খালাসীরা ধরে নিয়েছে যে বড় জবর শিকার পড়েছে, আর আধ মাইল দূর থেকে হল্লা করতে-করতে এসে হাজির হয়েছে। পৌঁছে সব দেখে-শুনে তাদের চক্ষুস্থির। ফুদ্‌নাকে চেপে ধরল, "তুম্ ডর গিয়া থা?"

ফুদ্‌না সোজা মানুষ, সে বলল, "হাঁ ভাইয়া, ডর গিয়া থা, মেরা খেয়াল হুয়া কেয়া হুজুরকো পকড় লিয়া।"

শিকার যেই করুক, মাংস তো জুটেছে। খালাসীরা বলল, "আট-দশ মিনিট সময় দিন, আমরা মাংস নেব।"

আমি বললাম, "আচ্ছা। কিন্তু বাঘের খোরাক ছেড়ে নিও, জখমী দিকটা নিও না।"

ওরা কুড়ুল দিয়ে দুখানা পা, একপাশের পাঁজর ও পাছা কেটে নিল। দুজন খালাসীর মাথাটাও নেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমি বারণ করলাম। ভয় দেখালাম, "তাহলে বাঘ তাঁবুতে আসবে। কাছাড়ের পাহাড়ে বাঘ রাত্রে বাবুর ডেরায় এসেছিল, সমস্তটা শিকার তারা নিয়ে গিয়েছিল বলে।"

হতভাগারা সহজে ছাড়তে চায়নি। "গুলি মেরে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব" বলে ভয় দেখিয়ে তবে ছাড়িয়ে ছিলাম।

মাংস নিয়ে চললাম আর দশ-বারো মিনিটে ফরেস্ট-এর সীমানার লাইনে গিয়ে পৌঁছলাম। লোকগুলি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, বারো ফুট চওড়া লাইন, একেবারে পরিষ্কার, এবার সোজা হয়ে হাঁটতে পারবে। সীমানায় পৌঁছে খালাসীরা বলল, "বড্ড ভারি হয়েছে, জিনিসগুলো একটু গুছিয়ে বাঁধব।।"

বললাম, "আচ্ছা, বারোটা বাজে আমিও কিছু খেয়ে নিই।"

খেতে বসে, যারা হরিণের মাথাটা আনতে চেয়েছিল, সেই খালাসী দুজনকে ডাকলাম, বললাম, "যাও, গিয়ে হরিণের মাথাটা কেটে নিয়ে এস, দশ টাকা বকশিশ দেব।"

আমার টিণ্ডেল শীতল লাফিয়ে উঠে বলল, "ওরা নিয়ে এলে আমরা চাঁদা তুলে আরও দশ টাকা দেব।"

তখন সবাই মিলে তাদের বলতে লাগল, "যা না দেখি, কেমন মুরদ।"

রিজার্ভ ফরেস্ট-এর সীমানার উপর বারো ফুট চওড়া লাইন, জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে রাখা হয়, তাতে ঘাস গজায়। ঐ পরিষ্কার করা লাইনের উপর সকাল সন্ধ্যায় অনেক শিকার পাওয়া যায়—মোরগ, হরিণ তো প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়।

একদিন ভোরে আমি আর ফুদ্‌না এমনি এক ফরেস্ট-এর সীমানা ধরে চলেছি। অন্য লোকেরা হাতির পিঠে মালপত্র বোঝাই করে আসছে। বেজায় কুয়াশায় চারদিক ঘেরা, দশ-পনরো ফুট দূরেও ভালো করে কিছুই দেখা যায় না। বন্দুকে দু-নম্বর ছিটা আর বাকৃশট্ ভরে নিয়েছি, মোরগ বা ছোট হরিণ যা মিলবে মারব।

হঠাৎ মনে হল যেন একটা ছোট হরিণ (বার্কিং ডিয়ার) আমাদের বাঁদিক থেকে এসে, বারো-চোদ্দ ফুট সামনে লাইনটা পার হয়ে ডানদিকের জঙ্গলে ঢুকল। লালচে জানোয়ার চোখে পড়ল কিন্তু কুয়াশার জন্য আর কিছু ভালো করে দেখা গেল না। লাইনটার ডানদিকে আট দশ ফুট দূরে একটু পরিষ্কার জায়গা ছিল—সেখানটায় বড় গাছই বেশি। ঐ জায়গাটুকুতে বের হলেই মারব মনে করে, বন্দুক তুলে তৈরি হয়ে দাঁড়ালাম। এবার বের হলেই ঘোড়া টিপে দেব।



বের হল বটে, কিন্তু এই বড় বাঘ! ফুদ্‌না আমার কানে-কানে বলেছে "বাঘুয়া"—ঐটুকু তার কানে গেছে, আর তার ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে উঠল, একবার মুখ ফিরে আমাদের দেখল, তারপর যেমন চলছিল সেই তালেই চলে গেল, একটুও ব্যস্ত হল না। ঠিক যেন আমাদের সাবধান করে গেল—খবরদার, বুঝে-শুনে কাজ কোরো।

এই নাম্বরে কাজ করবার সময় এক জায়গায় একটা মরা হাতি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, দুটো বাঘ ঐ হাতির মাংস খাচ্ছিল। কি করে হাতিটা মরল তা স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল না। বাঘে মেরেছে বলে মনে হল না, কেননা হাতিটা প্রায় পূর্ণ বয়স্ক। অত বড় হাতি বাঘে মারতে পারবে না।

বেতের মধ্যে হাতির রাস্তা, ঐ রাস্তা ছাড়া যাবার পথ নেই। ঝড়ে একটা প্রকাণ্ড গাছ উপড়িয়ে ঐ রাস্তার উপর ফেলেছে, রাস্তার উপর গাছের মূল কাণ্ডটা প্রায় চার-পাঁচ ফুট উঁচু হয়ে আছে। হাতিটার

সামনের দু-পা গাছটার এক পাশে আর পিছনের দু-পা গাছের অন্য পাশে, গাছের কাণ্ডটা তার পেটের নিচে। দেখে-শুনে মনে হল বোধহয় হাতিটা ঐ গাছ ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টায় ছিল। সামনের পা পার করে আটকিয়ে গিয়েছিল, পিছনের পা দুটি আর পার করতে পারেনি, ফিরেও আসতে পারেনি। কদিন না জানি ঐ অবস্থায় থেকে তবে তার প্রাণ বের হয়েছিল।

বাঘ দুটো সম্ভবত ঐ রকম বেকায়দায় তাকে পেয়েছিল আর মরবার পর বা মরমর অবস্থায়ই খেতে আরম্ভ করেছিল। পেটের দিকটা খাচ্ছিল। কাজ করতে-করতে আমাদের লোকরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত, তাদের দেখে বাঘ দুটো পালিয়ে গেল। তারপর আরও দু-তিনবার তারা ঐ রাস্তা দিয়ে গিয়েছে আর প্রত্যেকবারই বাঘ দুটোকে দেখতে পেয়েছে—আহারে ব্যস্ত! কি গন্ধ যে হয়েছিল ততদিনে তা বুঝতেই পারছ।

এই যে ঘোর নাম্বর জঙ্গল, জানোয়ার কিলবিল করছে, আমাদের লোক চারমাস এই জঙ্গলে কাজ করেছে। কতদিন কত বিপদে পড়েছে, ম্যালেরিয়ায় ভুগেছে, দু-তিনজন ব্যারামে ভুগে প্রাণও হারিয়েছে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় কেউই জানোয়ারের হাতে প্রাণ দেয়নি।

দু-তিনবার সার্ভেয়াররা খবর পাঠিয়েছে, "কাজ করা যাচ্ছে না। খালাসীরা ভয়ে কাজে বের হতে চায় না, পালাবার যোগাড়ে আছে। রোজ তাঁবুতে বাঘ এসে হল্লা করে, শিগগির একটা কিছু ব্যবস্থা কর।"

কারো তাঁবুতে শিকারী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে বন্দুক ঘাড়ে করে সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে কাজ করিয়েছে। আবার কোনো জায়গায় বা দুজন সার্ভেয়ারকে এক কাজে নিয়োগ করতে হয়েছে, প্রত্যেকের সঙ্গে দশ-বারোজন লোক। তারা এক জায়গায় তাঁবু রাখে, এক সঙ্গে কাজে বের

হয়। বাঘের সাড়া পেলেই দুড়ুম-দাড়ুম বন্দুক ছুঁড়ে বাঘ তাড়ায় আর কাজ করে।

এক জায়গায় তো মহা মুশকিল হল। খানিকটা জমিতে আর কোনো রকমেই জরীপ করা যায় না, সার্ভেয়ারের লোকের আওয়াজ পেলেই হাঁউ-হাঁউ করে বাঘ ছুটে আসে। দুজন বাহাদুর লোককে সে জায়গাটুকু জরীপ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল—একজন পাঠান, আগে পল্টনে ছিল; আরেকজন মাদ্রাজী মুসলমান, তার চার-পুরুষ পল্টনে কাজ করেছে। দুজন চার-পাঁচদিন এক সঙ্গে কাজ করল। একজন কাজ করে আর অন্যজন বন্দুক ছুঁড়ে বাঘ তাড়ায়।

এই মাদ্রাজী সার্ভেয়ারটি একদিন বড় বিপদে পড়েছিল। কাজ করতে-করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে আকাশ কালো হয়ে মেঘ উঠল। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে আরম্ভ করল আর বাজ পড়তে লাগল। সার্ভেয়ার কাজ বন্ধ করে খালাসীদের তাড়া দিল, "জল্দি চলো, তুফান আতা হ্যায়, জঙ্গলমে রাস্তা ভুল যাওগে।"

তাড়া দিয়েই সার্ভেয়ার রওয়ানা হয়ে গেল। বলে গেল আগুনের লাইন ধরে প্রায় এক মাইল যাবে তারপর সেই হাতির রাস্তা ধরে আড্ডায়। হাতির রাস্তা অনেক আছে কিন্তু একটা তাদের বিশেষ পরিচিত। সেটাকে তারা পরিষ্কার করে নিয়েছে, সর্বদা ঐ রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করে। আগুনের লাইন থেকে তাঁবু সিকি মাইল।

সার্ভেয়ার তো চলে গেল, খালাসী বেচারাদের জিনিসপত্র বেঁধে নিয়ে যেতে চার-পাচ মিনিট দেরি হল। "এই ঝড় এল, এই ঝড় এল"—ভয়ে ছুটতে-ছুটতে তারা তাঁবুতে এল।

"বাবু কোথায় ?"

আড্ডার লোকরা বলল, "বাবু তো আসেনি।"

"বাবু আসেনি ? বাবু তো আমাদের আগে চলে এসেছে।"

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে আর তুমুল ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। কত চিৎকার করে ডাকাডাকি করল, কিন্তু কোনো সাড়া পেল না।

এদিকে সার্ভেয়ার তো লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলেছে, যদি ঝড় আরম্ভ হবার আগে তাঁবুতে পৌঁছতে পারে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে চলছে আর পথ ভুলে অন্য এক হাতির রাস্তা ধরে চলে গেছে। হঠাৎ কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল আর চারদিক ঝলসিয়ে বিদ্যুত চমকাল, তখন তার চৈতন্য হল। "এ কোথায় এলাম ? এ রাস্তা তো নয়! আগুনের লাইন থেকে তাঁবু মাত্র সিকি মাইল—এ তো অনেক দূর এসেছি" ইত্যাদি ভাবতে-ভাবতে ফিরতে আরম্ভ করল। ততক্ষণে তুমুল ঝড় আর মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। পথ চোখে দেখা যায় না, বুঝতেই পারছে না কোনদিকে যাচ্ছে।

তখন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল, কি কর্তব্য। স্থির করল যে কোথাও বসে রাত কাটানোই যুক্তিসঙ্গত, নয় তো এই অন্ধকারে ঝড় বৃষ্টিতে প্রাণ হারাতে পারে, আর এতে খেয়াল হল যে ঐ হাতির রাস্তার উপর বসে থাকা সমীচীন নয়, যত জানোয়ার এই পথ দিয়েই যাতায়াত করে। সার্ভেয়ারের হাতে একখানা ছোট তলোয়ার ছিল, সে তা দিয়ে গাছে দাগ কাটতে আরম্ভ করল, আর ঐ হাতির রাস্তা ছেড়ে কুড়ি-পঁচিশ ফুট জঙ্গলে ঢুকে একটা উইঢিপি পেল, তার উপরে একটা বড় গাছ। ঐ গাছে পিঠ দিয়ে উইঢিপির উপর বসল, ঐখানেই রাত কাটাবে। তলোয়ারখানা সামনের দিকে বাগিয়ে ধরে রইল যদি কোনো জানোয়ার আসে, পিছনে প্রকাণ্ড গাছটার আড়াল।

সমস্ত রাত যে তার কি ভাবে কেটেছিল তা বুঝতেই পার। ভিজে একেবারে চুপচুপে হয়ে গেছে, জোঁকও যে কত ধরেছে, তা বলা যায় না।

এক-একবার পাশে ঝোপ-জঙ্গলে একটা কিছুর শব্দ হওয়া মাত্র তার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠছে, ঘুটঘুটে অন্ধকার, চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সৌভাগ্যের বিষয় ঝড়-বৃষ্টি সমস্ত রাতই ছিল, ঝড়ের দাপটে জানোয়ার বড় একটা বের হয়নি, সকলেই নিজেদের আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছিল।

ভোর হলে বেচারা আধমরা অবস্থায় উঠে রাস্তায় এসে ফিরে চলল, অর্ধেক রাস্তা যেতে না যেতে তার লোকজনদের সঙ্গে দেখা হল তারা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। বাবুকে দেখে লোকগুলির ধড়ে প্রাণ এল, তারা তার আশা ছেড়ে দিয়েছিল, বাবু হয়তো বা গাছ চাপা পড়েছে, নয় তো তাকে বাঘে খেয়েছে।

● ১৭ ● ১৯১৬-১৯১৮ (আসাম : ডিব্রুগড় : নাগা হিল্‌স্) তোমরা অনেকেই চিড়িয়াখানায় উল্লুক দেখেছ। আমি আসামের জঙ্গলে অসংখ্য উল্লুক দেখেছি, কতবার নিঃশব্দে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাদের কাণ্ড-কারখানা লক্ষ্য করেছি। তাদের মজার সব কাজ দেখে আমার ভারি আমোদ হত। গাছের উপর উল্লুক এক জীব, আর মাটিতে একেবারে অন্য জানোয়ার, মাটিতে অমন আনাড়ী জানোয়ার বোধহয় নেই। যখন আপন মনে থাকে, দু হাত বাঁকিয়ে উপর দিকে তুলে, হেলে-দুলে এমন মজা করে চলে যে হাসি রাখা যায় না। তখন দেখতে পেলে তোমরা বলবে, "কি আনাড়ী অকর্মা জানোয়ার হাঁটতেও পারে না।"

আবার ঐ জানোয়ারটিকে গাছের উপরে দেখ, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! দলে-দলে গাছে বসে চিৎকার করতে থাকে, পালের গোদা উপরে বসে

হাঁকে—'হুঁ-কু', আর অমনি নিচের ডাল থেকে কুড়ি-পঁচিশটা জোয়ান এক সঙ্গে সুর ভাঁজে, 'হুঁকু, হু-উ-ক।' থামতে না থামতে সর্দারমশায় আবার হাঁকলেন, 'হুঁ-কু'—অমনি আবার সুর উঠল 'হুঁকু, হুঁকু, হুঁ-উ-কু', মিনিটের পর মিনিট ঐ রকম চলবে।

একটু শব্দ কর বা গাছপালা কিছু নাড়. আর অমনি এ-গাছ থেকে ও-গাছ, ও-গাছ থেকে সে-গাছ এমনি করে লাফিয়ে দু-তিন মিনিটের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আর সে কি লাফ! কুড়ি-পঁচিশ-ত্রিশ ফুট অম্লানবদনে পার হয়ে যায়। পঁচিশ-ত্রিশ ফুট উপর থেকে লাফিয়ে ঝপাং করে ঢালুর নিচের গাছে পড়বে, হাত-পায়ের যা সামনে পাবে একটা না একটা ডাল ধরে দোল খাবে আর ঐ দোলের সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে আরও পঁচিশ-ত্রিশ ফুট নিচে অন্য গাছে, আবার অন্য গাছে। দেখতে না দেখতে কোথায় চলে গেল। বন নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

লুশাই পাহাড়ে কাজ করবার সময় এর একটা বাচ্চা খুঁজেছিলাম। একটা বাচ্চা এনে দিতে পারলে গ্রামের লোকদের দশ টাকা বকশিশ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম। লুশাইরা বলেছিল, "মাকে মেরে বাচ্চা ধরে দিতে পারি।" আমি অবশ্য রাজী হইনি। পোষা জন্তু হিসেবে ওরা ভারি মজার হয়।

বাচ্চার কথায় মনে পড়ল। একদিন কাজ করে তাঁবুতে ফিরে হাত-পা ধুয়ে চা খেতে বসেছি, শুনতে পেলাম যেন কেউ কাঁদছে। টিণ্ডেলকে ডেকে জিগগেস করলাম, "কে কাঁদছে?" আমার সন্দেহ হয়েছিল বুঝি বা আমার লোকেরা গ্রামের লোকদের উপর কোনোরকম অত্যাচার করেছে।

টিণ্ডেল বলল, "হুজুর, হনুমান রোতা হায়।"

"হনুমান কাঁদছে, মানে?"

তখন শুনলাম হাতির মাহুতরা একটা হনুমানের বাচ্চা জঙ্গল থেকে



ধরে এনেছে, তার মা বেচারা গাছে-গাছে লাফিয়ে, জঙ্গল থেকে তাদের পিছনে-পিছনে তাঁবু পর্যন্ত এসেছে আর সেই চারটে থেকে গাছে বসে কাঁদছে। পরে তার বাবাও এসেছে।

তাঁবু গ্রাম থেকে একটু দূরে জঙ্গলের কিনারায়। তাঁবুতে আমার চাপরাশী রামাবতার ছিল, অযোধ্যার ব্রাহ্মণ, তাকে ডেকে জিগগেস করলাম, "তুমি হিন্দু, ব্রাহ্মণ, আর তোমার সামনে হনুমানের বাচ্চা ধরে এনেছে, আর তুমি কিছু বললে না ?"

"হুজুর, এই মাহুতরা জানোয়ার, আমার কথা শোনে না, কত বলেছি, কিছুতেই ছাড়ে না, বলে বহুৎ জঙ্গল থেকে ধরে এনেছে।"

আমি বললাম, "আচ্ছা, আমি হুকুম দিচ্ছি তুমি গিয়ে বাচ্চাটাকে ঐ গাছের ডালে বসিয়ে দিয়ে এস। দেখ তো ওর মা কেমন করে কাঁদছে। আমার দুঃখ হচ্ছে, আর তুমি রামের দেশের লোক, তোমার দরদ হচ্ছে না ?"

হুকুম পেয়ে বুড়োর গোঁফ ফুলে উঠল, সে তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে মাহুতদের ডেরা থেকে ছানাটিকে নিয়ে এল, আর তাকে ঐ গাছের নিচের ডালের উপর বসিয়ে চলে এল।

তার মা উপরের ডালে বসে-বসে রামাবতারের কাজ লক্ষ্য করছিল, তার কান্না থেমে গিয়েছিল। বাচ্চাটিকে গাছের ডালে বসিয়ে দিয়ে চাপরাশী চলে এলে পর তার মা ধীরে-ধীরে নামতে আরম্ভ করল, দু-চার পা নামে আবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেয়। শেষে যখন বাচ্চাটার কাছে পৌঁছল, প্রথম তাকে ভালো করে শুঁকে দেখল, তারপর তাকে বুকে তুলে নিল আর তড়াক-তড়াক করে লাফিয়ে উপরে উঠে গেল। সেখানে মা-বাবা দুজনে কত রকমে যে বাচ্চাটাকে আদর করল তার আর কি বলব ! তারপর তাকে নিয়ে তারা লাফাতে-লাফাতে গভীর বনে চলে গেল।

এ-বছর আমাকে নাগা পাহাড়ে যেতে হয়েছিল। যে জায়গায় আমার কাজ ছিল সেটা নাগা হিল্‌স্‌ জেলার বাইরে, জংলী নাগাদের এলাকায়। সঙ্গে সিপাই-সান্ত্রী না নিয়ে এ এলাকায় প্রবেশ করবার হুকুম নেই। সাদিয়া থেকে দশজন সিপাই আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল। আমরা মার্গারিটা থেকে নৌকোয় চড়ে বুড়িডিহিং নদী দিয়ে ঐ নাগা সীমানা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। বুড়িডিহিং নদী আর অন্য একটি নদীর দোমোহোনায় তাঁবু ফেলা হয়েছিল। সাত-আটজন সিপাই সঙ্গে নিয়ে খালাসীরা পাঁচ-ছয়দিন

আগেই চলে গিয়েছিল—জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করবার জন্য। আমরা চারদিন পরে এসে দোমোহানায় তাঁবু ফেলেছিলাম। প্রথম যেদিন সে জায়গায় পৌঁছলাম সেদিন রাত্রে বড় তামাশা হয়েছিল।

ঐ দোমোহানার অপর পারে ডিহিং রিজার্ভ ফরেস্ট। দু বছর আগে আমাদের আপিসের মিস্টার মি- ঐ রিজার্ভ ফরেস্ট-এ কাজ করেছিলেন। তিনি আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে ঐ রিজার্ভ ফরেস্ট-এ দুটো পাগলা হাতি আছে, মাকুম-এর ডেপুটি রেঞ্জারও বারবার সে কথা বলে দিয়েছিলেন।

আমার সঙ্গে মিস্টার বা- নামে একজন নতুন অফিসার দূরবীণের কাজ শিখতে গিয়েছিলেন। যাতায়াতের কষ্ট, নৌকো ছোট, সেজন্য আমরা একটিমাত্র তাঁবু নিয়ে গিয়েছি, দুজনে একই তাঁবুতে থাকব। দু-পাশে দুখানা খাটিয়া, মাঝখানে একটি ছোট টেবিল—লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়া সব ঐ টেবিলেই সারতে হয়।

পাগলা হাতির ভয়, রাত্রে বড় ধুনি জ্বালাবার বন্দোবস্ত করেছি, আর খালাসীদের ভালো করে পাহারা দেবার জন্য হুকুম দিয়েছি, যেন ধুনি নিবে না যায়। বুনো জানোয়ার আগুনকে বড়ই ভয় পায়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুয়েছি। টেবিলটার উপর দুজনের দুটো বন্দুক আর বালিশের নিচে কার্তুজ রেখেছি। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শোয়ামাত্রেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি তা বলতে পারি না, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হচ্ছিল যেন একটা বড় জানোয়ার নড়ছে। কান পেতে শুনতে লাগলাম, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম একটা খুব বড় জানোয়ার ধীরে-ধীরে তাঁবুর দিকে আসছে। খসখস আওয়াজ মাঝে মাঝে কানে আসছিল।

খেতে বসে মিস্টার বা- বলেছিলেন যদি রাত্রে হাতি বা অন্য কোনো

জানোয়ার আসে তাহলে তাঁকে যেন ডেকে তোলা হয়। আমি আস্তে-আস্তে বললাম, "বা- হাতি এসেছে, ওঠ।"

"কোথায় হাতি ?"

"ঐ শোনো, খসখস শব্দ—"

সে জায়গায় চারদিকে জঙ্গল, গাছের ডালপালার সঙ্গে জানোয়ারের শরীরের ঘষা লাগার শব্দ ওটা।

মিস্টার বা- আর ওঠবার নাম করেন না, শুধু বলেন, "না, না, আপনি ভুল শুনেছেন, আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।"

এমন সময় মট করে শুকনো ডাল ভাঙবার শব্দ হল, যেন জানোয়ারের পায়ের চাপে শুকনো ডাল ভাঙল। বললাম, "ঐ শোনো। শিগগির ওঠ, এক্ষুনি বেরোলো বলে, উঠে দুটো ফায়ার কর।"

বাইরে জ্যোৎস্না, যদিও আকাশে দু-চার টুকরো মেঘ ছিল।

মিস্টার বা- নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে উঠলেন, তাঁবুর দরজা একটু ফাঁক করে বললেন, "কই, কিছু দেখছি না তো।"

"আরে বন্দুক ছোঁড় না।"

ঐ তাঁবুর দরজার ফাঁক দিয়ে বন্দুকের নল বের করে দিয়ে গুড়ুম-গুড়ুম দুবার ফায়ার করলেন, অমনি তাঁবুর খুব কাছ থেকে মড়-মড় শব্দে ডাল ভেঙে দে দৌড়—হাতি !

আমি বললাম, "শুনলে ?"

মিস্টার বা- বললেন, "দেখতে তো পেলাম না কিছু।"

তিনি কিন্তু তখনো তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এক পা-ও বাইরে যাননি।

খালাসীরা সব ঘুমিয়ে পড়েছিল, ধুনিও নিভে গিয়েছিল। বন্দুকের আওয়াজ শুনে সকলেই উঠেছে। "ব্যাপার কি ?"

"হতভাগারা, এক্ষুনি যে হাতিতে মাড়িয়ে সকলকে চ্যাপ্টা করে দিত। পাহারাওয়ালারা গেল কোথায় ?"

"হুজুর, বহুৎ থক গিয়া থা নিঁদ আ গিয়া।"

কি করা যায়, কথাটা অতি সত্যি। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ঘুমিয়ে পড়া স্বাভাবিক। যাক, ধুনি ঠিক করে, পাহারাওয়ালাদের ভয় দেখিয়ে, আবার শুয়ে পড়লাম আর তখুনি ঘুমিয়ে পড়লাম।

আবার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আবার মনের ভিতর সেই ভাব হচ্ছিল যে জানোয়ার এসে আমাদের দেখছে। কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম, আবার সেই ভারি জানোয়ার চলবার আওয়াজ, আবার সেই খসখস শব্দ। জানোয়ারটা খুব সাবধানে পা টিপে-টিপে চলছে। মিস্টার বা-কে ডাকলাম, "ওঠ।"

"কেন ?"

"ওঠ, আবার হাতি এসেছে।"

আর তাঁর সাড়া নেই, কত ডাকলাম, কোনো জবাব নেই। হাত বাড়িয়ে পা ধরে টানলাম, কিন্তু ভীষণ ঘুম! নড়লেনও না, ঠিক যেন কুম্ভকর্ণ ঘুমোচ্ছেন।

বন্দুক তুলে নিয়ে, কার্তুজ ভরে ধীরে-ধীরে বাইরে এলাম। পাহারা-ওয়ালা ঘুমে অচৈতন্য, ধুনি আবার নিভে গেছে। ধুনির কাছেই যেন প্রকাণ্ড ছায়ার মতো কালো একটা কি দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে জঙ্গলের কিনারায়। ধীরে-ধীরে ধুনির কাছে এলাম—সামনেই প্রকাণ্ড হাতি! নিশ্চল দাঁড়িয়ে খালাসীদের তিরপলটা লক্ষ্য করছে। খালাসীরা তাঁবু আনেনি, তিরপল খাটিয়ে শুয়েছে, হাতিটা আট-দশ ফুট দূরেও হবে না।

হাতির শুঁড়ের নিচেই গুড়ুম-গুড়ুম শব্দে দুবার বন্দুকের আওয়াজ করে দিলাম, আর ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দে চিৎকার করে, লাট্টুর মতো ঘুরে এক



দৌড়ে একেবারে জঙ্গলে। আমি কিন্তু তার পিছন-পিছন আরও দুটো ফায়ার করেছিলাম।

একে তো কানের কাছে বন্দুকের আওয়াজ, তার উপর আবার সঙ্গে-সঙ্গে হাতির চিৎকার শুনে সব লোক চেঁচামেচি করে উঠল, মিস্টার বা-ও তখন "কি ? কি ?" বলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। দুজন সিপাই, তাদের তাঁবু একটু দূরে ছিল, তারাও "কেয়া হুয়া ?" বলতে-বলতে ছুটে এল। সকল কথা শুনে তারা বললে, "হ্যাঁ, এই বদমাস রোজ রাত্রে এখান দিয়েই নদী পার হয়।"

মিস্টার বা- দুঃখ করতে লাগলেন, "আমাকে ডাকলেন না কেন ?"

ভালো ! পা ধরে টেনে খাটিয়া থেকে প্রায় ফেলে দিয়েছিলাম, তবুও কিনা ভদ্রলোক বলেন—আমাকে ডাকলেন না ?

তিনি বললেন, "আমি তো কিছুই টের পাইনি, কখন ডাকলেন, কখনই বা পা ধরে টানলেন।"

হাতিটা সে রাত্রে আমাদের তাঁবুর দিকে আর আসেনি। এরপর আমরা দু-তিন রাত সেইখানে ছিলাম, কিন্তু ওদিক দিয়ে আর সে নদী পার হয়নি।

মিষ্টার বা-কে আমি অনেকদিন পর্যন্ত ঐ হাতির কথা বলে তামাশা করেছি। নতুন লোকের প্রথম-প্রথম জঙ্গলে এসে ঐ রকম হওয়াটা কিছু আশ্চর্যের কথা নয়।

•

পচা হাতির গন্ধের কথা আগে এক জায়গায় বলেছি, সেটা শোনা কথা, আমার সার্ভেয়ারের অভিজ্ঞতা। এ সম্বন্ধে আমার যা অভিজ্ঞতা আছে, তা মনে হলে এখনো অন্নপ্রাশনের ভাত উল্টে আসে।

দীঘাতরং বড় চা বাগিচা। ম্যানেজার সাহেব হাতির খেদার ঠিকা নিয়েছেন, সরকারী রিজার্ভ ফরেস্ট-এ তিনি হাতি ধরবেন। আমাদের সার্ভেয়াররা ঐ রিজার্ভ ফরেস্ট-এ জরীপ করছিল, তাদের গোলমালে সব হাতি পালিয়ে যাবে, ধরতে পারবেন না। সেইজন্য আমার সঙ্গে বন্দোবস্ত হল, যে জায়গায় তিনি খেদার যোগাড়যন্ত্র করেছিলেন, তার আশে-পাশে পাঁচ-ছয় মাইলের মধ্যে মার্চ মাসের আগে আমাদের লোকজন প্রবেশ করবে না। মার্চের শেষ ভাগে আমি আমার সার্ভেয়ারের কাজ পরিদর্শন করতে গেলাম।

সন্ধ্যার সময় সার্ভেয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করছিলাম, সকালে উঠে কোনদিকে কাজ দেখতে যাব। আমি তার নক্সার উপর একটা দিক দেখিয়ে বললাম, "এইদিক দিয়ে যাব আর ঐদিক দিয়ে সন্ধ্যার সময় ফিরব, তা সম্ভব?"

সার্ভেয়ার একটু চিন্তা করে বলল, "হাঁ, হো সক্‌তা। লেকিন ইস জগ্‌গা পর, থোড়া মুশকিল হ্যায়।"

"কেয়া মুশকিল ?"

"খেদা কো একঠো হাথি মর গয়া থা, থোড়া বদবো হ্যায়।"

খেদাতে যে সব হাতি ধরেছিল তার মধ্যে একটাকে বেঁধে 'কোট'-এর (স্টকেড-এর) ভিতর থেকে বের করে আনবার সময় টানা-হেঁচড়া ধস্তাধস্তিতে চোট পেয়েছিল, আর কদিন পর মরে গিয়েছিল। তার মৃতদেহটা ঐ জায়গায় ফেলে গিয়েছিল, পচে দুর্গন্ধ হয়েছে।

আমি বললাম ঐটুকু জায়গা বই তো নয়, নিশ্বাস বন্ধ করে দৌড়ে পার হয়ে যাব।

কাজে বের হলাম, যাবার সময় বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলাম না। বিকেলে তাঁবুতে ফিরে আসবার সময় হঠাৎ সাঁই-সাঁই শব্দে চল্লিশ-পঞ্চাশটা শকুন উড়ল, হাজার-হাজার মাছির ভনভন আওয়াজ কানে এল, একটা উৎকট দুর্গন্ধও নাকে এল—অমনি আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে দৌড়লাম। শকুনের ঝাঁক পার হলাম, মাছির ভনভনানি আর কানে আসছে না, এদিকে আবার দম আটকিয়ে মরবার উপক্রম, নিশ্চয়ই এতক্ষণে বিপদ কেটে গেছে। নিশ্বাস ফেললাম, প্রাণ বাঁচল বটে কিন্তু ওরে বাবা! কী বিটকেল দুর্গন্ধ! ওয়াক! ওয়াক! শুধু বমি!

যার নাকে এ গন্ধ ঢোকেনি সে লোক ধারণাই করতে পারবে না যে সে কেমন গন্ধ। প্রাণপণে দৌড়, আর ওয়াক! ওয়াক! আবার বমি আবার দৌড়। ফুসফুস ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছে নিঃশ্বাস ফেল একটু, আর ওয়াক! ওয়াক!! ওয়াক!!!

বাবা! এ যেন একেবারে নাকের স্নায়ুতে-স্নায়ুতে, ফুসফুসের অলি-গলিতে এই ভীষণ পচা গন্ধ ভরে দিয়েছে।

সঙ্গের হাজারীবাগের খালাসী যারা ছিল তাদেরও প্রায় ঐ অবস্থা।



সার্ভেয়ার জাফর হুশেন ব্রহ্মপুত্র নদের কিনারায় কাজ করছিল। পূর্বোক্ত রিজার্ভ ফরেস্ট-এর অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের খাস জঙ্গলের সীমানা থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত তার কাজ। জঙ্গল খারাপ তাতে আবার জানোয়ারের ভয় বেশি, কাজেই তিন-চারজন লোক তাকে বেশি দেওয়া হয়েছে। সার্ভেয়ার কাজে বের হয়ে গেছে, দুজন খালাসী আড্ডায় রয়েছে, রান্নাবান্না করবে জিনিসপত্র সামলাবে। জানোয়ারের ভয় আছে, বাঘ আছে, আড্ডায় একজন লোক রেখে যাওয়া নিরাপদ নয়। দু-একদিন বাঘ দেখেছে, ডাক তো রোজই শুনতে পায়।

লম্বা একটা লতা-পাতার ঘর তৈরি করেছে, তার সামনের দিকটা খোলা, সেইদিকে ধুনি জ্বালানো হয়। একজন খালাসী ধুনি আর রান্নার কাঠ সংগ্রহ করছে, অন্য লোকটি নদীতে বাসন ধুতে গেছে—নদীটা ছোট, মাত্র এক ফুট জল। হঠাৎ ছপছপ শব্দ এল তার কানে, মুখ তুলে দেখল এই বড় বাঘ নদী পার হচ্ছে, মাত্র পাঁচ-সাত চেন দূরে,

(এক চেন বাইশ গজ)। সে চুপিচুপি উঠে, দৌড়ে আড্ডায় এল, এক নম্বর খালাসী তখন সবে এক বোঝা কাঠ মাথায় করে এনে দাঁড়িয়েছে। দু নম্বর খালাসী এসেই বলল, "জলদি ভাগ্, শের আতা হ্যায়।"

দুজনে ছুটে গিয়ে গাছে উঠে পাতার আড়ালে আশ্রয় নিল। তারা গাছে চড়ে বসবার দু-তিন মিনিটের মধ্যেই হেলতে-দুলতে কর্তা এসে হাজির হলেন, সোজা ঐ নদীর ঘাটে। কোথাও কেউ নেই। এই মাত্র নদীর অন্য পার থেকে 'ভোজ' দেখতে পেয়েছিল, এরই মধ্যে গেল কোথায়? 'হিঁয়াও!'

দুই লাফে উপরে উঠে এল, বাসনগুলি শুঁকে দেখল, কাঠের বোঝাটা শুঁকল, আহা কি চমৎকার গন্ধ! কিন্তু, গেল কোথায়? 'হিঁয়াও!' ঐ ঘরটার দিকে গেল, রান্নার জায়গার চারপাশ ঘুরে দেখল, বিছানাপত্র সব জড়ানো ছিল উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে সেগুলো দেখল, আবার শুঁকে দেখল। তাজা গন্ধ সর্বত্র, কিন্তু গেল কোথায়? আবার 'হিঁয়াও!' বুঝতেই পারছ, বেচারার জিভ দিয়ে কেমন জল পড়ছিল! খাদ্যের অমন সুগন্ধ, আগের মুহূর্তে আবার তা নিজের চোখে দেখেছে, আর কিনা ভোজনে বসতে না বসতেই কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল? এতে মনে দুঃখ তো হবারই কথা, কাজেই—'হিঁয়াও!'

বাঘটা অনেকক্ষণ সেই আড্ডায় বসেছিল, পায়চারি করেছিল, তারপর যখন বিকেলবেলা সার্ভেয়ার কাজ থেকে ফিরে আসছিল আর তার লোকজনের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল, তখন চলে গেল।

সার্ভেয়ার আর তার লোকজনদের দেখেই ঐ লোক দুটি গাছের উপর থেকে চেঁচিয়ে তাদের সাবধান করে দিলে যে আড্ডায় বাঘ বসে আছে, তারা তা শুনে চিৎকার আরম্ভ করল, তবে হতভাগা গেল।

সার্ভেয়ার তাঁবুতে পৌঁছল তবে এরা গাছ থেকে নেমে এল।

পরের দিন আমি সার্ভেয়ারের কাজ দেখতে গিয়ে তার আড্ডায় ঘরের সামনে, উনুনের চারদিকে, বাঘের পাঞ্জা দেখেছিলাম। এই বাঘটা দুজন লোক খেয়েছিল, কাঠুরেরা সার্ভেয়ারকে বিশেষ সাবধান করে দিয়েছিল।

● ১৮ ● (১৯১৮-১৯২০। আসাম : লক্ষ্মীমপুর : জৈন্তিয়া পাহাড়)

এ বছর আমাদের আপিসের মিস্টার সি- দূরবীণের কাজ করবার জন্য জৈন্তিয়া পাহাড়ে গিয়েছিলেন। সেখানে কতকটা জায়গা একেবারে দুর্গম আর মানুষখেকো বাঘেরও ভয়। তার অত্যাচারে কয়েকটা গ্রাম একেবারে উজাড় হয়ে গিয়েছিল। সেই অঞ্চলের জৈন্তিয়া কুলীরা সহজে জঙ্গলে কাজ করতে যেতে সম্মত হত না। মিস্টার সি-কে অনেক যোগাড়যন্ত্র করে তাঁর খালাসীদের সঙ্গে কুলি পাঠাতে হত।

দুবার তাঁর লোকদের সঙ্গে ঐ বাঘের সাক্ষাৎ হয়েছিল।

একবার তাঁর তিন-চারজন খালাসী একটা গ্রামে যাচ্ছিল, গ্রাম থেকে কুলি নিয়ে তারা পাহাড়ে যাবে। সূর্যাস্তের আগেই গ্রামে পৌঁছতে হবে, সেইজন্য তারা লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলেছে। হতভাগা বাঘ কিন্তু তাদের পিছু ধরেছে। এক-আধবার ছায়ার মতো চোখে পড়ে আবার চোখের পলক না ফেলতে জঙ্গলের আড়াল হয়ে যায়। কখনো বা পিছনে দেখা দেয় আবার কখনো বা কুড়ি-ত্রিশ ফুট সামনে। লোকরা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল, কেমন ভয় পেয়েছিল সে তো বোঝাই যায়। তারা হাত ধরাধরি করে অতি সাবধানে চলেছে, এবার গ্রামে পৌঁছবে, তখন বাঘটা ক্রমাগত তাদের সামনে রাস্তার উপর দেখা দিতে লাগল।

বেচারা খালাসীরা ভয়ে আর এগোয় না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে এক জায়গায় একটা শুকনো গাছ দেখতে পেয়ে সেখানে দাঁড়াল। তাদের সঙ্গে লম্বা দড়ি ছিল, চার-পাঁচটা গাছের চারদিকে ঐ দড়ি দিয়ে চার-পাঁচবার ঘিরে নিল। ঠিক যেন ফাঁদ পেতেছে। তারপর ঐ শুকনো গাছে আগুন জেলে দিয়ে ঘেরা জায়গাটুকুর মধ্যে আশ্রয় নিল।

কত চিৎকার করে কত ডাকাডাকি করল, কিন্তু গ্রামের লোকেরা কোনো সাড়াই দিল না, যদিও গ্রামের লোকের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল তারা। সমস্ত রাত তারা ঐ জায়গাতে কাটাল। বাঘটা কতবার দেখা দিল, কিন্তু আগুনের ভয়েই হোক, কি দড়ি-ঘেরা জায়গাটাকে ফাঁদ মনে করেই হোক, তাদের ধরবার চেষ্টা করেনি।

সকালে যখন তারা গ্রামে গিয়ে পৌঁছল, তখন গ্রামের লোকেরা বড়ই আশ্চর্য হয়ে গেল যে তাদের বাঘে খায়নি। পরে সাহেব গিয়ে গ্রামের প্রধানকে বিশেষ তিরস্কার করেছিলেন। তাদের ঐ এক উত্তর: "আমরা ওদের চিৎকার শুনতে পাইনি।"

আর একবার ঐ সাহেবের কয়েকজন লোক একটা পাহাড়ে কাজ করতে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে ঐ গ্রামের কয়েকজন কুলি ছিল।

পাহাড়ের চুড়োর সমস্ত জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে, বড়-বড় গাছ সব চারদিকে এলো মেলো ভাবে পড়ে আছে, চুড়োটুকু পরিষ্কার। খালাসীরা ঐ চুড়োর উপর ক্যাম্প করবার বন্দোবস্ত করতে লাগল, কিন্তু সঙ্গের জৈন্তিয়া কুলিদের ঐ খোলা জায়গাতে থাকা পছন্দ হল না, কিম্বা নিরাপদ মনে করল না। তারা একটু নিচে নেমে জঙ্গলের আড়ালে লতা-পাতার কুঁড়ে খাড়া করে নিল।

জরীপের কাজ সকালে সাতটা, সাড়ে-সাতটা থেকে আরম্ভ হয়। লোকজন অন্ধকার থাকতে উঠে, হাত-মুখ ধুয়ে, রান্নার যোগাড় করে।

এ পাহাড়ে বাঘের ভয়, সেইজন্য কেউই ভোরে ওঠেনি। চারদিক পরিষ্কার হলে, উঠে, হাত-মুখ ধুতে ব্যস্ত আছে। একজন জৈন্তিয়া কুলি তাদের কুঁড়ে ঘরের কাছেই ঝোপের আড়ালে পায়খানায় গেছে, আর তাকে বাঘে ধরে নিয়ে গেল, বাঘটা যেন সুযোগের অপেক্ষায় বসে ছিল। অন্য সব কুলিরা হাউমাউ করে চিৎকার জুড়ে দিল, আর পাহাড় ছেড়ে একেবারে গ্রামে চলে গেল।

বেচারা খালাসীরা কজন পাহাড়ের চুড়োতেই থেকে গেল। বাঘ কিন্তু তাদের উপর হাম্‌লা করেনি। সে বোধহয় ঐ কাটা গাছগুলোকে ডিঙিয়ে যাওয়া নিরাপদ মনে করেনি। কিম্বা সেগুলো দেখে ফাঁদ মনে করেছিল। সেইজন্য তাদের কাছেও যায়নি।

সাহের খবর পেয়ে স্বয়ং ঐ পাহাড়ে গিয়ে খালাসীদের উদ্ধার করে এনেছিলেন।

হাবিলদার সিংবীর থাপা জৈন্তিয়া পাহাড়ের যেখানে মানুষখেকো বাঘ আছে সেখানে কাজ করতে গিয়েছিল। তার সঙ্গে বেশি করে লোকজন আর হাতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। রান্না করবার জন্য নিজের একজন গুর্খা সঙ্গে গিয়েছিল। তার কাজের জায়গায় মানুষখেকো বাঘের ভয় আছে, তাকে বিশেষ সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যেন খুব হুঁশিয়ার হয়ে কাজ-কর্ম করে, তাঁবু ফেলে।

হাবিলদার ছিল পল্টনওয়ালা আর খুব বাহাদুর লোক, সেইজন্য বেছে-বেছে তাকেই ঐ কাজে পাঠানো হয়েছিল।

আড়াই-মাস তিন-মাস বেশ কেটে গেল, বাঘের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হল না। চারদিকের কাজ শেষ হয়ে গেছে, মাঝখানে একটু বাকি আছে, অল্প কয়েকদিনের কাজ। গ্রামে তাঁবু রেখে আর এ-কাজটুকু হতে পারে

না, অনেক দূর পড়ে যায়, যাতায়াতেই প্রায় সারাটা দিন চলে যায়। সেখানে একটা পরিত্যক্ত গ্রাম ছিল, বাঘের অত্যাচারে লোকরা সব পালিয়ে গেছে। হাবিলদার মনে-মনে স্থির করল ডেরা তুলে ঐ শূন্য গ্রামে নিয়ে যাবে, মাত্র কদিনের কাজ বাকি, সেটুকু ঐ গ্রামে থেকেই শেষ করবে। গ্রামের ঘর-দোর সবই মজুত ছিল। যে গ্রামে এতদিন তাঁবু ছিল, সে গ্রামের লোকরা ওদের সঙ্গে গিয়ে ঐ শূন্য গ্রামে কয়েকদিন বাস করতে রাজী হল না। অনেক তর্কাতর্কির পর শুধু ঐ গ্রামে পৌঁছে দিয়ে আসতে রাজী হল।

হাবিলদার কত বোঝাল যে তিনমাসের মধ্যে আমাদের সঙ্গে বাঘটার দেখা হয়নি, ওটা নিশ্চয়ই অন্য কোথাও চলে গেছে, আর তো মাত্র কদিনের কাজ বাকি, ইত্যাদি, কিন্তু কোনো ফল হল না। তারা বলল সেই গ্রামে পৌঁছে দিয়েই চলে আসবে।

সমস্তদিন হেঁটে বিকেলবেলা তারা সেখানে পৌঁছল। গ্রাম থেকে মাইল দুই দূরে এক টুকুরো খেত ছিল, সেখানে মেলা তরকারি হয়েছে— কুমড়ো, শিম, কচু ইত্যাদি। খালাসীরা বলল, "এখানে একটু সবুর কর, আমরা তরকারি নেব। তিন মাস খালি ডাল ভাত আর নুন ভাত খাচ্ছি।"

কুলিরা বিশেষ আপত্তি জানাল, তারা কিছুতেই দাঁড়াবে না, সন্ধ্যা হয়ে যাবে। হাবিলদার তখন খালাসীদের বলল, "আজ চল, কাল সকালে আমি কাজে যাব না। তোমরা তখন এসে তরকারি নিয়ে যেও।"

তারা রাজী হয়ে চলতে লাগল আর সন্ধ্যার আগেই গ্রামে পৌঁছে গেল।

পরদিন ভোরে উঠে কুলিরা চলে গেল, তিনজন খালাসী তাদের সঙ্গে ডাক আনতে গেল, চারজন খালাসী গেল তরকারি আনতে। এরা

তরকারি নিয়ে ফিরলে তবে রান্না করে খাবে, নুন ভাত আর তারা খাবে না।

হাবিলদার তাঁবুতে বসে নিজের কাজে ব্যস্ত। ক্রমে বেলা হল, যে সব লোকরা তাঁবুতে ছিল তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, ওরা এখনো আসে না কেন ? দু-মাইল তো রাস্তা, দু-ঘণ্টা আড়াই-ঘণ্টার মধ্যে ফিরবার কথা।

বারোটা বেজে গেল, ক্রমে বিকেল হল, কিন্তু ঐ চারজন লোকের দেখা নেই। চিৎকার করে কত ডাকাডাকি করা হল, কোনো উত্তর নেই। একবার ভাবল ওরা বোধহয় ঐ খেতেই রান্না করে খেতে বসেছে, কিন্তু তাও তো সম্ভবপর নয়, কেননা সঙ্গে চাল নেই, বাসন-কোসন নেই, রাঁধবে কিসে ?

বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত হল। তারা বড়-বড় ধুনি জেলে সমস্ত রাত জেগে কাটাল। সকালে উঠেই হাবিলদার রাইফেল ঘাড়ে চলল তার লোকজনের খোঁজে, তার সঙ্গে চলল তার রোটিওয়ালা অর্থাৎ তার রাঁধুনী। তখন একজন খালাসী তাঁবুতে ছিল, সেও সঙ্গে চলল, একলাটি তাঁবুতে থাকবে না। আগে-আগে বন্দুক ঘাড়ে হাবিলদার, মাঝখানে রাধুনী, পিছনে খালাসীটি। প্রায় দেড় মাইল পাহাড় চড়ে, এক জায়গায় দেখতে পেল পথের উপর একটা কাটা গাছের ডাল পড়ে রয়েছে, তার পাতা শুকোতে আরম্ভ করেছে, পাশে গাছের গায়ে দা দিয়ে ছাল ছাড়ানো। বুঝল আগের দিন কুলিরা রাস্তা ছেড়ে এইখানে বনে ঢুকেছিল। রাস্তার উপর ডাল কেটে ফেলে রেখেছে পিছনের লোককে সাবধান করার জন্য যেন ঐ পথে কেউ না যায়।

দু-চার পা জঙ্গলে গিয়ে দেখল জায়গায়-জায়গায় গাছের গায়ে দা দিয়ে দাগ দেওয়া আছে, ঐখান দিয়ে তারা গেছে। কিন্তু কেন ? হাবিলদার দাঁড়িয়ে একটু ভাবল, তারপর বন্দুক ভরে নিয়ে রাস্তা ধরে

চলতে লাগল। যারা তরকারি আনতে গিয়েছিল, রাস্তায় তাদের পায়ের দাগ দেখল। আরও সিকি মাইল আন্দাজ গিয়ে দেখল রাস্তার পাশেই খানিকটা জায়গার মাটিতে নখের আঁচড়ের দাগ, আর কি যেন পড়ে আছে। এক পা এগিয়ে দেখল—রক্তের দাগ।

চকিতে একবার চারদিকে দেখে নিয়ে তারা আবার চলতে লাগল। হঠাৎ পিছনে ক্যাঁক করে একটা আওয়াজ হল, মুখ ফিরিয়ে দেখল পিছনের খালাসীটি আর নেই আর পাশেই ঘাসবন নড়ছে। বুঝতে বাকি রইল না তাকে বাঘে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কাছেই পাহাড়ের ঢালুর কিনারায় গাছ ছিল, দুজনে প্রাণপণে সেদিকে ছুটল। হাবিলদার ছুটে গিয়ে লাফিয়ে একটা ডাল ধরে অতি কষ্টে কয়েক ফুট চড়ে গেল, তার ঘাড়ে বন্দুক, পায়ে বুট জুতো।

তার চাকরটা সবেমাত্র গাছের গোড়াতে পৌঁছেছে আর ঝড়ের মতো বাঘটা এসে তার ঘাড়ে পড়ল। তার চিৎকার শুনে হাবিলদার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল কি ব্যাপার, আর তাড়াতাড়ি রাইফেলটা ঘুরিয়ে এক হাতেই গুলি ছুঁড়ল। বন্দুকের আওয়াজ শুনেই বাঘটা রোটিওয়ালাকে ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। হাবিলদার ততক্ষণে আরো দু-পা উঠে ডালের উপর ভালো করে বসে বন্দুকে আবার কার্তুজ ভরে নিল। বাঘ আর চোখে পড়ছে না, সে গা ঢাকা দিয়েছে। রোটিওয়ালা পড়ে আছে, ঢালুর উপর দিকে তার পা, নিচের দিকে মাথা।

হাবিলদারের গাছ থেকে নিচে নামবার সাহস হচ্ছে না, যদি নামবার সময় বাঘ লাফিয়ে এসে ঘাড়ে পড়ে। গাছের উপর বসে সে বাঘের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

রোটিওয়ালা কিন্তু তখনো জীবিত। সে কোঁকাতে-কোঁকাতে বলতে লাগল হাবিলদার যেন তাকে ফেলে না যায়, সে তার আপনার লোক।



হাবিলদার বলল যে সে কখনো তাকে ফেলে যাবে না। কেন যে নামতে পারছে না তাও বলল, গাছের উপর তবু কিছু দূর দেখা যায় বাঘ আসছে কিনা, মাটিতে নামলে কিছুই দেখতে পাবে না, হয়তো নামবার সময়ই বাঘ এসে ধরে ফেলবে। হাবিলদার আরও বলল পটি আর পাগড়ি জড়িয়ে দড়ি তৈরি করে উপর থেকে রুটিওয়ালার কাছে নামিয়ে দেবে! সে যেন সেটাকে বুকে পিঠে জড়িয়ে বাঁধে, তাহলে হাবিলদার দড়ির অন্যদিক ধরে টেনে তাকে গাছে তুলে নেবে। তারপর ভগবান যেমন ব্যবস্থা করেন।

এর মধ্যে দু-একবার এক পাশের জঙ্গল একটু নড়েছে আর হাবিলদার সেইদিক লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। তার মনে হচ্ছিল বাঘটা আবার রোটিওয়ালার কাছে আসছিল কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ শুনে পালিয়ে গেল।

রোটিওয়ালা বেচারা কত চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই দড়িটা বুকে জড়িয়ে নিতে পারল না। তার ঘাড়ে বিষম চোট লেগেছিল, অতি কষ্টে কোঁকাতে-কোঁকাতে কথা বলছিল। যখন কিছুতেই দড়িটা জড়াতে পারল

না তখন সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে কোঁকাতে লাগল। সমস্ত দিন ঐ অবস্থায় পড়ে রইল, সন্ধ্যার সময় কোঁকানো বন্ধ হল।

এর মধ্যে আরও দু-চারবার ঝোপ নড়া দেখে বন্দুক চালাতে হয়েছে, পাছে বাঘটা বেচারার দেহটা নিয়ে যায়। রাতটাও ঠিক ঐভাবে কাটাতে হল। একবার পলকের জন্য হাবিলদার বাঘটাকে দেখতে পেয়েছিল, গুলিও করেছিল। কিন্তু অন্ধকারে গুলি লাগল কিনা বোঝা গেল না। সকালে দেখা গেল রোটিওয়ালার দেহটা সেখানেই পড়ে আছে।

এখন কি কর্তব্য হাবিলদার তাই চিন্তা করতে লাগল। চব্বিশ ঘণ্টা চলে গেছে, এক ফোঁটা জলও পেটে পড়েনি, তার উপর এই ভীষণ কাণ্ড! অবস্থা তো বোঝাই যাচ্ছে। এমন করে কতক্ষণ চলবে? সেই মরতেই হবে, কিন্তু এখনো শরীরে শক্তি আছে, চেষ্টা করলে হয়তো বা এই ভীষণ জায়গা থেকে বের হয়ে যেতেও পারা যায়।

এই রকম মনে-মনে আলোচনা করে, তিন-চারবার উপরি-উপরি বন্দুকের আওয়াজ করল। এইবার গাছ থেকে নামবে। তখন তার মনে হল কেউ যেন চীৎকার করে ডাকছে। হাবিলদারও চেচিয়ে জিগগেস করল, "কে তুমি?"

একজন খালাসী তার নাম বলল। সেই প্রথম দিন যে কজন তরকারি আনতে গিয়েছিল, তাদের একজন।

"কোথায় তুমি?"

"গাছে। বাঘ মরেছে?"

"না, গুলি করেছি, কিন্তু পালিয়ে গেছে। তুমি গাছ থেকে নেমে আমার দিকে এস, আমিও গুলি করতে-করতে এগোচ্ছি, বাঘ ভয়ে আসবে না।"

হাবিলদার গাছ থেকে নেমে ঐদিকে চলল। চার-পাঁচ কদম যায়

আর বন্দুকের আওয়াজ করে। খালাসীও এসে হাজির হল। তখন দুজনে সেই উজাড় গ্রামের দিকে দৌড়ল। খালাসীকে সামনে রেখে, হাবিলদার পিছন-পিছন ভরা বন্দুক হাতে নিয়ে। গ্রামে এসে খালাসী বলল সে জল খাবে, আটচল্লিশ ঘণ্টা জল খায়নি। হাবিলদার সামান্য জল দিয়ে বলল, "বেশি খেলে অসুখ করবে। চলতে পারবে না।"

তারপর কিছু চাল সঙ্গে নিয়ে তারা সেই সর্বনেশে জায়গা ছেড়ে গেল। নিচে নালায় গিয়ে ঐ চাল দুমুঠো ভিজিয়ে চিবিয়ে খেল, তবে জল খেল।

তারপর, বারো-তেরো মাইল দূরে অন্য পাহাড়ে গ্রাম ও খেত দেখা যাচ্ছিল, সেইদিকে চলল। সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে এসেছে, শুধু বন্দুকটি, দুখানা কম্বল আর দুমুঠো চাল সঙ্গে এনেছে। সন্ধ্যার পর সেই খেতে গিয়ে পৌঁছল। পা আর চলে না। খেত পাহারা দেবার জন্য আট-দশ ফুট উঁচু মাচার উপর ছোট একটি কুঁড়েঘর ছিল। কিছু ভিজে চাল আর জল খেয়ে, ঐ মাচার উপরে উঠে তারা শুয়ে রইল। ভয়ে, আতঙ্কে, ঘুমোতে পারল না। সঙ্গে দেশলাই ছিল, ঐ ঘরে কাঠ ছিল, আগুন জ্বেলে সারা রাত জেগে কাটাল।

পরদিন সকালে যখন গ্রামে পৌঁছল, তখন তাদের আধ-মরা অবস্থা। দেখতে-দেখতে এই সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের আপিসের সাহেবরা হাতি নিয়ে বাঘ মারতে গেলেন, কিন্তু বাঘের কোনো সন্ধানই পেলেন না।

আগেই বলেছি হাবিলদার বাহাদুর লোক। আবার সে ঐ জায়গায় ফিরে গিয়ে তার আত্মীয়ের সৎকার করেছিল, আর বাকি কাজটুকুও শেষ করেছিল।

খালাসীটার কাছে আগের দিনের সব ঘটনা শোনা গেল। ওরা চারজন অন্য কুলিদের ছেড়ে একজনের পিছনে একজন লাইন বেঁধে রাস্তা

ধরে তরকারি আনতে যাচ্ছিল। যেখানে হাবিলদার প্রথম রক্ত দেখেছিল, সকলের পিছনের লোকটিকে ঐখানে বাঘে ধরে। বাকি তিনজন ঐ রাস্তায়-রাস্তায় ছুটতে আরম্ভ করে আর বাঘটাও পিছনে-পিছনে তাড়া করে, একজনের পর একজন করে আরও দুজনকে মেরে ফেলে। ততক্ষণে সকলের আগের লোকটি ছুটে গিয়ে একটা গাছে উঠে প্রাণ বাঁচায়।

এর পরের বছর আমি কলকাতায় বদলি হয়ে গেলাম আর জঙ্গলের কাজের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্পর্ক ঘুচে গেল। সুতরাং আমার বক্তব্যও এখানে শেষ হয়ে গেল।

● সমাপ্ত ●